মাসুদ রানা

সাগর সঙ্গম

দুইখন্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

NAEEM



Pathfinder

সেবা প্রকাশনী

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র *মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র *রাত্রি অন্ধকার *জাল *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক *শয়তানের দূত* এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা *তিন শত্রু অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ *পাগল বৈজ্ঞানিক এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা *হংকং সম্রাট *কুউউ! বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক *আই লাভ ইউ, ম্যান সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন *বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা নিরাপদ কারাগার *স্বর্ণরাজ্য *উদ্ধার *হামলা *প্রতিশোধ *মেজর রাহাত লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা *বেনামী বন্দর *নকল রানা রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা *চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা *মরণ কামড় *মরণ খেলা অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় *শান্তিদূত *শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত *আবার উ সেন *বুমেরাং কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা *কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা *আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর শ্বাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয়সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ ডাবল এজেন্ট *আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক *সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী দুই নম্বর *কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা *স্বর্ণদ্বীপ রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ কালপুরুষ নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে অনন্ত যাত্রা রক্তচোষা *কালো ফাইল *মাফিয়া *হীরকসম্রাট *সাত রাজার ধন।

সাগর সঙ্গম-১

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৬৭

এক

নানান সাইজের টপ্ সিক্রেট মার্কা মারা একগাদা ফাইলের মধ্যে ডুবে বসে আছে রানা মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়ার একটি প্রাসাদোপম বাড়ির ছয়তলায়, নিজ অফিস কামরায়। আর উত্তরোত্তর বিরক্ত হয়ে উঠছে মনে মনে। অসহিষ্ণুভাবে উল্টে যাচ্ছে সে পাতার পর পাতা। আরও ঝাড়া একটি ঘণ্টা লাঙ্গল চালাতে হবে তাকে এই সব শুকনো, নীরস, কাঠখোট্টা ফাইলের মধ্যে। রুটিন ওয়ার্ক। করতেই হবে।

জাহেদ, সলীল, নাসের—তিনজনই বাইরে। নাসেরের খবর পাওয়া গিয়েছে, বেঁচে আছে, সুইস সরকারের তত্ত্বাবধানে জেনেভার এক হাসপাতালে আরোগ্যলাভ করছে সে কাজ সমাধা করে। আর দু'জনের কোন খবর নেই। সবাই আছে ওরা কাজের মধ্যে। আর রানা? মাছি মারছে সে ঢাকায় বসে। কোনও কাজ নেই। তাছাড়া ওরা কেউ একজন না ফিরলে ওকে দেশের বাইরে পাঠানো যাবে না। হাতের ফাইলটা বন্ধ করে আউট লেখা ট্রেতে ফেলল রানা ঝপাৎ করে। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে সিলিং ফ্যানের দিকে চাইল।

এপ্রিলের গরম ফ্যানের হাওয়ায় কাটছে না। থেকে থেকেই ঘেমে উঠছে হাতের তালু। সর্বাঙ্গে একটা চটচটে ভাব। বিচ্ছিরি। পাশের ঘরে খটাখট টাইপ করে চলেছে নাসরীন রেহানা রানার ইস্তাম্বুল অ্যাসাইনমেন্টের বিস্তারিত রিপোর্ট। গত সাতদিন ধরে অবিরাম খাটছে বেচারী নিষ্ঠার সঙ্গে।

বিরাট বাড়ি বিকেলের দিকে কেমন যেন নিঝ্‌ঝুম, নিস্তব্ধ হয়ে যায়। নিচের তলার দপ্তরগুলো তালা মেরে দিয়ে একে একে চলে যায় ভাড়াটেরা। হঠাৎ শূন্য ফাঁকা মনে হয় রানার। মনে হয়, একসময় থাকবে না সে পৃথিবীতে, কিন্তু এই বিশাল বাড়িটা থাকবে। এই কামরায় বসে অন্য কেউ একজন অনুভব করবে এই নির্জন নিস্তব্ধতা।

সত্যি, ক'দিন বাঁচবে সে? আর সাত বছর পর বিপজ্জনক কাজ থেকে সরিয়ে ডেস্ক-ওয়ার্ক দেয়া হবে ওকে। কিন্তু এই সাত বছর কি পারবে সে টিকে থাকতে? সাত বছর মানে কমপক্ষে সাত দু'গুণে চোদ্দটা ভয়ঙ্কর অ্যাসাইনমেন্ট। একুশটাও হতে পারে। টেকার সম্ভাবনা কম। তাই টাকা জমায় না সে কখনও। যে-কোনো মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে ওর। যত কম পারা যায় তত কম টাকা ব্যাঙ্কে রেখে মারা যেতে চায় সে। রাস্তার মাকে নমিনি করে পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইনশিওরেন্স করিয়েছে আজ বছর চারেক হলো, এই যা ওর সঞ্চয়।

তবে এটা ঠিক, ডেস্কওয়ার্কের বয়স হয়ে গেলে চাকরি ছেড়ে দেবে সে। ছয় বছর পরেই ইনশিওরেন্সের টাকাটা হাতে আসছে। একশো দেড়শো বিঘা জমি নেবে সে রাজশাহীতে। গোটা দুই পাওয়ার টিলার নিয়ে গিয়ে ফার্ম করবে আধুনিক পদ্ধতিতে। ইরি ধানের চাষ।

স্ক্রিবলিং প্যাডটা টেনে নিয়ে হিসেব করতে বসল সে। বিঘা প্রতি তিরিশ মন করে ধান হলে একশো বিঘায় ধান পাওয়া যাবে তিন হাজার মন। বিশ টাকা মন দরে বিক্রি করলে টাকা আসছে ষাট হাজার। ঠিকমতো সার দিয়ে চাষ করলে বছরে অন্তত পক্ষে দুটো ফসল তোলা যাবে। তাহলে বছরে আসছে এক লাখ বিশ হাজার। খরচ ধরা যাক বিশ হাজার। বছরে লাভ দাঁড়াচ্ছে এক লাখ অর্থাৎ মাসে আট হাজার! আর কি চাই? বাহ্।

ভবিষ্যতের সমস্ত সমস্যা সমাধান করে ফেলে খুশি হয়ে উঠল রানার মন। হিসেবের কাগজটা ফস করে ছিঁড়ে নিয়ে দলা পাকিয়ে ফেলে দিল ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। কেউ দেখে ফেললে লজ্জায় পড়ে যাবে। এবার হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল টেবিলের বাঁ ধারে বাটালি হিলের সমান উঁচু হয়ে থাকা ফাইলের ঢিবির দিকে। মুহূর্তে উবে গেল সমস্ত উৎসাহ। অসহায় দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে চাইল সে রমনা রেস কোর্সের আবছা হয়ে আসা শিব মন্দিরটার দিকে।

হঠাৎ থেমে গেল পাশের ঘরে টাইপ রাইটার। সোজা হয়ে বসল রানা নিজের চেয়ারে। মিনিট খানেক কোন শব্দ নেই। তারপর ঠুং-ঠাং একটা পরিচিত শব্দ কানে আসতেই খুশি হয়ে হেলান দিয়ে বসল রানা আবার। অল্পক্ষণের মধ্যেই দুই হাতে দুটো কফির কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল রেহানা।

'থ্যাঙ্ক ইউ, রেহানা।'

'রাখো তোমার থ্যাঙ্ক ইউ! আমার ছুটির কি হলো? রিপোর্ট তো শেষ—এবার এক মাসের ছুটি আমাকে দিতেই হবে।'

'ইম্‌পসিবল্। ওসব ধানাই-পানাই ছেড়ে দাও, খুকি। ছুটি-ফুটি হবে না। অন্য কথা থাকলে বলতে পারো।'

নীরবে কফির কাপে মগ্ন হয়ে রইল ওরা কিছুক্ষণ। অনেক উসখুস করেও প্রশ্নটা করতে পারল না রেহানা। মৃদু হাসল রানা। কফি শেষ করে ফাইল টেনে নিল একটা। তারপর বলল, 'না, এখনও কোন খবর পাওয়া যায়নি জাহেদের। আর কিছু জিজ্ঞেস করবে?'

'যাহ্। ওর কথা কে জিজ্ঞেস করতে গেছে?' বলল রেহানা ভয়ানক লজ্জা পেয়ে। 'আমি···আমি ভাবছিলাম সেই দুর্ধর্ষ দস্যু ইয়াকুবের কথা। রিপোর্টের শেষে গোক্ষুরের ফণার মত একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন মনের মধ্যে উদয় হয়। লোকটা তোমাকে ভালবেসে ফেলেছিল, রানা; তোমাকে এম. ভি. রুস্তমে নিয়ে গিয়ে রক্ষা করতে চেয়েছিল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু কেন?'

'ওটাই একটা মস্ত বড় রহস্য, রেহানা।' খানিকক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবল রানা। তারপর বলল, 'ঠিকই ধরেছ তুমি। আমার মৃত্যু সে চায়নি। এই প্রশ্নটা নিয়ে আমিও বহুবার চিন্তা করেছি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। অদ্ভুত মানুষের মন! কখন যে কাকে ভাল লেগে যায় বলা মুশকিল। অত নিষ্ঠুর একজন দস্যুর

মধ্যেও দেখো, কি সুন্দর একটা দুর্বলতা। কোন কারণ নেই, কিছু না, শত্রুপক্ষের লোক জেনেও স্নেহ জন্মে গেল। কি করবে সে এখন? পরিষ্কার করে বলতে পারছে না সব কথা, কিন্তু অনেক ভাবে চেষ্টা করেছে সে আমাকে অবধারিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। দেখো, মরে ভূত হয়ে গেছে লোকটা—কিন্তু আশ্চর্য, প্রায়ই মনে পড়ে আমার ওর সেই অনুরোধপূর্ণ দৃষ্টিটা। লোকটা একসময় বেঁচে ছিল, ওর হৃদয়ে একটা পবিত্র দুর্বলতা ছিল আরেকজনের জন্যে, কেবল এইটুকুর জন্যেই চিরকাল বেঁচে থাকবে ও আমার মধ্যে। স্নেহ, ভালবাসা কী অদ্ভুত জিনিস, তাই না?'

জবাব দিল না রেহানা। চুপচাপ উপলব্ধি করল সে রানার সুন্দর মনটাকে। কতখানি সততা থাকলে এত গভীর একটা কথাকে এত সহজ করে বলা যায়, বুঝল সে মনে মনে। এতদিন শ্রদ্ধা করেছে সে এই লোকটাকে—আজ বুঝল, প্রেমে পড়া যায় না, কিন্তু নিশ্চিন্তে ভালবাসা যায় একে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্যে অদ্ভুত এক সহানুভূতি আছে এর হৃদয়ের গভীরে। শত্রুকে শত্রু জেনে নির্মমভাবে দমন করেছে—কিন্তু তার ভিতরের মানুষটার প্রতি শ্রদ্ধা হারায়নি সে জয়ের দম্ভে।

এমনি সময় চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার কর্নেল শেখের কণ্ঠস্বর ভেসে এল ইন্টারকমের মাধ্যমে। খনখনে ধাতব কণ্ঠস্বর।

'একটু ওপরে আসতে পারবে, রানা?'

'তোমার কাছে, না বুড়ো মিঞার কাছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বুড়ো মিঞা।'

'ব্যাপার কি?'

'বোঝা যাচ্ছে না। তেমন কিছু জরুরী বলেও মনে হলো না। শুধু আমাকে রিং করে বললেন, তুমি যদি এখনও বেরিয়ে না গিয়ে থাকো তাহলে যেন ওঁর সাথে দেখা করতে বলি।'

'ঠিক আছে। যাচ্ছি।'

উঠে দাঁড়াল রানা। ঘড়ির দিকে চাইল। পৌনে ছ'টা। রেহানাকে ছুটি দিয়ে তরতর করে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে সাততলায়। কার্পেট বিছানো লম্বা করিডর দিয়ে এসে দাঁড়াল মেজর জেনারেল রাহাত খানের কামরার সামনে। ছলাৎ করে উঠল ওর বুকের ভিতর এক ঝলক রক্ত।

দুই

রানা যখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল, মেজর জেনারেল রাহাত খান তখন পুরু কাঁচ-ঢাকা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওধারে রিভলভিং চেয়ারটায় বসে পাইপ ধরাচ্ছেন। জ্বলন্ত দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে একটা চেয়ারের দিকে আবছা ইঙ্গিত করলেন তিনি। এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল রানা চেয়ারটায়। ধূম্রকুণ্ডলীর

ফাঁক দিয়ে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করলেন তিনি রানার মুখ, তারপর ম্যাচ বাক্সটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে আরাম করে হেলান দিয়ে বসলেন।

'অনেকদিন পর দেখা, তাই না?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।

অবাক হয়ে চট্ করে চাইল রানা ওঁর চোখের দিকে। তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, 'জী, স্যার।'

এ কেমন ধারা প্রশ্ন? এমন তো কখনও হয় না! জীবনে এই প্রথম বৃদ্ধের মুখ থেকে এ ধরনের কথা শুনল রানা। মুখ দিয়ে একটি বাড়তি শব্দ বের করা ওঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

'কেমন আছ? ইস্তাম্বুল থেকে ফিরে থরো মেডিকেল চেকআপ করিয়েছিলে তো?'

'জী, স্যার। এক্স-সেকশন ওকে বলে সারটিফাই করেছে।'

এবার আরও অবাক হয়ে গেল রানা। আবার একবার ঘুরে এল ওর দৃষ্টিটা বৃদ্ধের মুখের ওপর থেকে। ব্যক্তিগত প্রশ্ন অপছন্দ করেন রাহাত খান। ব্যাপার কি? কিছুই তো পরিবর্তন হয়নি। তেমনি সপ্রতিভ অভিজাত চেহারা, তেমনি ধবধবে সাদা ঈজিপশিয়ান কটনের স্টিফ-কলার শার্ট, দামী ট্রপিকালের স্যুট, বৃটিশ কায়দায় বাঁধা টাই। ছিমছাম, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। শুধু চুরুটের বদলে এখন টানছেন পাইপ। এ-ও এমন কিছু পরিবর্তন নয়—মাঝে মাঝেই তিনি পুরানো অভ্যাস ত্যাগ করে নতুন কিছুর মধ্যে বৈচিত্র্য খোঁজেন। কোন একটা অভ্যাসের দাস হয়ে থাকতে অপমানিত বোধ করেন তিনি। এসব বহুবার দেখেছে রানা। আগামী দু'বছরের মধ্যে যে তিনি আর চুরুট খাবেন না এটাও ওর জানা আছে। তাহলে? এমন সব উদ্ভট কথা বলছেন কেন তিনি?

'বেশ। বড় বাঁচা বেঁচে গেছ এবার। কিন্তু নিজেকে ঢেকে রাখতে পারোনি। তোমার পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গেছে সবার কাছে। এরকম হলে ভবিষ্যতে অপারেশনের কাজে তোমাকে ব্যবহার করাই মুশকিল হয়ে পড়বে।' রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, পাইপের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বলে চললেন রাহাত খান, 'চারদিক থেকে মেসেজ আসছে, প্রশংসা-বাণী আসছে—কেউ কেউ আবার অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইছে। জানি, এতে তোমার কোনও হাত ছিল না, কিন্তু ভেবে দেখ, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এতে কতখানি ক্ষতি হলো।'

'সরি, স্যার!'

'সরির কিছু নেই।' বাম চোখের পাতা চুলকালেন বৃদ্ধ অনামিকা দিয়ে। 'করবার কিছুই ছিল না তোমার। সমস্ত ব্যাপারটা ভজঘট হয়ে গেল শেষের দিকে—এমন জগাখিচুড়ী পাকিয়ে গেল, প্রত্যেকটি লোক এমন সাক্ষাৎ ভাবে জড়িত হয়ে পড়ল যে সেই অবস্থায় আত্মগোপন করা যায়ও না।'

পাইপটা দাঁতে চেপে অন্যমনস্কভাবে কয়েকটা মৃদু টান দিয়েই বুঝলেন রাহাত খান যে নিভে গেছে ওটা। ম্যাচটা তুলে নিয়ে পরপর দুটো কাঠি জ্বেলে পাইপের পিছনে বেশ খানিকটা সময় নষ্ট করলেন তিনি। পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে চুপচাপ টানলেন মগ্ন চিত্তে। খোলা জানালা দিয়ে শব্দ পাওয়া গেল সামনের

রাস্তা দিয়ে একটা ট্রাক চলে যাবার। বাঁকা পাইপটা হাতে নিয়ে ওটার মুখ থেকে বেরোনো পাতলা একফালি নীলচে সাদা ধোঁয়ার দিকে চেয়ে রইলেন রাহাত খান।

হঠাৎ রানা বুঝতে পারল কিছু একটা ব্যাপারে বিব্রত বোধ করছেন মেজর জেনারেল। ঠিক কেমন ভাবে কথাটা পাড়বেন বুঝতে পারছেন না তিনি। সাহায্য করতে ইচ্ছে করল রানার, কিন্তু কি বলতে গিয়ে কি বলে ফেলবে ভেবে চুপ রয়ে গেল। একটু নড়েচড়ে আয়েস করে বসল চেয়ারে, তারপর অন্যমনস্কতার ভান করে নখ খুঁটতে থাকল অলস ভঙ্গিতে।

পাইপ থেকে চোখ তুলে একটু কেশে গলা পরিষ্কার করলেন রাহাত খান।

'বিশেষ কোন কাজ আছে তোমার আজ সন্ধ্যায়, রানা?'

'না তো, তেমন কিছুই কাজ নেই। কোন দরকার আছে নাকি, স্যার?'

'দরকার মানে, না—হ্যাঁ,' নিজের অস্বস্তির জন্যে নিজেই বিরক্ত হয়ে উঠলেন রাহাত খান। ভ্রূকুটি করে চাইলেন রানার দিকে, যেন রানারই দোষ। 'তবে ব্যাপারটা আমাদের কাজ সংক্রান্ত কিছু নয়। অনেকটা ব্যক্তিগত ব্যাপারের মত। ভাবছিলাম, তুমি হয়তো সাহায্য করতে পারতে।'

'নিশ্চয়ই পারব, স্যার,' বলল রানা। খুশি হয়ে উঠল সে এই অস্বস্তিকর অবস্থাটা কাটল বলে। এইবার বলে ফেলবে বুড়ো মিঞা গড়গড় করে। খুব সম্ভব কোন নিকট আত্মীয় বিপদে পড়েছে। আই. বি.-র কাছে সাহায্য চাইলেই খুশি হয়ে সাহায্য করত ওরা—হয়তো উনি ওদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে চান না। ব্ল্যাকমেইল খুব সম্ভব। কিংবা স্মাগলিং-ও হতে পারে। মেজর জেনারেল রাহাত খান যে ওর কাছেই সাহায্য চাইবেন বলে স্থির করেছেন সেজন্যে ধন্য হয়ে গেল রানা। ভিতর ভিতর গর্ব অনুভব করল সে। ওর সাধ্যমতো ও করবে। ব্যক্তিগত কাজে রানাকে ব্যবহার করতে এই নিষ্ঠাবান বৃদ্ধের যে কি পরিমাণ খারাপ লাগছে বুঝতে পারল সে অনায়াসে। ওঁর কাছে ব্যক্তিগত ব্যাপারে রানার সাহায্য নেয়া আর অফিসের টাকা খরচ করে ফেলা প্রায় সমান অপরাধ।

'খুব বেশি সময় নষ্ট হবে না তোমার। বড় জোর ঘণ্টা তিনেক।' একটু থেমে সোজাসুজি চাইলেন তিনি রানার চোখের দিকে। 'শিল্পপতি গোলাম হায়দারের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই।'

'নিশ্চয়ই, স্যার,' বলল রানা বিস্মিত কণ্ঠে। হঠাৎ এই নামটা উচ্চারণ করবেন বৃদ্ধ ভাবতেও পারেনি সে। 'কে না শুনেছে ওঁর নাম? যে কোন দৈনিক পত্রিকা খুললেই কিছু না কিছু পাওয়া যাবে ওঁর সম্বন্ধে। দৈনিক অবজারভার তো প্রতি রোববার ধারাবাহিকভাবে জীবনী ছাপছে ওঁর। আশ্চর্য সব ঘটনা! এত অল্প বয়সে মানুষ...'

'জানি,' থামিয়ে দিলেন রানাকে রাহাত খান। নিভে যাওয়া পাইপটা ধরিয়ে নিলেন আবার। চুপচাপ পনেরো সেকেন্ড চেয়ে রইলেন পশ্চিম আকাশে গোধূলির রঙের দিকে। তারপর বললেন, 'তবু, বলো দেখি ওর

সম্বন্ধে যা জানো। তোমার ধারণার সঙ্গে আমারটা মিলিয়ে দেখতে চাই আমি।'

মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে প্রস্তুত হলো রানা। অসংলগ্ন কথা সহ্য করতে পারেন না রাহাত খান। প্রত্যেকটি কথা পরিষ্কার এবং যুক্তিসঙ্গত হতে হবে।

'ন্যাশনাল হিরো ভদ্রলোক এ-দেশের। জনসাধারণের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন তিনি নিজ মহত্ত্বে। মেজর আজীজ ভাট্টি বা স্কোয়াড্রন লীডার আলমের মতই। সেপ্টেম্বরের পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ই প্রথম পরিচয় ঘটল জনসাধারণের এঁর সঙ্গে। যুদ্ধ তহবিলে দু'কোটি টাকা দান দিয়ে শুরু হলো। তারপর একের পর এক হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন তিনি। জনসাধারণের ধ্যান-ধারণায় তিনি প্রেরিত মানব না হলেও একজন অতি-মানব। গত বছরই খেতাব পেলেন তিনি প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে। দেশের জন্যে দশের জন্যে তাঁর যে বিপুল দান, যে কঠোর পরিশ্রম, যে অসীম সহানুভূতি তাতে আগামী নির্বাচনে দাঁড়ালে যাচ্ছেতাই একটা কিছু ঘটে যেতে পারে।' রানা লক্ষ করল ক্ষীণ একটা বিদ্রূপাত্মক হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল রাহাত খানের ঠোঁটে। 'যাই বলেন, স্যার, এত কম বয়সে এত সুনাম অর্জন করা সহজ কথা নয়। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে উনি কেবল দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি হিসেবেই নয়, দেশের শ্রেষ্ঠ সম্মানিত নাগরিক হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজেকে।'

শুষ্ক হাসি হাসলেন রাহাত খান। 'তুমি দেখছি লোকটার গুণ-কীর্তনই করে চলেছ পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধির শিল্পী-পরিচিতির মত। অসাধারণ লোক তাতে সন্দেহ নেই। তথ্য কি জানো ওর সম্বন্ধে তাই বলো। আমি তো সরকারী সূত্র থেকে তেমন কোন তথ্য বের করতে পারলাম না। ওর নামে কোন ফাইল নেই, পুলিস বা আই. বি. রিপোর্ট নেই—এটুকুই জানতে পেরেছি কেবল।'

এবার সত্যিই অবাক হলো রানা। এই লোকটার সম্পর্কে এই ধরনের খোঁজ-খবর কেন করছেন কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ মেজর জেনারেল রাহাত খান? সত্যিই তো! এই লোকটার সম্বন্ধে সত্যিকার তথ্য কয়টা জানে দেশের লোক? খানিকক্ষণ চুপচাপ খোলা জানালা দিয়ে কালচে হয়ে আসা আকাশের দিকে চেয়ে রইল রানা। দূরে অনেকগুলো চিল একজায়গায় উড়ে বেড়াচ্ছে ঘুরে ঘুরে—বোধহয় একঝাঁক পোকা নতুন পাখা গজাবার আনন্দে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে উড়াল দিয়েছে অসীমের পানে, তাই খাচ্ছে ধরে ধরে। আঁধার হয়ে আসছে চারদিক; কিন্তু কোনদিকে দৃকপাত নেই, ব্যস্তসমস্ত হয়ে টপাটপ গিলে চলেছে ওরা যে যত পারে।

'খুব অল্পদিনে বড়লোক হয়েছেন ভদ্রলোক, তাতে সন্দেহ নেই,' বলল রানা, 'কিন্তু এ রকম হঠাৎ বড়লোক তো আরও অনেকেই আছে, স্যার। এদের অনেকের অতীতই আমরা জানি না। হয়তো পুলিস বা আই. বি.-র ফাইলেও কিছু পাওয়া যাবে না। কিন্তু ওর ব্যাপারেই কেন এ কথা জিজ্ঞেস

করছেন, স্যার?'

'কি কি ব্যবসা আছে ভদ্রলোকের তা জানো?' প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে গেলেন বৃদ্ধ আরেকটা প্রশ্ন করে।

'খুলনায় জুটমিল, চিটাগাং-এ কোটি কোটি টাকার ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী, টঙ্গীতে সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি, তেজগাঁয়ে হায়দার ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, করাচিতে কটন মিল, জাপানী কয়েকটা গাড়ির এজেন্সী, এ ছাড়াও কয়েকটা মস্ত বড় বড় হোটেল, আরও কত কি!'

'কয়দিনে হয়েছে এ সবকিছু?'

'তিন বছরে।'

'অনেক টাকা লোকটার, তাই না?'

'কোটি কোটি।'

'সেই জন্যেই তো আশ্চর্য হয়েছি।' কথাটা শেষ না করে কিছুক্ষণ এক মনে পাইপ টানলেন রাহাত খান। তারপর আবার সোজাসুজি চাইলেন রানার চোখের দিকে। 'হ্যাঁ। রূপকথার মত কাহিনী, অসাধারণ একজন মানুষ, সব সত্য। শুধু একটা জিনিস...' তন্ময়ভাবে মাথার পিছন দিকটা চুলকালেন বৃদ্ধ।

'কি জিনিস, স্যার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ক্লাবে গোলাম হায়দার তাস খেলার সময় জোচ্চুরি করে।'

তিন

'জোচ্চুরি করে!' চমকে উঠল রানা।

'হ্যাঁ। চুরি করে সে তাস খেলতে গিয়ে। রমনা ক্লাবের সেক্রেটারিরও এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কিছুই করতে পারছে না সে। কোটিপতি একজন লোক স্টেকে ব্রিজ খেলতে গিয়ে চুরি করে, ভাবতে অবাক লাগছে না তোমার?'

'না, স্যার।' সামলে নিয়েছে রানা। 'শুনেছি অনেক কোটিপতি পেশেন্স খেলতে গিয়েও নিজেকে ঠকায়।' হাসল ও।

'তোমার কাছে এটা হাসির ব্যাপার হলেও আসলে গোলাম হায়দারের এই সামান্য বড়লোকী খেয়ালের জন্যে অনেক লোকের সর্বনাশ হয়ে গেছে, ইতিমধ্যেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন করে? রমনা ক্লাবের ব্যাপার তো জানোই। বিরাট বিরাট সব লোকের সমাবেশ ওখানে—দেশের মাথা একেকজন। সেই ক্লাবে বসে জোচ্চুরি করার মধ্যে হাসির কিছুই নেই। ধরা পড়লে যত বড় ন্যাশনাল হিরোই হোক না কেন, ধূলিসাৎ হয়ে যাবে চিরকালের জন্যে। পত্রিকায় ছড়িয়ে পড়বে খবর, মুখে চুনকালি মেখে বিদায় করে দেয়া হবে তাকে সমাজ থেকে। এটা কত বড় একটা রিস্ক চিন্তা করতে পারো?'

'তাই তো!' বলল রানা নির্জীব কণ্ঠে।

'ব্যাপারটা ভেঙেই বলছি। আজ সকাল বেলা আমার বাসায় গিয়ে হাজির হয়েছিল আমার এক পুরানো বন্ধু ব্রিগেডিয়ার ইফতিখার। বেচারা বছর কয়েক হয় রিটায়ার করেছে। আমারই বুদ্ধিতে আজ ক'দিন হলো পেনশনের সব টাকা একসাথে তুলে নিয়েছে সে ব্যবসা করবে বলে। প্রায়ই যায়, গতকাল সন্ধ্যায়ও রমনা ক্লাবে গিয়ে বসেছিল সে। পরিচয় ছিল গোলাম হায়দারের সঙ্গে, অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে হাই স্টেকে বসেছিল ব্রিজ খেলতে। ঝোঁকের মাথায় পেনশনের সব টাকা তো গেছেই, ব্যাঙ্কে জমানো বত্রিশ হাজার টাকাও গেছে। এখন নিঃস্ব পথের ভিখারী সে।'

'মোট কত টাকা, স্যার?'

'নব্বুই হাজার।'

চুকচুক শব্দ করল রানা জিভ দিয়ে। এইবার ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারল সে। কেন ওকে ডেকে এনে এত কথা বলছেন রাহাত খান, তা-ও আন্দাজ করতে পারল। খুঁচিয়ে পোড়া ছাই বের করে অ্যাশট্রেতে ফেলে থ্রী নানস্-এর কৌটো থেকে আবার পাইপে টোবাকো ভরলেন রাহাত খান। সেটা না ধরিয়েই কথার খেই ধরলেন আবার।

'ক্লাবের চেয়ারম্যান রেমান আমার পরিচিত। ওকে ফোন করে সব ব্যাপার বলতেই ওর বহুদিনের চেপে রাখা সন্দেহের কথা বলল। ধরতে পারেনি কখনও, কিন্তু ওর স্থির বিশ্বাস চুরি করে গোলাম হায়দার ব্রিজ খেলায়। স্ক্যান্ডালের ভয়ে চুপ করে আছে সে, কাউকে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না। আমার সাহায্য চেয়ে বসল সে এই ব্যাপারে। রাজি হয়েছি আমি।' পাইপটা এবার ধরিয়ে নিলেন রাহাত খান। ঘরটা অন্ধকার হয়ে আসছে। একটা সুইচ টিপে দিতেই চোখ ধাঁধানো চারটে উজ্জ্বল বাতি জ্বলে উঠল ঘরের চারকোণে। 'আমি শুনেছি তাস খেলায় তোমার জুড়ি নেই। তুমি হয়তো ধরতে পারবে কিভাবে চুরি করে ও, পারবে না?'

'ওর খেলা না দেখলে বলা যায় না, স্যার। হাজারো রকম চুরি আছে। কিংবা হয়তো অস্বাভাবিক কপাল গুণও হতে পারে। দেখলেই বুঝতে পারব।'

'বেশ। আজও গোলাম হায়দার ঢাকায় আছে। কাল চলে যাবে চিটাগাং। ঢাকায় থাকলে ক্লাবে সে আসবেই। ক্লাবে এলেই ব্রিজ খেলবে। পারবে তুমি সাড়ে আটটার দিকে একবার ক্লাবে আসতে? অসুবিধা নেই তো কোন?'

'কিছু অসুবিধে নেই, স্যার। আমি ঠিক সাড়ে আটটার দিকে পৌঁছে যাব। আপনি থাকবেন নাকি, স্যার?'

'না, আমার একটা ডিনার আছে ইন্টারকন্টিনেন্টালে। ব্রিগেডিয়ার ইফতিখার থাকবে গেটের কাছে, কোন অসুবিধে হবে না তোমার।'

'ঠিক আছে। কিন্তু একটা কথা, স্যার, যদি দেখি গোলাম হায়দার সত্যিই চুরি করছে তাহলে কি করব? আমি যে বুঝে ফেলেছি কেবল সেই কথাটা জানিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হব, না আরও কিছু করতে হবে?'

'আমি দশটার দিকে পৌঁছে যাব ক্লাবে। কি করতে হবে তা আমি ওখানেই বলব তোমাকে। তুমি আগে গিয়ে সব দেখে শুনে বুঝে রাখবে। আচ্ছা?'

'জী, স্যার।'

'আর ভাল কথা, সাপারটা ক্লাবেই খেয়ে নিও। বিল আমি পে করব।'

হেসে ফেলল রানা। বলল, 'আচ্ছা, স্যার।'

বেরিয়ে এল সে রাহাত খানের এয়ার-কুলড কামরা থেকে। আস্তে ভিড়িয়ে দিল দরজাটা। নিশ্চিন্ত মনে শিস্ দিতে দিতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচতলায়।

বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে গেল রানার লরেল গ্রীন মেটালিক কালারের করোনা সিডান প্রকাণ্ড বাড়িটার প্রশস্ত গেট দিয়ে।

চার

হেঁটে বেড়াচ্ছে রাঙার মা!

সামনের লনে মালীর কাজের তদারকি করছে সে। অবাক হয়ে এগিয়ে গেল রানা।

'ব্যাপার কি, রাঙার মা? চাঙ্গা হয়ে উঠেছ দেখছি?'

দন্তহীন মিষ্টি হাসল রাঙার মা। গত কয়েক মাস যাবৎ সাঙ্ঘাতিক বাতে ভুগছিল সে—মাঝে হাসপাতালে ছিল দেড় মাস। নড়াচড়ার ক্ষমতা ছিল না। নানান রকম চিকিৎসায় কোন ফল হয়নি। অনেক বড় বড় ডাক্তার ফেল পড়ে গেছে। রিমোটয়েড আরথ্রাইটিস্। গত পরশু দিন রানার এক বন্ধু আর্মির এক্স-সার্ভিসম্যান খোন্দকার ইলিয়াস দেওয়ানের মুখে এই রোগটার নাম শুনেই চমকে উঠেছিল রানা। ওঁরও নাকি হয়েছিল। বহুদিন পড়ে ছিলেন করাচি হাসপাতালে। ইনভ্যালিড হিসেবে রিটায়ার করেছেন। এমনি সময় পাকিস্তানে এলেন রানী এলিজাবেথ, সঙ্গে এলেন ওঁর নিজস্ব ফিজিশিয়ান একজন। জুরিখের ডাক্তার—নাম মনে নেই, পা খোঁড়া, ইনভ্যালিড চেয়ারে বসে চলাফেরা করেন। সেই ডাক্তার এসেছিলেন হাসপাতাল পরিদর্শন করতে। দেওয়ান সাহেবকে দেখেই মৃদু হেসে সাধারণ একটা ওষুধ প্রেসক্রাইব করে গিয়েছেন। বলে গিয়েছিলেন প্রথম দু'দিন দিনে চারটে বড়ি, তারপর দু'দিন তিনটে করে, তারপর একহপ্তা একটা করে—আর বাকি জীবন চার ভাগের একভাগ করে খেতে হবে। আশ্চর্য ধন্বন্তরি সে ওষুধ। দু'দিন পরই বাড়ি চলে এসেছিলেন হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে।

'কি ওষুধ?' জিজ্ঞেস করেছিল রানা।

'প্রিডনিকর্ট, তিরিশটা ট্যাবলেট থাকে ফাইভ মিলিগ্রামের। দাম চার টাকা। সাধারণত হাঁপানি জাতীয় রোগে এই ওষুধটা দেয় ডাক্তারেরা। কিন্তু

এটা বাতেরও সাংঘাতিক ওষুধ। প্রথম দিকে প্রস্রাব হয় খুব। কিন্তু জীবনে আর কাছে ঘেঁষতে পারে না বাত।'

সেইদিনই এক ফাইল কিনে এনে প্রয়োগ করেছিল রানা রাঙার মার ওপর। গতকাল সন্ধ্যায়ও শয্যাশায়ী দেখেছে সে বৃদ্ধাকে, আর আজ দিব্যি বাগান তদারক করে বেড়াচ্ছে।

'একটুও ব্যথা নাই, আব্বা। আগে এ ওষুধ পালি আর এতটাকা নষ্ট হতো না চিকিচ্ছের পিছনে। আব্বাই তো মস্তবড় ডাক্তার দেখতে পাচ্ছি, নম্বা নম্বা পাস দিয়ে ডাক্তারগুলোন চিত্তির হয়ে গেল...'

কথার শেষ না শুনেই দ্রুতপায়ে নিজের কামরায় ঢুকল রানা। জানালার ভারি পর্দাগুলো টেনে দিয়ে কাপড় ছেড়ে তোয়ালে কাঁধে নিয়ে ঢুকে পড়ল অ্যাটাচড় বাথরুমে। তার আগে চালু করে দিল নতুন বসানো এয়ারকুলারটা।

দশ মিনিট শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে দেহটা জুড়িয়ে গেল রানার। গা মুছে চুলগুলো ব্রাশ করে নিয়ে চলে এল সে বেডরুমে। ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে ঘরটা। একটা ঢিলা শার্ট আর পাজামা পরে বুক-শেল্ফের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। এড্মন্ড রিফের 'কার্ড চীটিং' বইটা বের করে নিয়ে রাইটিং টেবিলে গিয়ে বসল। ড্রয়ার থেকে বের করল নতুন এক প্যাকেট তাস। কয়েক রকম শাফলিং এবং কার্ড বাঁটা প্র্যাকটিস করল সে বিশ মিনিট। কয়েকটা চ্যাপ্টারে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল একবার। কফির জন্যে বেল বাজিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করল। ভাববার চেষ্টা করল ব্রিজের কয়েকটা কাল্‌বার্টসন কমবিনেশনের কথা। যেখানে যেখানে সন্দেহ হলো পাতা উল্টে দেখে নিল বইটা। কফি নিয়ে ঢুকল মোখলেস।

'কিরে, রাঙার মা সেরে গেছে মনে হচ্ছে? এবার তোর কাজের চাপ একটু কমবে।'

'বাড়বে, স্যার। ওর ফাই-ফরমাশ খাটতে খাটতে জান বেরিয়ে যায়, চোদ্দবার করে বাজারে পাঠায়। কথা না শুনলে কান ঝালাপালা করে দেয়। বয়স যত বাড়ছে কথা বাড়ছে তার ডবল।'

'কই, আমি তো তেমন কিছু শুনতে পাই না?'

'আপনি যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন, ওর কলজেটা ঠাণ্ডা থাকে। একটি রা নেই মুখে—আদর করে ডেকে আমাকে এটা ওটা খাওয়ায়। যেই বেরিয়ে গেলেন অমনি ডিগ্রী চড়তে থাকল মেজাজের। আপনি যত দেরি করবেন, ততই খেপে যাবে ও আমার ওপর। আর পারা যায় না, স্যার। জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে আমার।'

'তবে যে শুনলাম সেবার ওকে যশোরের ট্রেনে তুলে দিতে গিয়ে কাঁদছিলি তুই?'

'যখন আদর করে তখন সব ভুলে যাই, স্যার,' লজ্জিত কণ্ঠে কথাটা বলেই তাড়াতাড়ি কেটে পড়ল মোখলেস। স্যারের কাছে আরও কি দুর্বলতা বেরিয়ে পড়বে কে জানে!

মৃদু হেসে কফিতে চুমুক দিল রানা। টের পেল, রাঙার মায়ের হাতের

কফি। নিজের রাজত্ব আজই দখল করে নিয়েছে রাঙার মা, এরই জন্যে মোখলেসের এত অসন্তোষ। দিনরাত ঝগড়া লেগে আছে ওদের মধ্যে। অথচ এই রাঙার মা-ই যখন হাসপাতালে ছিল তখন সকাল-বিকেল ওখানে মোখলেসের ধরনা দিয়ে পড়ে থাকা দেখলে কে বলবে ওরা আপন মা-বেটা নয়?

কফিটুকু শেষ করে বিছানার ওপর শবাসনে শুয়ে পড়ল রানা। এক এক করে পা, হাত, মুখ, গাল, কপাল ঢিল করে চোখ বন্ধ করল। শরীরের কোথাও কোন স্নায়ু বা পেশীতে চাপ বা টান পড়ছে না আর। এবার মাথার মধ্যে থেকে একে একে সমস্ত চিন্তা আর উদ্বেগ দূর করে দিল সে। বিশ্রাম। চুপচাপ মড়ার মত পড়ে রইল সে পাঁচ মিনিট। তারপর যখন উঠে বসল তখন রানার শরীরে ক্লান্তির লেশমাত্র নেই। সম্পূর্ণ সতেজ, সজীব ওর দেহ-মন।

ধীরে সুস্থে হালকা ছাই রঙের ট্রপিকালের স্যুটটা পরে নিল রানা। কালো সিল্কের টাই বাঁধতে বাঁধতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় দুটো সাদা সিল্কের রুমাল বের করে দলা পাকিয়ে ভাঁজ ভেঙে কোটের দুই সাইড-পকেটে রাখল সে একটা করে। শোল্ডার হোলস্টারে লুকানো পিস্তলটা বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে কিনা একবার পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। চমৎকার সন্ধ্যা কাটবে আজ রমনা ক্লাবে।

সারাদিনের গরমের পর মিষ্টি একটা হাওয়া বইছে সন্ধের পর থেকে। উল্টোপাল্টা মাতাল হাওয়া। আজ চৈত্রের শেষ। রমনা পার্কের পাশের চওড়া সড়ক দিয়ে যেতে যেতে রানার কাছে অদ্ভুত সুন্দর লাগল পৃথিবীটা।

রমনা ক্লাবের গেটের কাছেই পায়চারি করতে দেখা গেল এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে। পাতলা, লম্বা, পিঠটা একটু কুঁজো। ভুরু জোড়া কুঁচকে থাকায় কপালে ভাঁজ পড়েছে কয়েকটা। দুশ্চিন্তার ভাঁজ।

'ব্রিগেডিয়ার ইফতিখার?' এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা সম্ভ্রমের সঙ্গে।

'ইয়েস! হু দা হেল ইউ আর?' কট্‌মট করে চাইলেন ব্রিগেডিয়ার রানার দিকে।

বাবা! রানা ভাবল, কি গম্ভীর আর কর্কশ কণ্ঠস্বর! চেহারার দিকে চেয়ে না থাকলে বিশ্বাসই করা যায় না এই চিকন লোকটার মধ্যে থেকে এত মোটা আওয়াজ বেরোতে পারে।

'মেজর জেনারেল রাহাত খান পাঠিয়েছেন আমাকে,' বলল রানা বিনয়ের সঙ্গে, 'আমার নাম মাসুদ রানা।'

মুহূর্তে কেঁচো হয়ে গেলেন ব্রিগেডিয়ার। 'সরি, মাই বয়, আমি দুঃখিত। বড্ডো টেনশনের মধ্যে আছি, ভাই, কিছু মনে কোরো না। আমিও তো তারই জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'উনি বিশেষ কাজে আটকে গেছেন, আসতে দেরি হবে, তাই আমাকে পরিচয় করে নিতে বলেছেন আপনার সঙ্গে। চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক।'

'ভেতরে গিয়ে আর কি হবে? তুমি জানো না, সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার ওর ভেতরে ঢুকে। সর্বস্ব খুইয়েছি। আত্মহত্যাটা করতে পারছি না কেবল মেজর জেনারেলের অনুরোধে। তা তুমি এসেছ, ভাল কথা—কিন্তু তোমাকে দিয়ে আমার কি হবে? এত করে বললাম, যা গেছে, সে তো আর ফিরবার নয়, শুধু শুধু....'

'আগে ভেতরে চলুন, তারপর আলাপ করা যাবে। এসে গেছেন গোলাম হায়দার সাহেব?'

'না। ও ন'টার আগে আসে না।'

'ততক্ষণে আমরা সাপারটা সেরে নিই, চলুন। বিলটা মেজর জেনারেল পে করবেন বলেছেন।'

অভিজাত রমনা ক্লাবের মোজাইক টাইল বসানো চকচকে মেঝের উপর দিয়ে এগিয়ে গেল ওরা ডাইনিং রুমের দিকে। নানান রকমের ভাল মন্দ খেলার ব্যবস্থা আছে ক্লাবটায়। একদিকে স্কোয়াশ, টেবিল টেনিস; একদিকে দাবা, স্ক্র্যাবল, ক্যারম, আর এক কোণের ওই মস্ত ঘরটায় তাস। ব্রিজ আর পোকার ছাড়া অন্য কোন রকম তাসের জুয়া এখানে চলে না—কিন্তু এত উঁচু স্টেকে ব্রিজ-পোকার সারা দেশে আর কোথাও খেলা হয় কিনা সন্দেহ। আরও অনেক রকমের খেলার ব্যবস্থা আছে, টেনিস, গলফ, সুইমিং। সুইমিং পুলের অভিজাত শয়তানির পর বিশ্রামের জন্যে আছে রেস্টরুম আর 'বার'। কি নেই? বিদেশী কায়দার অর্কেস্ট্রা, রুল্, টুইস্ট, সব আছে। সব কিছুতেই একটা আভিজাত্যের প্রলেপ মাখানো।

ইউনিফরম পরা ধোপ-দুরস্ত বয়, বেয়ারা, পেজ, রিসেপ্‌শনিস্ট, গেট-কীপার, পোর্টার—কোথাও পান থেকে চুন খসবার উপায় নেই।

ডাইনিং রুমে বসে মেনুর দিকে চেয়েই মুড পরিবর্তন হয়ে গেল ব্রিগেডিয়ারের। অকৃপণভাবে ফরমায়েশ দিয়ে চললেন তিনি। মুরগীর রোস্ট, বিরিয়ানি, কাবাব, মাটন্ কোর্মা, মাটন্ রেযালা; কিন্তু সবচেয়ে আগে চাই চিকেন সুপ, আর সবশেষে কোল্ড পুডিং এবং কফি। রানা বুঝল, সেরেছে! বারোটা বেজেছে আজ রাহাত খানের। এক সাপারেই ধসিয়ে দেবে ব্রিগেডিয়ার। আত্মহত্যার আগে শেষ খাওয়া খেয়ে নিতে চাইছে নাকি লোকটা?

টেবিলের ওপর খাবার সাজিয়ে দিতেই অমায়িক হাসি ফুটে উঠল ব্রিগেডিয়ারের মুখে। চোখ নাচিয়ে ইঙ্গিত করলেন তিনি রানাকে, তারপর বললেন, 'নাও হে ইয়ংম্যান, শুরু করে দাও। আলাপ-আলোচনা পরে হবে। এগুলো সামনে রেখে শুধু শুধু আত্মাকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ?'

কথা বলতে বলতেই ন্যাপকিনটা বিছিয়ে ফেললেন ব্রিগেডিয়ার উরুর উপর। তারপর প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন একখানা আস্ত মুরগীর রোস্টের বিরুদ্ধে। প্রচুর পরিমাণে খেলেন ব্রিগেডিয়ার, রানাকেও কখনও তাড়া দিয়ে, কখনও মিষ্টি কথা বলে, বকা-ঝকা করে বাধ্য করলেন খেতে। এত শুকনো-পাতলা লোককে এত বেশি খেতে দেখেনি রানা আগে কখনও। পুডিং শেষ

করে দুই গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খেয়ে প্রকাণ্ড একটা ঢেকুর তুললেন ব্রিগেডিয়ার, যেন সম্মুখ-যুদ্ধে পরাজিত করেছেন তিনি প্রবল কোন শত্রুকে, তারপর একখানা কিং স্টর্ক সিগারেট বের করে ধরালেন।

'বুঝলে হে, আজই ধরেছি ব্র্যান্ডটা। একেবারে মন্দ নয় খেতে। দেখবে নাকি টেস্ট করে?'

'না, স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ।'

'আরে, লজ্জা কিসের? আমি ওসব মাইন্ড করি না। আমার সামনে খেতে পারো, ওসব বাজে প্রেজুডিস আমার নেই। কি নাম যেন বললে তোমার হে, ছোকরা?'

'মাসুদ রানা।' বাড়িয়ে ধরা প্যাকেট থেকে একটা বগা সিগারেট নিতে বাধ্য হলো রানা, কিন্তু ধরাল না।

'তা "স্যার"। বলছ কেন আমাকে? আমি তো রিটায়ার করেছি। তাছাড়া টাকা-পয়সাও সব খুইয়ে বসে আছি। আমি তো পথের ভিখিরি, হে। আমাকে সম্মান দেখিয়ে লাভ কি? কোথাও কোন স্থান নেই আমার আর।'

রানা বুঝল, সারা জীবনের সঞ্চয় এভাবে ঝোঁকের বশে খুইয়ে ফেলে ভয়ঙ্কর অনুশোচনায় ভুগছেন ব্রিগেডিয়ার। প্রতিটা কথায় নিজেকে যেন চাবুক মারছেন তিনি। কেমন যেন মায়া হলো রানার বেচারার প্রতি। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে সে ব্রিগেডিয়ারের চরিত্র। অত্যন্ত ভাল মানুষ, কিন্তু সংযম নেই। দিলটা বড়, কিন্তু সেই তুলনায় সামর্থ্য নেই।

'এক্সকিউজ মি, আপনি কি মি. মাসুদ রানা আছেন?' একজন ভদ্রলোক এসে দাঁড়াল গা ঘেঁষে। বাংলায় উর্দুভাষী টান।

'দ্যাটস্ রাইট। আপনাকে তো চিনলাম না?'

'হামি এই ক্লাবের চেয়ারম্যান, রেমান আছি। আনিসুর রেমান। আভি আভি মেজর জেনারেল রাহাত খান ফোনে হামাকে জানাইলেন, ব্রিগেডিয়ার ইফতিখারের সাথ্ যিনি সাপার খাচ্ছেন তাঁর নাম মেজর মাসুদ রানা। যেন তাঁকে হামার তরফ থেকে পুরা অ্যাসিস্ট্যান্স, ইয়ানে, সহযোগিতা করা হোয়।'

'কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি সেটা জানা আছে আপনার?'

'আলবাৎ। দোপহেরে কোথা হয়েছে হামার সাথে।' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল চেয়ারম্যান রানার পাশে।

'এসে গেছে মক্কেল?'

'হাঁ।'

'আপনি কি মনে করেন, উনি জোচ্চুরি করেন?'

'কসম খেতে পারব না। ও আপনি দেখলেই মালুম হয়ে যাবে। আসুন হামার সাথ্, কাছু আন্দাজা লাগলে ইশারা কোরবেন। হামি স্যমঝে লিব। বাহার নিকলিয়ে বাতচিত হোবে। ঠিক হ্যায়?'

'ঠিক হ্যায়, চলুন।'

ব্রিগেডিয়ারকে ডাইনিং রুমেই কফি দিয়ে বসিয়ে রেখে চলে গেল রানা

চেয়ারম্যানের সাথে কার্ড-রুমের দিকে। দশটা ব্রিজ এবং ছয়টা পোকারের টেবিল সাজানো আছে ঘরটায়। বেশির ভাগ টেবিলই জমজমাট হয়ে গেছে সোয়া ন'টাতেই। আরও লোক আসবে। শেষ রাত পর্যন্ত চলবে খেলা। এয়ার-কুলড্ ঘরটা গমগম করছে টুকরো টুকরো কথা, বিস্ময়ধ্বনি, আর থেকে থেকে দরাজ গলার অট্টহাসিতে।

প্রথমেই চোখ পড়ল রানার অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতীর উপর। অদ্ভুত দৃপ্ত ভঙ্গিতে বসে আছে সে তাস হাতে নিয়ে। কাজল-কালো আকর্ষণীয় দুটো চোখ—লম্বা ঘন পাপড়িগুলো উপর দিকে বাঁকানো। মনে হচ্ছে চেয়ে তো নেই, যেন স্বপ্ন দেখছে চোখ দুটো। কাটা চেহারা। মুখের আদল এবং গায়ের রং দেখে এদেশী মনে হলো না। তারই সামনে রানার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে কোটিপতি গোলাম হায়দার। পিছন থেকে প্রকাণ্ড একটা মাথাভর্তি এলোমেলো চুল ছাড়া কিছু দেখা গেল না গোলাম হায়দারের।

'ওই ছোক্‌রি হায়দারের পার্টনার। আওর দু'জন হামার লোক,' বলল রেমান রানার কানে কানে।

'ডাবল্!' চিৎকার করে উঠল গোলাম হায়দার। উদ্ধত, কর্কশ কণ্ঠস্বর।

'এইবার বাগে পেয়েছি বাবা, গোলাম হায়দার! এবার আর ছাড়াছাড়ি নেই— লাগাও রি-ডাবল। বলুন, মেমসাহেব?' বলল গোলাম হায়দারের বামে বসা লোকটা। সি. অ্যান্ড বি-র ফার্স্ট ক্লাস কন্ট্রাক্টর ভদ্রলোক।

'নো বিড,' বলল সুন্দরী কার্ড থেকে চোখ তুলে। হঠাৎ রানার ওপর থমকে গেল ওর দৃষ্টিটা।

'নোপ,' বলল কন্ট্রাক্টরের পার্টনার।

'আমারও নো বিড,' বলল গোলাম হায়দার।

'বেশ। ফাইভ হার্টস রি-ডাবল্ড। আপনার লিড, মেমসাহেব,' বলল কন্ট্রাক্টর উৎসাহিত কণ্ঠে।

'অ্যাই, খেলতে এসেছ, ভদ্রভাবে খেলো। খবরদার, ''মেমসাহেব, মেমসাহেব'' করে টিটকারি মারবে না বলে দিচ্ছি!' হঠাৎ টেবিলে এক প্রচণ্ড চাপড় মেরে গর্জে উঠল গোলাম হায়দার।

হকচকিয়ে গিয়ে ঢোক গিলল কন্ট্রাক্টর, 'বেশ, কি বলতে হবে শিখিয়ে দাও।'

'মিস্ রুমানা বলবে।'

'আচ্ছা আচ্ছা। দিন, ডিল দিন, মিস্ রুমানিয়া।'

ফিক্ করে হেসে ফেলল সুন্দরী। বলল, 'আরেকবার বকা খেলে মিস বুলগেরিয়া বলে ডেকে ফেলবেন মনে হচ্ছে!'

মেয়েটির মুখে চমৎকার ঝরঝরে ইংরেজী শুনে একটু অবাক হলো রানা। লম্বা পা ফেলে গোলাম হায়দারের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল সে। স্পেড আর ডায়মন্ডের টেক্কা আছে ওর হাতে। চট্‌পট্ নিয়ে নিল সে দুটো দান। আবার স্পেড খেলতেই নিচের হাতের কিং দিয়ে ধরল কন্ট্রাক্টর দানটা।

'এইবার!' বলল সে পুলকিত কণ্ঠে। 'কুইন নিয়ে মোট চারটে রঙের

কার্ড বাইরে। দেখো, গোলাম হায়দারের রানীকে ঘরের বার করি কি রকম। ভাল চাও তো দিয়ে দাও রানী, নইলে নয় টপেই দান নিয়ে নিচ্ছি।' হার্টসের নয় খেলল সে নিচের হাত থেকে।

তিন ফেলল গোলাম হায়দার।

দুই ফেলল কন্ট্রাক্টর।

কুইন দিয়ে দান জিতে নিয়ে গেল রুমানা। ডাণ্ডা পড়ল যেন ট্রিকের মাথায়।

তাজ্জব হয়ে চেয়ে রইল কন্ট্রাক্টর টেবিলের উপর চিত হয়ে পড়ে থাকা রানীর দিকে। হাঁ হয়ে গিয়েছে ওর মুখ। বোকার মত সবার মুখের দিকে চাইল সে একবার। পার্টনারের চেহারা বিকৃত হয়ে যেতেই আত্মরক্ষার তাগিদে বলল, 'আশ্চর্য! ওর হাতে হার্টসের কুইন আসে কি করে?' একটু সামলে নিয়ে রসিকতা করে বলল, 'বাবা, বুদ্ধু বানা দিয়া! ওটা ঠিক কুইন তো, না আপনার ছায়া?' হাতের কার্ডগুলো টেবিলের উপর চিত করে নামিয়ে বলল, 'যাক, বাকি সব আমার। দেখুন পার্টনার, আমার দোষ নেই। ডাবল্ দিল গোলাম হায়দার, কুইন বেরোচ্ছে তার পার্টনারের কাছে থেকে: আমি কি করব?'

'কিছুই করার নেই, দাদা,' বলল গোলাম হায়দার। 'মোট হলো চারশো পয়েন্ট। নাও, তোমার ডিল।' কার্ড কেটে এগিয়ে দিল সে কন্ট্রাক্টরের দিকে। এগিয়ে চলল খেলা।

তার মানে গতবার গোলাম হায়দারের ডিল ছিল, ভাবল রানা। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে দাঁড়াল গিয়ে মেয়েটার পিছনে। বারবার চাইছিল রুমানা ওর দিকে, অস্বস্তি বোধ করতে আরম্ভ করেছিল রানা—তাই দৃষ্টি এড়িয়ে গেল এই ভাবে। তাছাড়া ডিলের মধ্যেই যদি কৌশল থাকে তাহলে, সামনে থেকে দেখতে হবে গোলাম হায়দারকে।

'আপনাদের রাবার কেতনা দূর?' জিজ্ঞেস করল চেয়ারম্যান।

'এই যে, রেমান।' ঘাড় ফিরিয়ে চাইল গোলাম হায়দার চেয়ারম্যানের দিকে। 'তর সইছে না বুঝি? শত্রুপক্ষ হাজির?'

'ব্রিগেডিয়ার এসে পৌঁছায়নি। কিন্তু উনকা পার্টনার এসে গেছেন। উনি ভি এসে যাবেন আখুনি। এই যে উনকা পার্টনার মিস্টার মাসুদ রানা। ইনি মিস্টার গোলাম হায়দার।'

'বেশ বেশ, খুশি হলাম খুব। ব্রিগেডিয়ার আজ তাহলে ফাইন্যান্শিয়ার জুটিয়ে এনেছে। গতরাতের হারা টাকা আজ না উঠিয়ে ছাড়বে না! কিন্তু একটু অপেক্ষা করতে হবে। কি খাবেন হুইস্কি-সোডা, না শুধু সোডা?'

'থ্যাঙ্কস্। কিছুই লাগবে না। এখুনি খেয়েছি।'

যেন খেলা দেখছে এমনি ভাব দেখিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা গোলাম হায়দারের মুখটা। একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায় কাগজে যে ছবি ছাপা হয় তাতে এই ভদ্রলোকের প্রবল ব্যক্তিত্ব, সজীব, প্রাণবন্ত এবং স্বচ্ছন্দ ক্ষমতার বিচ্ছুরণ, কিছুই প্রকাশ পায় না। ফটোর নিচে 'বাঘের বাচ্চা' ক্যাপশন লিখে দিলেও কেউ বুঝতে পারবে না কি দুর্দান্ত শক্তি আছে এর

ভিতরে। কাছ থেকে না দেখলে বুঝবার উপায় নেই। প্রকাণ্ড মাথায় এলোমেলো শুকনো চুল, চিরুনি বা তেলের সাথে কোন সম্পর্ক নেই সে চুলের। অস্বাভাবিক চওড়া কাঁধ। গলায় সাদা একটা গোল দাগ দেখা যাচ্ছে কলারের ঠিক ওপরেই। পিছন থেকেও এই দাগটা লক্ষ করেছিল রানা। মনে হচ্ছে যেন সাদা একটা ফাঁস পরানো আছে ওর গলায়। কড়সড় রসগোল্লার সমান ডান চোখটা কোটর ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। একটি পাপড়িও নেই সে চোখের পাতায়, মণিটা ঘোলাটে, লাল কয়েকটা শিরা দেখা যাচ্ছে সাদা অংশে। বাম চোখ স্বাভাবিক। বাম চোখেই দেখে গোলাম হায়দার। শান দেয়া ছুরির মত মাঝে মাঝে ঝিক করে উঠছে সে চোখ। এবার লোমশ দুটো হাতের দিকে চোখ পড়ল রানার। এত ঘন লোম যে গায়ের রং দেখা যায় না, ফর্সা না কালো বুঝতে হলে মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে হয়। ফর্সা। উপরের পাটির দাঁতগুলো উঁচু হয়ে থাকায় হাসলে লোকটাকে কুৎসিত, ভয়ঙ্কর দেখায়।

হাত দুটো সর্বক্ষণ ব্যস্ত। একটার পর একটা ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেট ধরাচ্ছে, কখনও হাতের তাসগুলো এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক সাজাচ্ছে, কখনও টেবিলের উপর রাখা সিগারেট কেসের পাশে লাইটারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, আর থেকে থেকেই দাঁত দিয়ে ডানহাতের অনামিকার নখ কাটছে। সোনার ঘড়িটা ডান হাতে পরা, রানা একনজর দেখেই বুঝল পাটেক ফিলিপ ঘড়ি। দামী ফ্ল্যানেলের স্যুট, সাদা সিল্কের শার্ট, লাল টাই।

গোলাম হায়দারকে ভাল করে দেখে নিয়ে খেলায় মন দিল রানা। মিনিট পনেরো নিয়ম মাফিক চলল, গেম করতে পারল না কেউ। কোন কৌশল ধরতে পারছে না দেখে ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠল রানা নিজের উপর।

'এবার আমার ডিল,' স্বাভাবিক কর্কশকণ্ঠে বলল গোলাম হায়দার। 'গেমটা করেই ফেলি, কি বলো, কন্ট্রাক্টর? কতক্ষণ আর বেচারাদের বসিয়ে রাখা যায়? রাবার না হলে ওঠা যাচ্ছে না, অথচ চ্যালেঞ্জ বাউটের জন্যে ছট্‌ফট্ করছে মনটা।' কথা বলতে বলতে ধীর স্বচ্ছন্দগতিতে তাস বাঁটতে আরম্ভ করল গোলাম হায়দার। ঝিক্ ঝিক্ করতে থাকল অনামিকায় পরা দশ ক্যারেটের একটা ইয়েলো ডায়মন্ড ঘরের উজ্জ্বল আলোয়। 'কি হে, চেয়ারম্যান, তোমার ব্রিগেডিয়ারের তো কোন পাত্তাই নেই!'

রানা চেয়ে রয়েছে গোলাম হায়দারের হাতের দিকে। হঠাৎ বুঝে ফেলল সে রহস্যটা। ছি-ছি, এত সাধারণভাবে চুরি করছে লোকটা! এত নামজাদা অভিজাত ক্লাব না হয়ে অন্য যে-কোন জায়গায় এই কৌশল করতে গেলে নির্ঘাৎ ধরা পড়ে যেত লোকটা—কান ধরে উঠিয়ে দেয়া হত ওকে টেবিল থেকে। আর রানাই বা কম আহাম্মক নাকি? টেবিলের দিকে একনজর চেয়েই তো বুঝে ফেলা উচিত ছিল ওর ব্যাপারটা। কিন্তু অদ্ভুত সাহস তো লোকটার! সে কি কেয়ার করে না? এত সহজ সাধারণভাবে চুরি করলে যে-কোন মুহূর্তে ধরা পড়তে পারে, এটা কি সে জানে না? লোকটা শাইনার।

'আমি গিয়ে দেখি,' বলল রানা, 'ব্রিগেডিয়ার হয়তো আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন গেটের কাছে।' রেমানের দিকে চেয়ে সামান্য ইঙ্গিত করল রানা, তারপর বেরিয়ে এল ওরা দু'জন বাইরে। গোলাম হায়দার তখন ডেকে বসেছে, ফোর নো ট্রাম্পস্।

সোজা চেয়ারম্যানের অফিস-কামরায় চলে এল ওরা। ব্রিগেডিয়ারকে ডেকে আনতে গেল একজন বেয়ারা। বাতি জ্বেলে দরজা ভিড়িয়ে দিল রেমান।

'কিয়া, মেজর? কিছু বুঝা গেল।'

'হ্যাঁ। চুরি ঠিকই করে।'

'ইয়া আল্লা! ক্যয়া, মুসিব্যত গিরা দিয়া। ক্যয়সে?' আগ্রহের আতিশয্যে নিজের ভাষা বেরোল চেয়ারম্যানের।

'ডিল করবার সময়। চক্‌চকে সিগারেট কেসটা দেখেছেন না টেবিলের ওপর? ডিল করবার সময় প্রত্যেকটা কার্ডের প্রতিচ্ছবি দেখে সে ওর ওপর। কারও চোখে পড়ে না। তাস আর ওর হাত দিয়ে ঢাকা থাকে সিগারেট কেসটা ডিল করবার সময়। কার হাতে কি আছে জানা হয়ে যায় ওর পরিষ্কার। আমরা ঢুকেই যে ডাবল্ দেয়া দেখলাম—সেবার ওর ডিল ছিল। ও জানত ওর পার্টনারের কাছে হার্টসের কুইন আছে। ট্রিক করতে গিয়ে বোকা বনবে কন্ট্রাক্টর।'

'কিন্তু প্রত্যেকবার তো আর সে ডিল করে না,' বলল রেমান।

'অন্যান্যবার সাধারণভাবে খেলে যায়। ভাল প্লেয়ার সে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু চিন্তা করুন, ভাল প্লেয়ার যদি প্রতি চারবারে একবার করে সবার হাতের তাস জানতে পারে তো ব্যাপারটা কি সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়!'

'কিন্তু কেউ ডাউট করেনি কেন এতদিন?' সন্দেহ প্রকাশ করে রেমান।

'চেইন স্মোকারের সিগারেট কেস টেবিলের ওপর থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। যখন একজন ডিল করে তখন তার নিচের দিকে তাকানোও অস্বাভাবিক নয়—সবাই তাকায়। তার উপর হীরের আংটির ঝিকিমিকি দিয়ে দর্শকের মনোযোগ অন্যদিকে ডাইভার্ট হয়, সেই সাথে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে সে তখন টেবিলের মাঝ বরাবর। তাছাড়া আপনিই বলুন, একটি প্লেয়ারও কি ওর জোচ্চুরি ধরবার চেষ্টা করেছে কখনও?'

'না, করেনি। একথা কল্পনা করাও যায় না। গোলাম হায়দারের মত আদমী! তাজ্জব কারবার! কেবল আমার মনেই হালকা একটা সন্দেহ এসেছিল, প্রকাশ করার হিম্মত হয়নি। কিন্তু কাজটা করছে কেন লোকটা? লাখ-লাখ কোটি-কোটি টাকা যার, হাজার রকম বিজনেস, সে কেন···' চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল চেয়ারম্যান। আবার বিড়বিড় করে শুরু করল, 'কমিটিকে জানালে শোরগোল পড়ে যাবে। স্ক্যান্ডাল ছড়িয়ে পড়বে। পাবলিক হিরো···এত বড় একজন আদমীকে যদি···উহ্! কি করা যায়, মেজর মাসুদ রানা? হামার ক্লাবের মেম্বারদের লাখ-লাখ টাকা ঠকিয়ে লিয়েছে সে, হামি তো চুপ থাকতে পারি না। কাছু তো বাৎলান, মেজর?' উত্তেজনার চোটে

পায়চারি আরম্ভ করল সে ঘরময়।

ব্রিগেডিয়ার এসে ঢুকলেন ঘরে। নিঃশব্দে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন।

'মেজর জেনারেল রাহাত খান আমাকে পাঠিয়েছেন ব্যাপারটা সত্যি সত্যি চুরি কিনা তাঁকে জানাবার জন্যে,' বলল রানা চেয়ারম্যানের কথার উত্তরে। 'কোন কিছু করতে আমাকে বলেননি। তিনি এসে যা হয় করবেন।'

'কিন্তু ততক্ষণ থাকবে না তো গোলাম হায়দার। এগারোটার বেশি খেলে না সে। আওর কাল সকালেই ও চিটাগাং চলে যাবে। আপনি কাছু বুদ্ধি বাৎলান, মেজর। স্ক্যান্ডাল না করে ওকে রুখবার কোন কায়দা নেই?'

'আছে। ওর কুইনাইন ওকে দিয়েই গেলানো যায়।'

'তো তাই করুন না?' আশার আলো ফুটে উঠল রেমানের চোখে।

'আমি আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিঘাত করতেই ভালবাসি। এক গালে চড় খেয়ে আরেক গাল পেতে দেয়া আমার নীতি নয়। মেজর জেনারেল তাতে অসন্তুষ্ট হতে পারেন।'

'কি করতে চাইছেন?' জিজ্ঞেস করল রেমান।

'প্রথমতঃ, আমি ওকে বুঝিয়ে দেব যে ওর কৌশল বুঝে ফেলেছি আমি, যাতে ভবিষ্যতে এমন কাজ আর না করে। দ্বিতীয়তঃ, ব্রিগেডিয়ারের টাকাগুলো ফেরত দিতে হবে ওকে। কায়দা করে বের করে নেব আমি।'

'কি করে?'

'জোচ্চুরি করে। রাজি আছেন?'

'সেটা কি ঠিক হবে?' হঠাৎ বলে উঠলেন ব্রিগেডিয়ার, 'টাকা আমার নিজের দোষে গেছে...'

'না। আপনার দোষে যায়নি, স্যার। গোলাম হায়দারের শয়তানির জন্যে গেছে। স্টেকে ব্রিজ খেলাটা দোষের কিছু নয়, চুরি করাটা দোষের।'

'কিন্তু যদি ধরা পড়ে যাও?'

'সে রিস্ক আমার। আপনি কি বলেন, মিস্টার রেমান?'

'হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়ে আপনি যা করবেন হামি রাজি আছে।'

'বেশ!' কোটের দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিল্কের রুমাল দুটো স্পর্শ করল রানা। 'লাল, নীল দু'রকম তাসের দুটো প্যাকেট পাঠিয়ে দিন। দশ মিনিট একা থাকতে চাই আমি এই ঘরে।'

পাঁচ

'চলুন, ব্রিগেডিয়ার,' বলল রানা।

'আমার কিন্তু ভয় করছে, ইয়ংম্যান। যদি ধরা পড়ে যাও, তাহলে কি অবস্থা হবে ভেবেছ একবার? তাছাড়া মেজর জেনারেলকে কিছু না জানিয়ে

এভাবে…'

'সে সব আপনাকে ভাবতে হবে না, স্যার। যেমন কাজে উনি সত্যি সত্যি রাগ করবেন তেমন কাজ আমি করবই না। দশ বছর ওঁর আন্ডারে কাজ করছি…'

'আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি। কিন্তু কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে না, শেষে বোকা বনতে না হয়।'

'শুনুন। ওকে মাথায় তুলে আছাড় মারব আমি…'

'বলো কি!' আঁতকে উঠলেন ব্রিগেডিয়ার।

'কথাটা শেষ করতে দিন। কাজেই, প্রথমে ওকে মাথায় তুলতে হবে। প্রথম দিকে হারতে থাকব আমরা। যেন খেলার কিছুই বুঝি না, এরকম অভিনয় করব, স্টেক বাড়িয়ে দেব—কিন্তু ঘাবড়াবেন না। পূর্ণ বিশ্বাস রাখবেন আমার ওপর। ওকে মাথার ওপর তুলে নেব আগে, তারপর গুঁড়ো করে দেব ওর অহঙ্কার। ওর বাঁয়ে বসব আমি। আপত্তি নেই তো কোন?'

'না, আপত্তি কিসের? আর কিছু?'

'আর একটা ব্যাপার আছে। যখন সময় আসবে, আমি আমার কোটের পকেট থেকে একটা সাদা রুমাল বের করব। আপনি সেই দানটা ডাকাডাকির ভার সম্পূর্ণ ছেড়ে দেবেন আমার ওপর। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

কার্ড-রুমের একটি টেবিলও খালি নেই। জমজমাট হয়ে রয়েছে ঘরটা খেলোয়াড় ও দর্শকের মৃদু গুঞ্জনে। সারাটা ঘরে দৃষ্টি বুলাল রানা একবার। তারপর এগিয়ে চলল গোলাম হায়দারের টেবিলের দিকে। কত পদের লোক রয়েছে ঘরটার মধ্যে—কেউ ঠকবাজ, কেউ লোভী, কেউ ভীতু, কেউ মিথ্যুক, কেউ হয়তো বাড়িতে বৌ পেটায়, কারও হয়তো মস্তিষ্ক-বিকৃতি আছে—কিন্তু চারদিকে উজ্জ্বল একটা ভাব বিরাজ করছে বলে এই ঘরের দামী পোশাক-পরিচ্ছদ পরা প্রত্যেকটি লোককে সম্ভ্রান্ত, অভিজাত, সুখী মনে হচ্ছে।

কন্ট্রাক্টর আর তার পার্টনার উঠে গেছে। রেমান বসে গল্প করছে গোলাম হায়দারের সঙ্গে। কাছে যেতেই চড়া পর্দায় উদ্ধত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'অ্যাসট্রোলজি যদি মিথ্যা হয়, তাহলে তোমার সব কথা বলে দিলাম কি করে? কালই যদি সাত রতির একটা ব্লু স্যাফায়ার না পরো তাহলে চারদিনের মধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট হবে তোমার।' ব্রিগেডিয়ারের ওপর চোখ পড়তেই হেসে উঠল গোলাম হায়দার। 'আসুন, আসুন। আপনার চ্যালেঞ্জ আমি সাগ্রহে গ্রহণ করেছি। অধীর চিত্তে অপেক্ষা করছি আমি ছুরি হাতে নিয়ে, আমার ছাগল আর আসে না।'

এগিয়ে গিয়ে গোলাম হায়দারের বাঁয়ের চেয়ারটায় বসে পড়ল রানা। ব্রিগেডিয়ার বসল উল্টো দিকের চেয়ারে। শ্যানেল নাম্বার ফাইভের হালকা মিষ্টি গন্ধে চট্ করে চাইল একবার রানা মেয়েটির দিকে। ওর দিকে চেয়ে আছে রুমানা। মুচকে হাসল একটু।

সবাই তৈরি হয়ে গেল খেলার জন্যে। গোলাম হায়দারের উদ্ধত কর্কশ কথাবার্তায় অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করল রানা। কিন্তু ওর ভাবে প্রকাশ পেল না কিছুই। টসে জিতল গোলাম হায়দার। ওর ডিল। ব্রিগেডিয়ার শাফল করতে আরম্ভ করল এক প্যাকেট লাল কার্ড।

'আজ কি স্টেকে খেলবেন, ব্রিগেডিয়ার? গতকাল ফাইভ অ্যান্ড ফাইভ খেলে বিরক্ত হয়ে গেছি। ফিফ্‌টি পর্যন্ত খেলতে রাজি আছি আমি।'

'ফাইভ অ্যান্ড ফাইভ দিয়ে শুরু তো হোক, তারপর দেখা যাবে। কি বলো হে, মাসুদ রানা?'

হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল গোলাম হায়দার, 'আপনার বন্ধুটি মাসুদ রানা কি সোহেল রানা তাতে আমার কিছু যায় আসে না, কিন্তু ফাইভ অ্যান্ড ফাইভের মানে বোঝেন তো উনি?'

'আজ্ঞে হাঁ, ওটুকু জ্ঞান আছে,' বলেই হাসল রানা গোলাম হায়দারের নষ্ট চোখের দিকে চেয়ে, 'কত টাকা জেতার ইচ্ছে আছে আজ আপনার?'

'আপনার শেষ পাই পয়সা পর্যন্ত,' গোলাম হায়দারও উত্তর দিল মৃদু হেসে। 'আছে কত আপনার?'

'খেলা তো শুরু করা যাক, পয়সা শেষ হলে জানাব।' গায়ে জ্বালা করে উঠল রানার জোচ্চোরের দম্ভ দেখে। হঠাৎ বলে বসল, 'আপনার লিমিট শুনলাম ফিফ্‌টি অ্যান্ড ফিফ্‌টি। ওই স্টেকেই শুরু করা যাক।'

কথাটা বলে নিজেই চমকে উঠল রানা। এ কী বলে বসল সে? সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। যদি সত্যিই হেরে যায়, এত টাকা দেবে কোত্থেকে ও? ব্রিগেডিয়ারের তো একটা পয়সাও অবশিষ্ট নেই, রাহাত খানও এমন কিছু বড়লোক নন যে এত টাকা ধার দিতে পারবেন। ছি-ছি, ঝোঁকের মাথায় এ কী পাগলামি করে বসল সে। ব্যাপারটার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িতও নয় সে। সাহায্য করতে এসেছে মাত্র। তাও বসের অনুরোধে। লোকটা একে জোচ্চোর তার ওপর দুর্বিনীত। শায়েস্তা করতে চায় সে ওকে—কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে বড্ডো বেশি।

টেবিলের প্রত্যেকে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে রানার মুখের দিকে। ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে ব্রিগেডিয়ার এবং রেমানের মুখ। গোলাম হায়দারের চোখে অবিশ্বাস। ঠোঁট বাঁকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসল সে।

'ভাল, ভাল। ফিফ্‌টি অ্যান্ড ফিফ্‌টিই সই। উঁচু স্টেক না হলে, সত্যি বলতে কি, মজা লাগে না খেলতে।' ব্রিগেডিয়ারের কাটা হয়ে গেলে ডিল করতে আরম্ভ করল গোলাম হায়দার। 'কিন্তু ওঁর কমিটমেন্টের সিকিউরিটি কি, চেয়ারম্যান? উনি তো ক্লাবের মেম্বার নন। আর ব্রিগেডিয়ার তো নিঃস্ব।'

রানা চাইল রেমানের লাল হয়ে ওঠা মুখের দিকে। দুই সেকেন্ড চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিল রেমান। এরকম একটা অবস্থা যে সৃষ্টি হতে পারে, ধারণা ছিল না রানার। এখন যদি রেমান জানায়, সত্যি সত্যিই রানার কমিটমেন্টের একবিন্দুও সিকিউরিটি নেই, হেরে গেলে টাকা দিতে পারবে না রানা। তাহলে? মাথা নিচু করে বের হয়ে যেতে হবে ওকে এই ঘর ছেড়ে।

লজ্জা রাখার জায়গা থাকবে না কোথাও।

'হামি উনার সিকিউরিটি আছে। স্যাটিসফায়েড?' রানাকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠল রেমান।

রানা জানে রমনা ক্লাবের চেয়ারম্যান যখন, মস্ত কোন হোমরাচোমরা লোক হবে আনিসুর রেমান। কিন্তু আগের থেকে জানা নেই শোনা নেই, হঠাৎ এই অবাঙ্গালী ভদ্রলোক যে তাকে এমনভাবে সমর্থন করে বসবে, আশা করতে পারেনি সে।

'ওহ, ড্যাম স্যাটিস্ফায়েড।'

হঠাৎ স্টেক বাড়িয়ে দেয়ায় যে গ্লানিবোধ এসেছিল রানার মধ্যে, মিলিয়ে গেল সেটা। সেই জায়গায় এল গভীর একটা আত্মপ্রত্যয়। চূর্ণ করতে হবে হায়দারের দম্ভ। এমন শিক্ষাই দেবে সে আজ ওকে, যেন চিরকাল মনে থাকে ওর।

ধীরে ধীরে কার্ড বাঁটছে গোলাম হায়দার সিগারেট কেসটার দিকে চেয়ে। আরাম করে নড়েচড়ে বসল রানা চেয়ারে।

সাধারণ তাস উঠল রানার হাতে। কল দেবার মত নয়। গোলাম হায়দার তিনটে ক্লাব্‌স ডাকল; রানা নো বিড; রুমানা ফোর ক্লাব্‌স, ব্রিগেডিয়ার নো। চারটে ক্লাব্‌সের খেলা হলো, গেম হলো না। ক্লাব্‌সের টেক্কা, কিং ছিল রুমানার হাতে। চোখাচোখি হলো একবার রেমান ও রানার মধ্যে।

কিন্তু এই একটা দানই। তারপর পর পর তিনটে দান জিতে রাবার করল রানা ও ব্রিগেডিয়ার পনেরো মিনিটের মধ্যেই, উদ্বিগ্ন দেখাল গোলাম হায়দারকে। নয় হাজার টাকা হেরে গেছে সে। ভাল কার্ড আসছেই না ওর হাতে।

'সোজা খেলা চলুক, কি বলেন? আবার কাটাকাটি করা ঝামেলা,' বলল গোলাম হায়দার।

রানা বুঝল, আসল কথা ডিল করতে চাইছে সে। বলল, 'আমার আপত্তি নেই।'

এবার কপাল ফিরল গোলাম হায়দারের। স্মল স্লাম করল হার্টসের। গুনগুন গান বেরোল ওর কর্কশ কণ্ঠ থেকে। এবারও পরিষ্কার বোঝা গেল কার হাতে কি কার্ড আছে, জানা না থাকলে নির্ঘাত হারত গোলাম হায়দার। ছোট ছোট সাতটা হার্টস ছিল রুমানার হাতে। স্পেডস্ ছিল না একটাও।

'আশ্চর্য! কি করে জেতো তুমি, গোলাম হায়দার?' প্রশংসা করে বলল রেমান।

উত্তর দিল রানা। এখন থেকেই পিন ফুটাতে আরম্ভ করতে হবে। বলল, 'স্মরণশক্তি।'

চট করে তাকাল গোলাম হায়দার রানার দিকে। 'স্মরণশক্তি! তার মানে? কি বলতে চাইছেন আপনি? ট্রিকের সঙ্গে স্মরণশক্তির কি সম্পর্ক?'

'এবং কার্ড সেন্স,' যোগ করল রানা, 'এই দুটো গুণ একসাথে হলে হয় মস্ত কার্ড প্লেয়ার।'

'ও, বুঝলাম,' কার্ড কেটে রানার দিকে এগিয়ে দিল গোলাম হায়দার।

কার্ড বাঁটতে বাঁটতে অনুভব করল রানা, এই প্রথমবার ভাল করে লক্ষ করছে তাকে, মূল্য নিরূপণ করবার চেষ্টা করছে গোলাম হায়দারের চোখ। স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে চলল খেলা।

রুমানার একটা ভুল কলে ডাবল দিয়ে দাবিয়ে দিল ব্রিগেডিয়ার—দুই পিঠ শর্ট পড়ল। কিন্তু পরের দানেই আবার গেম করে রাবার করল গোলাম হায়দার। প্রথম রাবারের জয় নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়ে হাজার তিনেক টাকা তলে পড়ল রানারা।

ওয়েটারকে ডেকে ড্রাই জিন চাইল গোলাম হায়দার, রুমানার জন্যে শ্যাম্পেন। রানা এবং ব্রিগেডিয়ার প্রত্যাখ্যান করায় ওদের জন্যে কফির অর্ডার দিল দুই কাপ। মাথা ঠিক রাখতে হবে এখন, ভাবল রানা—উত্তেজক কিছু খাওয়া চলবে না।

কার্ড বাঁটার পর হঠাৎ রানার দিকে ঘুরে গোলাম হায়দার বলল, 'আসুন, এই দানটায় আমরা দু'জন একটা স্পেশাল বাজি ধরি। খেলায় প্রাণ আসবে। পাঁচশো টাকার বাজি। যে জিতবে সে পাবে। রাজি?'

সোজাসুজি গোলাম হায়দারের চোখের দিকে চাইল রানা। নষ্ট চোখটা আরেকটু লাল দেখাচ্ছে, ছোট চোখটায় ঠাণ্ডা একটা ভর্ৎসনা। রানা ভাবল, আমি সত্যি সত্যিই কিছু সন্দেহ করেছি কিনা বাজিয়ে দেখতে চায় ব্যাটা। স্মরণশক্তির কথাটায় ঘাবড়ে গেছে বোধহয়। ঠিক আছে, আরও খানিকটা ভড়কে দেয়া যাক।

'আপনার ডিলে?' মৃদু হেসে বলল রানা, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। এর পরের ডিলেও এই বাজিটা বলবৎ থাকুক।'

'আচ্ছা, এর পরের দানটাও আমি পাচ্ছি,' বলল গোলাম হায়দার কঠিন গলায়।

'এই দানটা জিতবেন তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পরের দানটা আমারও হতে পারে।' আরেকটু খোঁচা দিল রানা। মুহূর্তে কঠোর হয়ে গেল গোলাম হায়দারের মুখ।

কিন্তু পরপর দুটো দানই জিতল গোলাম হায়দার। তার পরের দুটোও। রাবার করল সে। টিটকারি মেরে বলল, 'আঠারো হাজার ডাউন।'

'আগামী রাবারের স্টেক ডাবল করে দেয়া যাক, কি বলেন?' বলল রানা তিক্ত কণ্ঠে। ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে। একটু যেন বিচলিতও।

ডিল করে ততক্ষণে কার্ড হাতে তুলে নিয়েছে গোলাম হায়দার। গুছাচ্ছে সেগুলো। ঠোঁটের কোণে একটা রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল ওর। ঠোঁট দুটো ভেজা ভেজা। সোজাসুজি রানার দিকে চাইল সে। রানা তখন চুমুক দিচ্ছে কফির কাপে। হাতটা একটু একটু কাঁপছে না ওর?

'ঠিক আছে। রাজি আছি আমি তাতে।' একটু উদারতা দেখাবার জন্যে যোগ করল গোলাম হায়দার, 'কিন্তু আমার হাতে গোটা কয়েক চমৎকার তাস দেখতে পাচ্ছি, ইচ্ছে করলেই চেপে যেতে পারেন, মিস্টার মাসুদ রানা,

এবারের মত।'

'না, না। চেপে যাব কেন? আমিই তো স্টেকটা বাড়াতে বললাম।' আনাড়ির মত তাস তুলে সাজাবার চেষ্টা করছে রানা এখন।

'বেশ, বেশ,' বলল গোলাম হায়দার উৎফুল্ল কণ্ঠে।

'থ্রী নো ট্রাম্পস্।'

'নো।'

'ফোর নো ট্রাম্পস্।'

'নো।'

অনায়াসে গেম করল গোলাম হায়দার।

কিন্তু তারপরেই ভাগ্য প্রসন্ন হলো রানার প্রতি। একটা স্মল স্লাম করল সে হার্টসের। তার পরপরই ব্রিগেডিয়ার গেম করল ফোর স্পেড্সের। টকটকে লাল হয়ে উঠল গোলাম হায়দারের নষ্ট চোখটা। ভিতর ভিতর অপমানিত বোধ করছে সে। আরও গা জ্বালিয়ে দিল রানা ওর। বলল, 'জবাই করতে এসে ছাগলের গুঁতোয় অস্থির হয়ে উঠেছেন দেখছি।' ঘেমে উঠল গোলাম হায়দারের কপাল। ব্যক্তিগত আক্রোশে পরিণত হয়েছে এখন ব্যাপারটা। বলবার কথা না পেয়ে দাঁত দিয়ে জোরে জোরে নখ কাটতে আরম্ভ করল পর্যুদস্ত শিল্পপতি।

খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ব্রিগেডিয়ারের মুখটা। এতক্ষণে কিংস্টর্ক ধরাল একখানা।

'আর একটা রাবার খেলেই উঠতে হবে আমাকে,' বলল রানা ঘড়ির দিকে চেয়ে, 'ঘুম পেয়ে গেছে।'

স্কোর-শীটে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলো গোলাম হায়দার। রানার দিকে চেয়ে বলল, 'হাজার দশেক টাকা মাত্র ব্যালেন্স দেখা যাচ্ছে। এই দশ হাজার নিয়ে কেটে পড়তে চাইলে যেতে পারেন। কিন্তু আসুন না, শেষেরটা এই ক্লাবের একটা স্মরণীয় রাবার করে রাখি আমরা? চারগুণ করে দিই স্টেক, ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাক? কি, রাজি?' ওই বেপরোয়া লোকটাকে পায়ের তলায় পিষে ফেলতে না পারলে স্বস্তি পাচ্ছে না সে কিছুতেই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ চিন্তা করল রানা।

'কি হলো?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল গোলাম হায়দার।

'রাজি!' বলল রানা নিষ্ঠুর কঠোর একটা চোখের দিকে চেয়ে।

ছয়

ঘরে ঢুকলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন টেবিলের কাছে। এতক্ষণে লক্ষ্য করল রানা ওদের টেবিলের চারপাশে বেশ

ভিড় জমে গিয়েছে উৎসুক দর্শকবৃন্দের। রাহাত খানকে দেখতে পেয়েই একটু দূরে নিয়ে গেল রেমান। আজ রাতের ঘটনাগুলো বোধহয় বলছে। ভুরু কুঁচকে মাথা নেড়ে কি যেন বললেন রাহাত খান। বোঝাবার চেষ্টা করছে রেমান। বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার চাইলেন বৃদ্ধ রানার দিকে। আবার মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন তিনি। রানা ভাবল, বুড়ো তো গোলমাল আরম্ভ করে দেবে, তাড়াতাড়ি খেলাটা শেষ হয়ে গেলেই হয় এখন।

ব্রিগেডিয়ার কেটে দিতেই তাস বাঁটতে আরম্ভ করল গোলাম হায়দার। তর্কাতর্কি শেষ করে এগিয়ে এল দু'জনেই আবার টেবিলের দিকে। রাহাত খানের মুখে অসন্তোষ আর বিরক্তির ছাপ।

টেবিলের উপর থেকে কার্ডগুলো তুলে নিয়েই খুশি হয়ে উঠল রানার মন। এই প্রথম সে এত ভাল কার্ড পেল। তাও আবার গোলাম হায়দারের বাঁটায়। সাতটা স্পেড্‌সের চারটেই টপ অনার্স, হার্টসের টেক্কা, ডায়মন্ডের টেক্কা, কিং। গোলাম হায়দারের দিকে চাইল রানা। ওদের হাতে ক্লাব্‌স আছে কিনা কে জানে? থাকলেও বেশি ডেকে নিতে পারবে রানা, কিন্তু অতিরিক্ত ডাকিয়ে ডাব্‌ল দেবে না তো আবার?

'নো বিড,' বিরস কণ্ঠে বলল গোলাম হায়দার।

'চারটে স্পেডস্,' বলল রানা।

'নো।'

'নো বিড।'

'নো,' ক্ষীণ কণ্ঠে বলল গোলাম হায়দার।

অনায়াসে পাঁচটা স্পেড্‌সের গেম করল রানা। গোলাম হায়দারের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। বাঁকা পাইপটা ধরালেন তিনি। চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে গোলাম হায়দারের কপালে। রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে সিগারেট ধরাল সে। রুমানা নির্বিকার।

'ব্রিগেডিয়ারের গেস্ট দেখছি চমৎকার কপাল নিয়ে জন্মেছেন!' বলল রেমান।

ব্রিগেডিয়ার চেয়ে দেখলেন রানার ডান হাতে একটা সাদা সিল্কের রুমাল দেখা যাচ্ছে। মুখ মুছল সে রুমাল দিয়ে, চোখ দুটো দ্রুত ঘুরে এল গোলাম হায়দার এবং রুমানার মুখের উপর দিয়ে, তারপর চলে গেল রুমালটা আবার কোটের পকেটে।

রানার ডিল এবার। যত্নের সঙ্গে নীল এক প্যাকেট তাস বেঁটে দিল সে। তারপর তুলে নিল নিজেরগুলো টেবিল থেকে। পাঁচটা ক্লাব্‌স পেয়েছে সে—টেক্কা, কুইন, দশ, আট, চার; আর ছোট ছোট আটটা ডায়মন্ড—কুইন, আট, সাত, ছয়, পাঁচ, চার, তিন, দুই।

ঠিক আছে। ফাঁদ পাতায় ভুল হয়নি কোন।

গোলাম হায়দারের অভিব্যক্তি লক্ষ করল রানা। বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে হাতের অবিশ্বাস্য কার্ডগুলোর দিকে। এমন কপালও মানুষের হয়? রানা জানে, দুর্দান্ত কার্ড পেয়েছে গোলাম হায়দার। দশটা নিশ্চিত ট্রিক।

এইবার! এইবার পিষে ফেলবে সে ওই উদ্ধত ছোকরাকে।

চেয়ারম্যানের অফিসে বসেই ওর জন্যে এই তাস তৈরি করে রেখেছে রানা। কাজেই চারদিকে চাইল সে এবার নিশ্চিন্তে। রুমানা ও ব্রিগেডিয়ার নির্বিকার। সুবিধার তাস পায়নি ওরা কেউ। রাহাত খান এবং রেমানের চোখে বিস্ময়। গোলাম হায়দারের অসাধারণ হাত দেখতে পেয়েছে ওরা। এবার আবার চাইল রানা গোলাম হায়দারের দিকে।

যেন নিতান্তই বাজে কার্ড পেয়েছে এমনি ভাবে ভাঁজ করে তাসগুলো রাখল গোলাম হায়দার টেবিলের উপর। সিগারেট ধরাল একটা।

'হ্যাঁ, কপালটা ওঁর ভালই বলতে হবে,' এতক্ষণে উত্তর দিল সে রেমানের কথার, 'কিন্তু এর চেয়েও অনেক ভাগ্যবান লোককেও কপাল ঠুকে কাঁদতে দেখেছি আমি। যাক্,' রানার দিকে চাইল সে চতুর দৃষ্টিতে। তাসগুলো তুলে দুটো টোকা দিল তার উপর। 'কিছু ভাল তাস আছে আমার হাতে। সরলভাবে স্বীকার করছি। কিন্তু আপনার হাতেও ভাল কার্ড থাকা অসম্ভব নয়। (ওরে পাজি হতচ্ছাড়া, ভাবল রানা, সব টেক্কা, কিং-কুইন তোর হাতে—আমি ভাল কার্ড পাব কোথায়?) এই দানে কিছু এক্সট্রা বেট হয়ে যাক না, মিস্টার মাসুদ রানা? কি বলেন?'

নিজের কার্ডগুলো পরীক্ষা করবার ভান করল রানা। তারপর বলল, 'আমার হাতেও কিছু কার্ড যে একেবারে নেই তা নয়। তবে পার্টনারের ওপর নির্ভর করতে হবে অনেকটা। তা, কি বেট ধরতে চাইছেন এক্সট্রা?'

'হাত আমাদের সমানই মনে হচ্ছে,' ঝাড়া মিথ্যে কথা বলল গোলাম হায়দার। 'প্রতি পয়েন্টে একশো টাকা ধরলে কেমন হয়?'

'বাবা! একশো টাকা! খুবই ভাল হাত পেয়েছেন মনে হচ্ছে! তা ঠিক আছে, যা থাকে কপালে। কপালের লিখন খণ্ডায় কে? রাজি আছি আমি।' ব্রিগেডিয়ারের দিকে চেয়ে বলল রানা, 'রিস্ক একটু নিচ্ছি ব্রিগেডিয়ার, হারলে টাকাটা আমিই দেব। হ্যাঁ, কল্ শুরু করা যাক। আমার কল্। সেভেন ক্লাবস।'

বোমা পড়ল যেন কার্ডরুমের ভিতর। মেজর জেনারেল রাহাত খান পরিষ্কার দেখেছেন গোলাম হায়দারের হাত। মুখটা হাঁ হয়ে যেতেই পাইপটা পড়ে গেল মেঝেতে। সেটা তুলবার চেষ্টা না করেই ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করলেন তিনি রানার দিকে। নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে রানার।

'কি বললেন!' আঁতকে উঠল গোলাম হায়দার। দ্রুত একবার পরীক্ষা করল সে নিজের কার্ডগুলো তুলে নিয়ে। 'জি. এস.—মানে গ্র্যাণ্ড স্লাম ডেকেছেন আপনি ক্লাবসের?' বিচিত্র এক টুকরো বাঁকা হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে।

'নো বিড,' বলল মিস্ রুমানা।

'নো,' বললেন ব্রিগেডিয়ার অবিচলিত কণ্ঠে। এই লার্জহার্টেড্ ইয়ংম্যানের ওপর ভক্তি এসে গেছে তাঁর ইতিমধ্যেই। আত্মহত্যা তো করতে

তিনি যাচ্ছিলেনই—কোন কিছুতেই ভয় নেই তাঁর এখন।

'ডাব্‌ল,' চিবিয়ে চিবিয়ে শব্দটা উচ্চারণ করল গোলাম হায়দার।

'তার মানে সাইড বেটেও ডাব্‌ল দিচ্ছে আপনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নিশ্চয়ই!' লোভাতুর গোলাম হায়দারের কণ্ঠস্বর।

'ঠিক আছে,' বলল রানা। সোজাসুজি চাইল গোলাম হায়দারের চোখের দিকে। 'রিডাব্‌ল্। সাইড বেটেও রিডাব্‌ল্। তার মানে সাইড বেটের প্রতি পয়েন্টের জন্য দাঁড়াল চারশো টাকা।'

বিস্মিত নো বিড আউড়ে গেল বাকি তিনজন। টেবিলের চারপাশে একপাক ঘুরে প্রত্যেকের হাত পরীক্ষা করলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান।

মেজর জেনারেল দেখতে পেলেন:

রুমানা স্পেড্‌স: ৬, ৫, ৪, ৩, ২ হার্টস্: ১০, ৯, ৮, ৭, ২ ডায়মন্ড: গোলাম, ১০, ৯	**ব্রিগেডিয়ার** স্পেড্‌স: ১০, ৯, ৮, ৭ হার্টস্:৬, ৫, ৪, ৩ ক্লাব্‌স্: ৭, ৬, ৫, ৩, ২
রানা ডায়মন্ড: কুইন, ৮, ৭, ৬, ৫, ৪, ৩, ২ ক্লাব্‌স্: টেক্কা, কুইন, ১০, ৮, ৪	**গোলাম হায়দার** স্পেডস্: টেক্কা, কিং, কুইন, গোলাম হার্টস:টেক্কা,কিং, কুইন, গোলাম ডায়মন্ড: টেক্কা, কিং ক্লাব্‌স্: কিং, গোলাম, ৯

হঠাৎ বুঝতে পারলেন রাহাত খান। রানার গ্র্যান্ড স্লাম ঠেকাবার সাধ্য নেই কারও। রুমানা যাই লিড দিক না কেন ট্রাম্প করছে রানা নিচে বা ওপরের হাতে। নিচ থেকে রং খেললেই কিং, গোলাম, নয় মারা পড়ছে ক্লাবসের, ওপর থেকে দুই দান ডায়মন্ড খেলে ট্রাম্প করলেই উড়ে যাচ্ছে গোলাম হায়দারের ডায়মন্ডের টেক্কা, কিং—তারপর রানার হাতে ডায়মন্ডের ছয় পিঠ স্ট্যান্ডিং। পাঁচ দানের মধ্যেই স্ট্যান্ডিং ডায়মন্ড আর রং থাকছে রানার হাতে অবশিষ্ট। গোলাম হায়দারের টেক্কা, কিং-কুইন সব বিলকুল বেকার।

খুন করছে রানা গোলাম হায়দারকে। সরে গিয়ে দাঁড়ালেন রাহাত খান একটু দূরে যেখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায় গোলাম হায়দারের চেহারাটা। ভ্রূ জোড়া কুঁচকে আছে ওঁর। রানা বুঝল, ওর এই ঠকবাজি কিছুতেই সমর্থন করতে পারছেন না ন্যায়পরায়ণ বৃদ্ধ।

'আরে খেলো, খেলো। ফেলে দাও কিছু একটা, রুমানা,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল গোলাম হায়দার। 'সারা রাত বসে থাকলে তো চলবে না!'

বেচারা! ভাবলেন রাহাত খান। বেচারা জানেও না পাঁচ মিনিটের মধ্যে

কি আকস্মিক তীব্র আঘাত আসছে ওর ওপর।

এই দানের গুরুত্ব বুঝে নিয়েছে রুমানা। অনেক চিন্তা ভাবনা করে ডায়মন্ডের গোলাম ফেলল।

নিচের হাতে দেখা গেল একটাও ডায়মন্ড নেই। দুই দিয়ে ট্রাম্প করল রানা। কিং নেমে এল গোলাম হায়দারের হাত থেকে। এবার ক্লাবসের তিন লিড দিল রানা, নয় দিল গোলাম হায়দার, দশ দিয়ে ধরল রানা। এবার ওপরের হাত থেকে ডায়মন্ডের তিন খেলল রানা, নয় ফেলল রুমানা, পাঁচ দিয়ে ট্রাম্প করল রানা। দড়াম করে টেক্কা পড়ল গোলাম হায়দারের হাত থেকে খসে। একটু অবাক হলো গোলাম হায়দার। এবার ক্লাবসের ছয় লিড দিল রানা নিচের হাত থেকে, গোলাম ফেলল গোলাম হায়দার, কুইন দিয়ে নিয়েই টেক্কা ফেলল রানা ক্লাবসের। কিং বেরিয়ে গেল গোলাম হায়দারের হাতের মুঠো থেকে।

এইবার হঠাৎ ভয় পেল গোলাম হায়দার। এবার কি খেলবে রানা? ডায়মন্ড কি সব রানার হাতে? রুমানার হাতে ওর চেক আছে তো? রানার মুখের দিকে চেয়ে বুঝবার চেষ্টা করল সে। কিছুই বোঝা গেল না। ঘামে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে গেল ওর হাতের কার্ড।

এতক্ষণ পর চোখ তুলে চাইল রানা গোলাম হায়দারের ভীত চোখের দিকে। অনাবিল মধুর হাসিতে ভরে গেল ওর মুখ। ধীরে সুস্থে বের করল সে ডায়মন্ডের কুইন। তারপর এক এক করে নামিয়ে দিল ডায়মন্ডের আট, সাত, ছয়, পাঁচ, চার, সব শেষে দুটো ক্লাবস।'

'ব্যস খতম,' বলে আরাম করে হেলান দিয়ে বসল সে চেয়ারে এতক্ষণ পর।

প্রথমেই সামনের দিকে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে রুমানার কার্ডগুলো টেবিলের উপর টেনে নামাল গোলাম হায়দার। কম্পিত হাতে পাগলের মত হাতড়ে দেখল জেতার মত একটা কার্ড পাওয়া যায় কিনা।

মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর মুখ। পরমুহূর্তে দপ্ করে একটা লাল বাতি জ্বলে উঠল যেন ওর মুখের ভিতর। আশ্চর্য হয়ে দেখল রানা লাল হয়ে গিয়েছে গোলাম হায়দারের ফর্সা মুখ। গলা থেকে উপরের অংশটুকুতে দেহের সমস্ত রক্ত এসে জমা হয়েছে যেন। ফাঁসের মত গলার গোল দাগটা শুধু সাদা। থরথর করে কাঁপল ওর দেহটা কয়েক সেকেন্ড। লাল ভয়ঙ্কর দৃষ্টি মেলে চাইল সে রানার চোখের দিকে। ধাঁই করে একটা কিল বসাল সে টেবিলের ওপর পড়ে থাকা নিজের অসহায় টেক্কা, কিং কুইনের ওপর। বুঝতে পেরেছে সে ব্যাপারটা।

অন্তরের সমস্ত ঘৃণা, বিদ্বেষ আর ক্রোধ ফুটে বেরোল ওর কণ্ঠে। 'তুমি...তুমি একটা জো...'

'হয়েছে!' চাবুকের মত রেমানের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'ক্লাবের মধ্যে একটাও বেহুদা কথা বলবে না, গোলাম হায়দার। হামি পুরা খেল্ দেখেছি। পেমেন্ট করে দাও। কুনো শিকায়েৎ থাকলে কমিটিকে লিখে

জানাবে।'

দপ্ করে নিভে গেল গোলাম হায়দার। ভয়ে নয়। সংযত করল সে নিজেকে। ওর ভিতরের দুর্দান্ত ক্ষমতা টের পেল রানা। যেমন আকস্মিকভাবে জ্বলে উঠেছিল, তেমনি আকস্মিকভাবে সংযত করল সে নিজেকে। রুমালে মুছে ফেলল ঘেমে ওঠা কপালটা। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক লাগছে ওকে দেখতে। চেক বইটা বের করল সে কোটের ভিতরের পকেট থেকে। বিনা দ্বিধায় রানা ও ব্রিগেডিয়ারের নামে নব্বই হাজারের দুটো চেক লিখে দিল সে। একটুও কাঁপল না হাত। উঠে দাঁড়াল এবার। সিগারেট-কেস লাইটার পকেটে রাখল সে টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে। মুখে বিচিত্র এক টুকরো রহস্যময় হাসি। নষ্ট হয়ে যাওয়া লাল চোখটা তেমনি জ্বলছে রানার দিকে চেয়ে। বাঁ হাতে চেক দুটো বাড়িয়ে দিল সে।

'টাকাগুলো তাড়াতাড়ি খরচ করে ফেলো, মাসুদ রানা।'

কথা তো নয়, ফোঁস ফোঁস করে উঠল যেন গোক্ষুর সাপ। তারপর হঠাৎ ঘুরে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। পিছন পিছন চলে গেল রুমানা। দরজার কাছে গিয়ে একবার পিছন ফিরে দেখল সে রানাকে।

সাত

পরদিন কাঁটায় কাঁটায় এগারোটার সময় পৌঁছল রানা অফিসে। আজকাল অফিস এগারোটা থেকে ছয়টা। সোজা এসে নিজের কামরায় ঢুকল সে। আগেই পৌঁছে গিয়েছে নাসরীন রেহানা। রানার ডেস্কের বাঁ ধারে ফাইলের একটা বিরাট স্তূপ বানিয়ে ফেলেছে সে ইতিমধ্যেই। দেখে মনটা দমে গেল রানার। উহ্! এর থেকে কি নিস্তার নেই?

রানার পায়ের শব্দে ফিরে চাইল রেহানা। বলল, 'চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার ফোন করেছিলেন এইমাত্র। বড় সাহেব দেখা করবেন তোমার সঙ্গে। অত্যন্ত জরুরী দরকার। এখন ব্যস্ত আছেন, সময় হলে নিজেই ডেকে পাঠাবেন, তুমি যেন কোথাও বেরিয়ে না যাও।'

'সেরেছে!' বলল রানা, 'রেহানা, চাকরিটা বোধহয় নট্ হয়ে গেল!'

'কেন, কি হয়েছে?'

'কাল ভয়ানক খেপে গেছে বুড়ো আমার ওপর। তুমি এক কাজ কর। চট্‌পট্ একটা রেজিগ্‌নেশন লেটার টাইপ করে দাও আমাকে।'

'রেজিগ্‌নেশন লেটার!' চোখ কপালে উঠল রেহানার। 'খেপেছ নাকি? কি হয়েছে তোমার?'

'কাল রমনা ক্লাবে জুয়াচুরি করেছি। ধরে ফেলেছে বুড়ো। ধাতানি দিতে ডাকছে আজ আমাকে। আমিও থোড়াই কেয়ার করি। আমাকে কান ধরে বের করে দেয়ার আগে আমিই রিজাইন দেব—টাইপ করা রেজিগ্‌নেশন

লেটার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসব বুড়োর সামনে। কি পেয়েছে বুড়ো আ... ...'

'কী আবোল-তাবোল বকছ, রানা!' এগিয়ে এসে রানার ডান বাহুতে হাত রাখল রেহানা। সত্যিই ভয় পেয়েছে সে। হঠাৎ রানার এই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠার কারণ কিছুই আঁচ করতে পারল না। উত্তরোত্তর আরও চটে উঠছে রানা।

'ঠিকই বলছি। তুমি চিঠিটা টাইপ করে আনো, তারপর সব বলব তোমাকে। অসহ্য! দিন-রাত বকা-ঝকা করবে, যখন তখন চোখ গরম করবে, ভারি আমার গুরু মশাই এসেছেন! আমি কচি খোকা নই, নাক টিপলে দুধ পড়বার বয়স আমার পার হয়ে গিয়েছে। কেন আমি সহ্য করব এসব অত্যাচার? লিখবে, বিশেষ কারণবশত এ চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি আমি। বিশেষ কারণটা কি তা আমি মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়ে আসব। যাও, কুইক।'

রেহানা পাশের ঘরে চলে যেতেই নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল রানা। সমস্ত ফাইলগুলো একসাথে তুলে আউট ট্রেতে ফেলল সে ঝপাৎ করে। আশ্চর্য! অর্ধেক রাগ কমে গেল রানার।

এবার খানিকটা সুস্থ মস্তিষ্কে গঠনমূলক চিন্তায় মনোনিবেশ করল সে।

নব্বই হাজার টাকা এখন নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিচ্ছে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের তোপখানা ব্র্যাঞ্চে ওর কারেন্ট অ্যাকাউন্টে। ব্যাঙ্কের সদালাপী ম্যানেজার মিস্টার চৌধুরী রানাকে বুদ্ধি দিয়েছেন টাকাটা ফিক্সড্ ডিপোজিটে রেখে দিতে, কিন্তু রানা কান দেয়নি সে পরামর্শে। কখন দরকার হয়ে পড়ে ঠিক আছে কিছু? এখন দেখছে, ভালই করেছে টাকাটা ফিক্সড্ ডিপোজিটে আটকে না দিয়ে। মুরগীর ফার্ম করবে সে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজতেই হাজার হাজার কুৎসিত মুরগীছানা কিলবিল করে বেড়াতে লাগল ওর চিন্তার মধ্যে। শিউরে উঠল রানা। অসম্ভব। মুরগীর কারবার করতে পারবে না সে—একবার মড়ক লাগলেই ঝাড়কে ঝাড় খতম। তার চেয়ে ইরি ধানের চাষই ভাল। কিংবা বোট ম্যানুফ্যাকচারিং-এ গেলে কেমন হয়? ...স্টার পার্টিকেল বোর্ড মিল থেকে রেসিন কোটেড ওয়াটারপ্রুফ প্ল্যাঙ্ক বানিয়ে নিয়ে হাজার হাজার বোট তৈরি করবে সে। আউট বোর্ড এঞ্জিন ফিট্ করে দেবে তাতে। রাতারাতি বদলে দেবে সে এদেশের মান্ধাতার আমল থেকে প্রচলিত সেই একঘেয়ে দৃষ্টিভঙ্গি। দিনের পর দিন দাঁড় বাওয়া আর গুণ টানার অমানুষিক পশুশ্রম, আর সময়ের অন্যায় অপব্যয় দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে উঠেছে সে। নদীমাতৃক দেশ। এই নদীতেই যদি সে এনে দিতে পারে প্রাণের জোয়ার আর গতির মুক্তি, তাহলে সম্পূর্ণ বদলে যাবে এদেশের চেহারা। বাহ্ চমৎকার আইডিয়া! কিছুক্ষণ দেশ-প্রেমিকের ভূমিকায় নিজেকে কল্পনা করে পুলকিত চিত্তে বুঁদ হয়ে বসে রইল রানা। তারপর উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। কোনও চিন্তা নেই। যা হয় একটা কিছু হবে, কাজের কি অভাব আছে? সব পথ খোলা আছে ওর সামনে।

জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। নিচে পিচ-ঢালা চওড়া সড়ক দিয়ে

ব্যস্তসমস্তভাবে চলে যাচ্ছে অসংখ্য গাড়ি-ঘোড়া। স্টেডিয়ামের সুইমিং পুলে টলটল করছে স্বচ্ছ জল। কয়েকটা ল্যাঙোট-পরা ছোকরা ব্যাক স্ট্রোক, ফ্রী স্টাইল, ব্রেস্ট স্ট্রোক, বাটারফ্লাই প্র্যাকটিস করছে। ক্লাস এইট-নাইনে পড়ে খুব সম্ভব। এই উন্মেষের সময় এদের কাছে জীবনটা কি অদ্ভুত রহস্যময়! বিচিত্র মায়ায় টানছে ওদের জীবনের মধ্যাহ্ন। বলছে, তোমাদের জন্য কত রূপ, কত রঙ্গ, কত জাদু নিয়ে বসে আছি— বড় হও, এসো আমার কাছে। অথচ বড় হয়ে কি দেখবে ওরা? সব রূপ, সব জাদু যেন কোন্ ভোজবাজির বলে চলে গিয়েছে ওদের কৈশোরে, হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওখান থেকে, আর হাসছে মিটিমিটি। কোন দিন আর পারবে না ওরা সেখানে ফিরে যেতে। দীর্ঘশ্বাস ফেলবে আর দিনের পর দিন আরও দূরে সরে যাবে কালের অমোঘ টানে। ধীরে ধীরে মরীচিকার মত মিলিয়ে যাবে ছবিটা। এই তো জীবন!

একটা কালো গাড়ির চক্চকে ছাতে সূর্যটা প্রতিফলিত হয়ে চোখে পড়তেই হঠাৎ কেন যেন গোলাম হায়দারের নষ্ট হয়ে যাওয়া লাল চোখটার কথা মনে পড়ল রানার। আচ্ছা, কেন? একজন কোটিপতি লোক, যে কিনা দেশের জনসাধারণের হৃদয়ে এত সম্মানের আসন পেয়েছে, সেই অসাধারণ লোকটা কেন জোচ্চুরি করে সামান্য তাস খেলতে গিয়ে? নাকি হারতে ভয় পায় বলেই কাজটা করে সে? নাকি প্রমাণ করতে চায় যে, যে-কোন লোকের চেয়ে যে-কোন ব্যাপারে সে বড়? নিজের ক্ষমতায় অতি মাত্রায় বিশ্বাসী বলেই কি এত উদ্ধত, কর্কশ ওর ব্যবহার? তাই বলে চুরি করবে কেন? নিশ্চয়ই ওর মনের মধ্যে কোথাও একটা বাঁকা স্রোত আছে।

মাথা ঝাড়া দিয়ে আজে-বাজে চিন্তাগুলো সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল রানা। কি যেন সে ভাবতে চায়—আবোল-তাবোল কতকগুলো কথা এসে গুলিয়ে দিচ্ছে ওর চিন্তাটা। আজ সকাল থেকেই ওর অবচেতন মনে উঁকি-ঝুঁকি মারছে একটা চিন্তা, কিন্তু কিছুতেই তুলে ধরতে পারছে না সে ওটাকে পরিষ্কার আলোয়। আবার ডুব দিল রানা মনের গভীরে। এবং সাথে সাথেই পেয়ে গেল সূত্রটা। হ্যাঁ। ওই কথাটা বলল কেন গোলাম হায়দার? কি বোঝাতে চায় সে কথাটা দিয়ে? টাকাগুলো তাড়াতাড়ি খরচ করে না ফেললে, ভোগ করবার আর সময় পাবে না রানা? মৃত্যু ঘটবে রানার? পাগল নাকি লোকটা?

আপন মনেই মৃদু হাসল রানা। নিজের চেয়ারে ফিরে এসে ভাবতে বসল আবার। নব্বই হাজার বড় বিশ্রী একটা অঙ্ক। তার চেয়ে পঁচাত্তর হাজার শুনতে অনেক ভাল। লাখ যদি পুরো থাকত তাহলে হাত দিত না রানা ওতে। কিন্তু নব্বই হাজার ভাবতেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে সে। কেমন অসম্পূর্ণ লাগছে। আচ্ছা, হাজার পনেরো টাকা খরচ করে ফেললে কেমন হয়? তাহলে পঁচাত্তর হাজার থাকবে। পৌনে এক লাখ। কত মিষ্টি লাগছে শুনতে।

স্ক্রিবলিং প্যাডটা টেনে নিল রানা। আট হাজার দিয়ে একটা ফিয়াট

ফাইভ হানড্রেড গাড়ি কিনবে সে। কারণ, চাকরি যখন ছেড়েই দিচ্ছে, করোনাটা ফিরিয়ে দিতে হবে অফিসকে। আর চাকরি ছাড়লে রানার জীবনে অতিরিক্ত স্পীডের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যাবে। ফাইভ হানড্রেড ফিয়াটই যথেষ্ট। আর সাত হাজার? ওটা দিয়ে একটা হীরের আংটি কিনে প্রেজেন্ট করবে সে রেহানাকে। হাজার হোক বহুদিন একসঙ্গে কাজ করেছে, কত সময় কত কটু কথা বলেছে, গালমন্দ দিয়েছে—মায়া জন্মে গেছে কেমন যেন। রানার শেষ স্মৃতি হিসেবে আঙটিটা দিয়ে যাবে সে রেহানাকে।

ঘরে এসে ঢুকল নাসরীন রেহানা। হাতে টাইপ করা কাগজ একখানা।

ঠিক সেই সময়ই ইন্টারকমের মাধ্যমে ভেসে এল রাহাত খানের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর।

'রানা। ওপরে এসো।'

'আসছি, স্যার,' বলেই উঠে দাঁড়াল রানা। প্রায় খাবলা দিয়ে কেড়ে নিল সে রেজিগনেশন লেটারটা রেহানার হাত থেকে। কাগজটা চার ভাঁজ করে হাতেই রাখল। যেন রাহাত খান বুঝতে পারে ওটা দিতেই এসেছে সে, ধমক খেতে নয়। মন স্থির করে নিয়ে দৃঢ় পায়ে এগোল সে দরজার দিকে।

'রানা!'

'কি?' থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরল রানা।

'সত্যিই ওটা দেবে তুমি বড় সাহেবকে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রেহানা।

'সত্যি না তো ইয়ার্কি মারছি?'

'এ রকম বস্ আর পাবে কোথাও তুমি?'

'কেন?'

'তুমি জানো না, রানা, কি গভীর স্নেহ করেন বড় সাহেব তোমাকে। তুমি জানো না, যখন দেশের বাইরে থাকো, কি দারুণ দুশ্চিন্তার নির্যাতন ভোগ করেন উনি তোমার জন্যে।'

'আর কিছু বলবার আছে?'

'আমরা কেউ চাই না তোমাকে হারাতে। রাগের মাথায় কিছু করে বোসো না, রানা। প্লীজ!' রানার হাতটা ধরে ফেলল রেহানা। ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল রানা সাততলার সিঁড়ির কাছে। উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। জানতেও পারল না সে, পিছনে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে রেহানা।

পুরু কার্পেট বিছানো লম্বা করিডর দিয়ে সোজা এসে দাঁড়াল রানা মেজর জেনারেল রাহাত খানের ঘরের সামনে। মৃদু ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা। দেখা গেল বাঁকা পাইপটা দাঁতে চেপে গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটা খোলা ফাইল থেকে কি যেন টুকে নিচ্ছেন তিনি প্যাডের কাগজে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানার দিকে চাইলেন একবার মেজর জেনারেল, রানার হাতের কাগজটার উপর আধ সেকেন্ড থমকে দাঁড়াল ওঁর দৃষ্টি, তারপর সামনের চেয়ারটার দিকে ইশারা করেই মন দিলেন নিজের কাজে। এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল রানা নির্দিষ্ট চেয়ারে। চুপচাপ কেটে গেল দুই মিনিট।

গতরাতে গোলাম হায়দার বেরিয়ে যাওয়ার পর চেয়ারম্যানের অফিস কামরায় জড়ো হয়েছিল ওরা চারজন। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল রেমান ও ব্রিগেডিয়ার। গম্ভীর মুখে আগাগোড়া সব ঘটনা শুনেছেন রাহাত খান।

কোটের দুই পকেট থেকে দু'প্যাকেট তাস বের করে দিল রানা রেমানকে। লাল এবং নীল। নীল প্যাকেটটা কেটে দিয়েছিল গোলাম হায়দার রানাকে শেষ দানে, সবার অলক্ষ্যে পকেটস্থ করেছিল সেটা রানা, নিজের সাজানো প্যাকেট বের করে এনেছিল। আর বাম পকেটের লাল প্যাকেটটা তৈরি ছিল; যদি লাল প্যাকেট কেটে দিত গোলাম হায়দার, তাহলে ওটা বের করত সে। ঠিক একই ভাবে সাজানো ছিল ওই প্যাকেটটাও।

'চমৎকার, মেজর মাসুদ রানা। আপনি গোটা ক্লাবের ইজ্জত রক্ষা করেছেন,' বলল রেমান।

'কিন্তু কাজটা বড় অন্যায় হয়ে গেল,' ফস্ করে বলে বসলেন রাহাত খান।

'আর কি উপায়ে দোনো কূল রক্ষা হতো? সাবধান হয়ে গেল গোলাম হায়দার—হয় সে ছেড়েই দেবে খেলা, নয় বেইমানী ছেড়ে দেবে ভবিষ্যতে। মুখে কাছুই বাত হলো না, কানাঘুসা কাছু না, সমঝে লিলো সে সব। তার উপর কান পাকাড়কে ডবল টাকা আদাই হয়ে গেল। ব্রিগেডিয়ারের নব্বই হাজার, আর বাকি নব্বই হাজার ফাইন। ফাস্-কেলাস! আপনার কি প্ল্যান ছিল?'

উত্তর দিলেন না রাহাত খান। মনে মনে বুঝলেন, আর কোন উপায়েই সর্বস্বান্ত ব্রিগেডিয়ারকে রক্ষা করবার রাস্তা ছিল না। কিন্তু তবু আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই অন্তর থেকে স্বীকার করে নিতে বাধল ওঁর। উত্তর দিতে না পেরে কটমট করে রানার দিকে একবার চেয়ে রেমান এবং ব্রিগেডিয়ারের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন তিনি অপ্রসন্ন মুখে। কিন্তু আজকের এই শান্ত সমাহিত মুখে তো কালকের বিরক্তির কোন ছাপ নেই!

হঠাৎ দেখতে পেল রানা রাহাত খানের কপালের ডানধারে একটা শিরা টিপ্‌টিপ্ করছে। ব্যাপার কি! এত উত্তেজিত কেন মেজর জেনারেল? অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কোন অ্যাসাইনমেন্টে জড়িত হয়ে পড়লে এবং মারাত্মক দুর্ভাবনার মধ্যে থাকলে ওঁর কপালের ওই শিরাটাকে লাফাতে দেখেছে রানা আগে। কি হয়েছে? নতুন কোন ব্যাপার পাকিয়ে উঠল নাকি? গুড়গুড় করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকল সে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে।

ছ্যাঁৎ করে একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠতেই চমকে চাইল রানা রাহাত খানের মুখের দিকে। পাইপটা ধরিয়ে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ধূমপান করলেন বৃদ্ধ, তারপর বললেন, 'ভয়ঙ্কর একটা দুঃসংবাদ আছে, রানা। শুনলে তুমি খুবই দুঃখ পাবে। আবদুল হাইকে মনে আছে? আমাদের চিটাগাং এজেন্ট? কাল রাতে মারা গেছে সে।'

'আবদুল হাই মারা গেছে!' চমকে উঠল রানা। কিচ্ছু ভাবতে পারল না

সে কয়েক সেকেন্ড।

'হ্যাঁ! ভোর রাতে পাওয়া গেছে লাশটা সাগর-সঙ্গমে,' শান্ত কণ্ঠে বললেন রাহাত খান।

'কিভাবে মারা গেছে আবদুল হাই?'

'সেটা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। সারা দেহ থেকে মাংস খাবলে তোলা। এক-আধজন অভিজ্ঞ লোক বলছে হাঙ্গরের কামড়ের দাগ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু ওখানে হাঙ্গর এল কি করে বোঝা যাচ্ছে না। মুখটা অবিকৃত আছে অ্যাকুয়া লাং-এর মুখ-ঢাকা মাস্ক পরা ছিল বলে।'

'অ্যাকুয়া লাং-এর মাস্ক...'

'হ্যাঁ। খুব সম্ভব সাগরে নেমেছিল সে কাল রাতে অ্যাকুয়া লাং পরে।'

'কারণ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কেন, কি উদ্দেশ্যে যে ও সাগরে নেমেছিল বোঝা যাচ্ছে না। কাউকে কিছু জানিয়েও যায়নি। ওর ফ্ল্যাটের চাকর বলছে রাত আড়াইটার সময় গাড়ির এঞ্জিন স্টার্টের শব্দ শুনতে পেয়ে জানালা দিয়ে আবদুল হাইকে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছে সে। গাড়িটা পাওয়া গেছে সাগরের ধারে। যে জায়গায় গাড়িটা পাওয়া গেছে তার আশপাশে মাইল খানেকের মধ্যে নোঙর করা একটা ইয়ট ছাড়া আর কিছুই নেই।'

'তার মানে ওই ইয়টেই যেতে চেয়েছিল হাই পানির নিচ দিয়ে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'খুব সম্ভব। সপ্তাহ খানেক হলো এসেছে ইয়টটা খুলনার দিক থেকে।'

'কাদের ইয়ট ওটা?'

'গোলাম হায়দারের।'

চমকে চাইল রানা রাহাত খানের চোখের দিকে। কিছুই বোঝা গেল না বৃদ্ধের মুখ দেখে। যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে পাইপ্ টানছেন মেজর জেনারেল। টিপ্‌টিপ্ করছে কপালের শিরাটা।

'গোলাম হায়দারের ইয়ট!' নিজের অজান্তেই কথাটা বেরিয়ে গেল রানার মুখ থেকে।

'হ্যাঁ। বছর খানেক হলো বহু টাকা ব্যয় করে ইটালী থেকে তৈরি করিয়ে এনেছে সে এই ইয়টটা। হাইড্রোফয়েল ক্র্যাফ্‌ট্। টপ স্পীড সিক্সটি নটস্। কিন্তু কেউ ওকে পঁচিশের বেশি স্পীড তুলতে দেখেনি।'

'কিন্তু এই ইয়টের সঙ্গে আবদুল হাইয়ের মৃত্যুর কি সম্পর্ক, স্যার?'

'ওই ইয়টের কাছেই সাগর-সঙ্গমে পাওয়া গেছে ওর মৃতদেহ—আপাতত এটুকু ছাড়া আর কোন সম্পর্কের কথা জানা নেই। তোমাকে বের করতে হবে বাকিটুকু। আজই সন্ধ্যার ফ্লাইটে চিটাগাং যাচ্ছ তুমি।'

আচ্ছা! তাহলে এই ব্যাপার! এটা আরেকটা অ্যাসাইনমেন্ট! আবার সেই চিটাগাং। দ্রুততর হলো রানার হার্ট বিট। গোলাম হায়দারের চেহারাটা মনে পড়ল ওর। আসছি আমি গোলাম হায়দার, দাঁড়াও তুমি। হয়তো ওর সাথে এ ব্যাপারের কোন সম্পর্কই নেই, কিন্তু গতরাত্রির উত্তেজনাপূর্ণ খেলার পর

যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ওর কথাই মনে পড়ল রানার বারবার করে। ওর শেষ কথাগুলো স্পষ্ট মনে পড়ল ওর—টাকাগুলো তাড়াতাড়ি খরচ করে ফেলো, মাসুদ রানা। কথাগুলোর মধ্যে ভয়ঙ্কর একটা ইঙ্গিত আছে, শাসানি আছে।

'চিটাগাং-এ আবদুল হাইয়ের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু জানা যায়নি, স্যার?'

'বিশেষ কিছুই না। ইদানীং চিটাগাং-এ ভারতীয় গুপ্তচরদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ওর একটা রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। তাদের নিয়েই ছিল আবদুল হাই। কোথাও ইয়টের উল্লেখ নেই।' আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ পাইপ টেনে বললেন, 'ইয়টের কাছে মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে বলেই যে গোলাম হায়দারই এর জন্যে দায়ী, এমন সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না। আর লোকটার ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তির কথাও এই সাথে স্মরণ রাখা দরকার। অযথা ওকে জ্বালাতন করলে আমাদের পুরো ডিপার্টমেন্টকেই অসুবিধার মধ্যে ফেলে দিতে পারে ও। হৈ-চৈ পড়ে যাবে সারা দেশে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার আরম্ভ করে দেবে পত্রিকাগুলো। কাজেই খুব সাবধানে এগোতে হবে তোমাকে। রীতিমত প্রমাণ সংগ্রহ না করে, সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত না হয়ে ওর বিরুদ্ধে কিছুই করা যাবে না।'

'আপনার কথায় কিন্তু মনে হচ্ছে, স্যার, এ ব্যাপারে ও-ই যে দায়ী তাতে আপনার নিজের কোন সন্দেহ নেই।'

'আমার সন্দেহে কিছুই এসে যায় না,' বললেন রাহাত খান। 'প্রমাণ চাই। কিন্তু খুব সাবধান, রানা। টাকাগুলো খরচ করবার জন্যে খুব বেশি সময় দেবে না তোমাকে গোলাম হায়দার।'

রানা বুঝল, সেই কথাটা স্মরণ রেখেছেন মেজর জেনারেল। ওঁর মনেও দাগ কেটেছে কথাটা।

'ভাল কথা,' আবার কথা বলে উঠলেন বৃদ্ধ, 'আমি অনেক ভেবে দেখলাম, কাল ওই ভাবে ওকে শায়েস্তা করে ঠিকই করেছ তুমি, রানা। এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। খুব সম্ভব এ-ই ওর জীবনের প্রথম পরাজয়। সহজে ভুলতে পারবে না ও এই পরাজয়ের গ্লানি। ভালই হলো, জয় দিয়ে শুরু হলো আমাদের। যাও, রেডি হয়ে নাও তুমি। বিকেলেই টিকেট পৌঁছে যাবে তোমার বাসায়।'

'গোলাম হায়দার এতক্ষণে নিশ্চয়ই চিটাগাং…'

'না,' বাধা দিয়ে বললেন রাহাত খান। 'ও যাতে তোমার আগে গিয়ে পৌঁছতে না পারে সেজন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি আমরা। কাল সে টিকেট বুক করেছিল আজ সকালের ফ্লাইটের। সীটও ছিল, কিন্তু ওটা ক্যান্সেল করিয়ে দেয়া হয়েছে কায়দা করে। বিকেলের ফ্লাইটে সীট পাওয়া যাবে বলে ভরসা দেয়া হয়েছে—আসলে শেষ মুহূর্তে জানানো হবে ওকে, অনিবার্য কারণবশত…ইত্যাদি, ইত্যাদি। আর ও যদি আগেই টের পেয়ে গিয়ে ট্রেনে কিংবা মোটরে রওনা হয়ে যায়, তবু সন্ধের আগে পৌঁছতে পারবে না। আমরা চাই না, ও আগে থেকে চিটাগাং পৌঁছে গিয়ে তোমার জন্যে ফাঁদ

পেতে বসে থাকুক।' কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থেকে আবার বললেন, 'খুব সাবধানে এগোতে হবে তোমাকে, রানা। আপন নিরাপত্তার দিকে সবসময় খেয়াল রাখবে। গোলাম হায়দারের ক্ষমতাকে ভুলেও আন্ডার-এস্টিমেট করবে না। প্রয়োজন বোধ করলেই যথাযথ প্রোটেকশন নেবে। আর রোজ বিকেলে রিপোর্ট করবে অফিসে। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?'

'না, স্যার।'

উঠে দাঁড়াল রানা। আবার রাহাত খানের চোখ পড়ল রানার হাতে ধরা চিঠিটার ওপর। লুকোবার চেষ্টা করল রানা চিঠিটা। কায়দা করে আলগোছে পকেটে ফেলবার চেষ্টা করল ওটাকে।

'ওটা কিসের চিঠি, রানা?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।

'কিছু না, স্যার। এই একটা রেজিগ্‌...মানে, এমনি একটা বাজে কাগজ, স্যার।'

'টাইপ করা মনে হচ্ছে?' আবার প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ।

মনে মনে অভিসম্পাৎ দিল রানা বৃদ্ধকে। বুড়ো একটা জিনিস ধরলে আর ছাড়ে না কিছুতেই, সব কিছুই জানা চাই তার। বলল, 'না, স্যার...মানে, হ্যাঁ, স্যার। ওটা কিছুই নয়। আমি এখন যাই, স্যার...'

'দেখি?' হাত বাড়ালেন বৃদ্ধ।

প্রমাদ গুনল রানা। সেরেছে! এখন ওটা ওঁর হাতে না দিয়েও উপায় নেই। কম্পিত হাতে বাড়িয়ে দিল সে রেজিগ্নেশন্ লেটারটা মেজর জেনারেলের দিকে। ভাঁজ খুলে চিঠিতে মনোনিবেশ করলেন তিনি। কাঁচা-পাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল ওঁর। শঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা ওঁর মুখের দিকে। বৃদ্ধের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কাগজের ওপর থেকে এসে স্থির হলো রানার অপরাধী চোখে।

'কি ব্যাপার, রানা? এ চিঠি তোমার কাছে!'

'মানে, আমি...আসলে, স্যার...'

'নাসরীন রেহানার ছুটির দরখাস্ত তোমার হাতে কেন?'

'ছুটির দরখাস্ত? নাসরীনের!' এইবার বুঝতে পারল রানা ব্যাপারটা। 'ওটা কি ছুটির দরখাস্ত নাকি, স্যার?'

'কেন, তুমি জানতে না?'

'না, স্যার।' সামলে নিয়েছে রানা ততক্ষণে। 'টেবিলের ওপর ছিল, না দেখেই হাতে করে নিয়ে এসেছিলাম।'

'ও। তাই বলো। তা দিয়ে দাও ছুটি। তুমি তো চিটাগাং যাচ্ছ, তোমাদের সেকশনেরও কেউ নেই ঢাকায়। কাজেই এই সুযোগে ছুটি দিয়ে দাও। আমি সই করে দিচ্ছি— সারওয়ারকে দিয়ে সীল করিয়ে নিয়ো।

'কিন্তু, স্যার, ওকে এখন ছুটি দিলে...'

'ওসব কিচ্ছু ভেবো না তুমি। যাও, সব গুছিয়ে রেডি হয়ে নাওগে।'

খশ্‌খশ্ করে সই করে দিলেন রাহাত খান দরখাস্তের ওপর। নীরবে বেরিয়ে গেল রানা চিঠি হাতে নিয়ে। ফাইলে মনোনিবেশ করলেন বৃদ্ধ।

ঘর থেকে বেরিয়ে আস্তে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল রানা। তারপর সোজা চলে এল নিজের অফিস-কামরায়। বসে আছে রেহানা। চিন্তান্বিত রানার চেহারা দেখে এগিয়ে এল সে। সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'মেরেছে?'

কোন জবাব না দিয়ে টেবিলের ওপর থেকে ব্রিফকেসটা তুলে নিল রানা। তারপর ফিরল রেহানার দিকে।

'তোমাকে কি ছুটির দরখাস্ত টাইপ করতে বলেছিলাম?'

'ওহ্-হো। ভুলে আমার দরখাস্তটা চলে গিয়েছিল বুঝি? এই যে তোমার রেজিগনেশন লেটার। সরি ফর দ্য মিস্টেক।' রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে আরেকটা কাগজ।

'ওটার আর দরকার নেই। ছিঁড়ে ফেল। বুড়ো আসলে বকতে ডাকেনি, ডেকেছিল আরেকটা অ্যাসাইনমেন্ট দিতে। ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেছে তোমার। আমিও যাচ্ছি...'

'চিটাগাং-এ তো? ও তো আমি আগেই জানতাম।' খুশি হয়ে হাত বাড়িয়ে নিল রেহানা ওর ছুটির দরখাস্তটা।

চিঠিটা রেহানার হাতে দিয়েই একটা সন্দেহ হলো রানার। 'তুমি আগেই জানতে মানে? তুমি জানতে যে বকা দেবার জন্যে আসলে ডাকছে না বুড়ো আমাকে?'

'হ্যাঁ, জানতাম।'

'তার মানে, জেনেশুনেই আমার হাতে নিজের দরখাস্তটা গুঁজে দিয়েছিলে?'

এই কথার উত্তর দিল না রেহানা। চট্ করে ঘুরে হাসি চাপল। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে বলল, 'চা খাবে, না কফি?'

এগিয়ে এসে রেহানার দুই কাঁধ চেপে ধরল রানা।

'বলো। ইচ্ছে করেই বোকা বানিয়েছ আমাকে?'

'উহ্! লাগছে, ছাড়ো। কতবার তো অনুনয়-বিনয় করে দেখেছি তোমার কাছে, ফল হয়নি। এছাড়া আর কি করবে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গেলে?'

বুদ্ধির খেলায় হেরে গেছে রানা। তীব্র দৃষ্টিতে রেহানার প্রতি কয়েক সেকেন্ড অগ্নিবর্ষণ করে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

আট

সাগরেই ল্যান্ড করবে নাকিরে, বাবা! না, আরেকটু এগিয়ে গোটা কয়েক নারকেল গাছ টপকে ফকার-ফ্রেণ্ডশিপ ল্যান্ড করল পতেঙ্গা এয়ার-পোর্টে। ঠেলে এনে সিঁড়ি লাগিয়ে দেয়া হলো উড়োজাহাজের গায়ে। নেমে এল যাত্রীরা সব একে একে সুন্দরী এয়ার হোস্টেসের নকল মিষ্টি হাসিতে আপ্যায়িত হতে হতে। একটা অ্যাটাচি কেস হাতে রানাও নামল সবার সঙ্গে। এগোল ওয়েটিং

রুমের দিকে। লাগেজের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে বিশ মিনিট।

একটা ফান্টার বোতল হাতে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল রানা। সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। মেঘের গায়ে অস্তরাগ মাখা। ঠিক এইখানটায় দাঁড়িয়ে প্লেনের জন্যে অপেক্ষা করেছিল সে অনেক, অনেক দিন আগে। নিজেকে কি নিঃস্ব রিক্ত লেগেছিল রানার সেদিন। সুলতাকে কাপ্তাই রিজারভয়েরের সলিল সমাধিতে রেখে ফিরে গিয়েছিল সে ঢাকায়। জীবনটা অর্থহীন মনে হয়েছিল ওর সেদিন। তারপর কত ঝড়, কত ঝঞ্ঝা বয়ে গেল ওর ওপর দিয়ে, কত নারী এল-গেল, জীবনের সর্পিল অমসৃণ পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে সে নিরুদ্দেশের পথে, কত দেশ কত মানুষ দেখে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সে, তবু সেই সরল মেয়েটিকে ভুলতে পারল কই? সেদিন জ্বালা করেছিল চোখ দুটো। আজ জ্বালা নেই; স্বপ্ন হয়ে রয়েছে সুলতা রানার চোখে।

ট্যাগের নাম্বার মিলিয়ে কাঁধে তুলে নিল একজন পোর্টার রানার সুটকেসটা। বেরিয়ে এল রানা বাইরে। ট্যাক্সি কি পাওয়া যাবে?

খটাশ্ করে শব্দ হলো রানার ডান পাশে। ঘাড় ফিরিয়েই অবাক হয়ে গেল রানা। ইদু মিঞা! স্যালিউট করে দাঁড়িয়ে আছে সে আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে।

'হুজুর, ঢাকা খেইকা আইলেন বুজি? ও মিয়া, ঐদিক কই যাও, আমার গাড়িটা পসন্দ অইলো না?'

অবাক হয়ে একবার ইদু মিঞা আর একবার রানার মুখের দিকে চাইল পোর্টার। রানার ইঙ্গিত পেয়ে ইদু মিঞার গাড়ির দিকেই এগোল সে। মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। এমন একটা রঙচটা ট্যাক্সিতে উঠছে যখন, বকশিশ তেমন সুবিধের হবে না।

'কি ব্যাপার, ইদু মিঞা? তুমি এখানে যে? ঢাকা ছেড়ে চিটাগাং এলে কবে?'

'আইজই আইছি, হুজুর। পাগলের পাল্লায় পরছিলাম। উরায়া লোইয়া আইছে চিটাগাং। উফ্! নন, হুজুর, উইঠা পরেন।'

গাড়িতে উঠে বসল রানা। পাঁচ টাকার নোট বকশিশ পেয়ে খুশি মনে সালাম দিল পোর্টার। বানরের মত স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠে বসল ইদু মিঞা ড্রাইভিং সীটে। চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই। সজারুর কাঁটার মত খাড়া চুল ইটালিয়ান স্যালুনে (রাস্তার পাশে ইঁটের ওপর বসা নাপিতের কাছে) কদম ছাঁট দেয়া, ঢিলা খাকি কোর্তা, বুক পকেট দুটো ফুলে আছে হরেক রকম হাবিজাবি জিনিস ভর্তি হয়ে, ময়লা পাজামা আর পায়ে থ্যাবড়া নাকের লেস-হীন বাটার নটি-বয় শু—রঙটা কালো ছিল না ডার্কট্যান বুঝবার উপায় নেই এখন আর। গাড়ি স্টার্ট দিয়েই মুখ ছুটাল। গাড়িও চলেছে, কিন্তু মুখের চেয়ে কম স্পীডে।

'আইজ কার মুখ দেইখা যে উঠছিলাম, দিনটা এক্কেরে ছিত্তিছান হোইয়া গেল। ঢাকায় যে কেমতে ফিরুম তাই ভাবতাছি, হুজুর।'

'কেন, কি হয়েছে?'

'খুন হইয়া গেছি গা, হুজুর। ঠাইট জবো করব আমারে মতির মায়ে। এউগা খবর বি দিয়া আইবার পারি নাই। নয়টার সময় খায়া লোইয়া বাইর অইছি গাড়ি লইয়া খ্যাপ মারবার, ইস্কাটনের মোড়ে পরলাম হালায় পাগলের পাল্লায়। জিগায়, চিটাগাং যাইবা? সিদা না কইরা দিলাম। কইলে বিস্যাস কর্‌বেন না হুজুর, পাচটা জিন্না সাবের ফোটু বাইর কইরা দ্যাহাইল।'

'তার মানে?' সাগর-সঙ্গমে দাঁড়ানো আবছা হয়ে আসা ইয়টটার দিকে চেয়ে আনমনে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আরে, এইটা বি বুঝলেন না? একসো ট্যাকার লোট। পাস্‌সো ট্যাকা। লালচটা সামলায়া লইলাম, হুজুর। না করলাম। আরও পাচটা লোট বাইর করল হালায়। খামোস খায়া গেলাম। দেমাকটা এক্কেরে গুইরা গেল গা, হুজুর, নিজেরে চেক দিবার পারলাম না আর, আয়া পড়লাম।'

রানা একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'খুব দরকার ছিল বোধহয় লোকটার চিটাগাং আসা?'

'আর কোয়েন না, হুজুর। কইলাম মতির মায়েরে এউগা খবর দিয়া যাই, কয় টাইম নাই। জোহর অক্তে বাইত না গেলে তামাম দুনিয়া খুইজ্জা বেড়াইব, মিটফোর্ট-মেডিকল তেলেস্‌মাৎ কইরা ফালাইব আমার বিবি। আর কারও মুখে যদি হুনে মায়ালোক পাসিঞ্জার লোইয়া চিটাগাং গেছি—তাইলেই তেরটা বাজছে আমার।' হেড লাইট অন্ করে দিল ইদু মিঞা।

'মেয়েলোক নিয়ে এসেছ নাকি তুমি ঢাকা থেকে?'

'হ হুজুর, এক্কেরে সুরাইয়াব মথন খাবসুরাত। আপনের লগে খুব মানাইত, ঐ কানা হালার লগে মানায় না। বড় খেইল দেখাইছে আইজ ঐ ব্যাটা। ট্যাকা দিছে ঠিকই, মাগার ইঞ্জিলটা এক্কেরে ফিনিস্ কইরা দিছে। ঢাকায় গিয়াই ওস্তাদের কাছে লৌর পারবার লাগব সাতদিন। পয়লা ফেরি তক্ বড় দিগদারী করছে আমারে— জল্দি চালাও, জল্দি চালাও। ফেরী পারোইতেই আমারে মেম সাবের লগে বইবার কইয়া নিজে ধরল ইশ্‌টিয়ারিন।'

'তাই তুমি দিলে?' তৃতীয় বার পিছন দিকে চেয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'মানা করছিলাম, মাগার ইমুন চোখ গরম কইরা তাকাইল যে কইলজাটা হুগায়া গেল গা, হুজুর। কিছু কইবার পারলাম না। আরিব্বাপরে বাপ, কি চালান চালাইল, হুজুর, সাত ঘণ্টার রাস্তা উড়াইয়া লোয়া আইল চাইর ঘণ্টায়!'

হঠাৎ একটা কথা মনে এল রানার। গোলাম হায়দার আর রুমানা নয় তো? ইস্কাটনেই তো গোলাম হায়দারের বাড়ি। কানা বলছে, সেটাও মিলে যাচ্ছে অনেকটা। দ্রুত চিটাগাং পৌঁছানো অত্যন্ত দরকার—তাও মিলছে। তাইতো! নিজের গাড়ি ছেড়ে গোলাম হায়দার যে ট্যাক্সিতে করে চিটাগাং চলে আসতে পারে একথা তো একবারও ভাবেনি ওরা! ওর প্রকাণ্ড ডজ গাড়িটা বিকেল পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে ওর গাড়ি বারান্দায়—ফোন

করে জানা গেছে সাহেব বাথরুমে আছেন, সাহেব খাওয়া-দাওয়া করছেন, সাহেব মেমসাহেবের ঘরে, সাহেব ঘুমোচ্ছেন! অথচ বেলা দুটোর মধ্যেই পৌঁছে গেছে সে চিটাগাং। চতুর্থবার পিছন দিকে চাইল রানা। প্রকাণ্ড কালো পেট্রোলে গাড়িটা সেই একই দূরত্ব বজায় রেখে আসছে পিছন পিছন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে তাই হেডলাইট অন্ করে দিয়েছে।

'তুমি আজ যে লোকটাকে নিয়ে এসেছ তার ডান চোখটা কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, আর গলায় একটা গোল দাগ আছে, তাই না, ইদু মিঞা?'

বিস্মিত চোখে চাইল ইদু মিঞা রানার দিকে। 'আপনে কেমতে জানলেন, হুজুর?'

'বলছি। তার আগে তোমার একটু কেরামতি দেখাতে হবে, ইদু মিঞা। পেছনের ওই কালো গাড়িটা লেগেছে আমাদের পেছনে। সামনের মোড়টা ঘুরেই ফুলস্পীড দেবে। কিছুদূর গিয়েই রাস্তাটা আবার ডাইনে মোড় নিয়েছে। কিন্তু এই প্রথম মোড়টা ঘুরে কয়েকটা বাড়ি পরেই বাঁয়ে একটা গলি আছে। চট্ করে ঢুকে পড়বে গলির মধ্যে। ঢুকেই লাইট অফ্ করে দেবে। ফুলস্পীড দাও এখন।'

মুখের থেকে কথা শেষ হবার আগেই কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। তিন সেকেন্ডে পঁয়ষট্টি ডিঙিয়ে গেল মাইল-মিটারের কাঁটা। মোড়টা দশ গজ থাকতেই ডাবল্-ডিক্লাচ্ করে সেকেন্ড গিয়ার দিল ইদু মিঞা। গর্জন করে উঠে আপত্তি জানাল এঞ্জিনটা। তারপর ব্রেকে পা না ঠেকিয়েই স্টিয়ারিং কাটাল সে। রাস্তার ওপর চাকা স্কিড করার একটা বিশ্রী শব্দ কানে এল। কিন্তু এক্সিলারেটারে আরও চাপ দিল সে। সোজা হয়ে গেল গাড়িটা। তিন সেকেন্ড পরেই বাঁয়ে কাটল সে আবার। ফুলব্রেক চেপে লাইট নিভিয়ে দিয়ে থেমে গেল সে একটা বাড়ির অন্ধকার ছায়ায়। পিছন ফিরে অপেক্ষা করতে থাকল রানা। একটু পরেই পিছনের গাড়িটার এঞ্জিনের গর্জন শুনতে পেল সে—দেখাদেখি স্পীড দিয়েছে পেট্রোলেও। চারটে হেডলাইট জ্বেলে খুঁজছে ওদের। এক সেকেন্ডে পেরিয়ে গেল গাড়িটা গলি-মুখ। শুধু এক ঝলক দেখতে পেল রানা। তাতেই পরিষ্কার দেখা গেল শুধু একজন লোক বসে আছে গাড়িটার ড্রাইভিং সীটে, আর কেউ নেই গাড়িতে।

পাঁচ মিনিট চুপচাপ বসে রইল ওরা। তারপর যেন রানার কথাকেই সমর্থন করছে এমনিভাবে বলে উঠল ইদু মিঞা, 'হ হুজুর, আপনের পিছেই লাগছিল এই হালায়। উই কানা হালারে যেই বাড়িতে নামায়া দিছিলাম, উই বাড়িত খারোয়া থাকতে দেখছিলাম এই গাড়িটারে। আপনার লগে দুশমনী আছে নিকি, হুজুর, এগো?'

'না, দুশমনী নেই। তবে এদের কাছ থেকে গোপনে থাকতে চাই আমি।'

এইবার প্রশ্ন করে করে অনেক কথা জেনে নিল রানা ইদু মিঞার কাছ থেকে। মেয়েটাকে প্রথমে নামিয়ে দেয়া হয়েছে আগ্রাবাদে, তারপর আন্দরকিল্লার একটা বাড়িতে গিয়েছিল গোলাম হায়দার—কয়েক মিনিট পরেই

বেরিয়ে এসে নিয়ে গেছে ওকে চিটাগাং কলেজের কাছে টিলার উপরে একটা বাড়িতে। সেইখানেই টাকা দিয়ে বিদায় করে দিয়েছে সে ইদু মিঞাকে। দুটোর সময় ছেড়েছে গোলাম হায়দার ইদু মিঞাকে। হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়েছে ইদু মিঞা গাড়ির পিছন-সীটে। ঘুম থেকে উঠতে বিকেল গড়িয়ে যাওয়ায় কাল সকালে ঢাকা রওনা দেবে মনে করে শহর দেখতে বেরিয়েছিল। নিজের গাড়ি চড়ে যে একটু বেড়াবে তার উপায় নেই, গাড়ির ছাতের হলুদ রং দেখেই ডেকে বসল একজন। প্যাসেঞ্জার জুটে গেল পতেঙ্গা এয়ারপোর্টের। ওকে নামিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছিল সে শহরগামী কোন প্যাসেঞ্জারের আশায়। পেয়ে গেল রানাকে।

কাগজের ওপর ম্যাপ এঁকে প্রত্যেকটা বাড়ি ভালমত চিনে নিয়ে গাড়ি ঘুরাতে বলল সে ইদু মিঞাকে। ওর বিবি সাহেবের কাছে আজই সংবাদ পাঠিয়ে দেবে সে ঢাকায় টেলিফোন করে, কথা দিল। মেয়ে লোক প্যাসেঞ্জারের কথা ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না মতির মা, আশ্বাস দিল।

অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে রানাকে পৌঁছে দিল ইদু মিঞা মিসৃখা হোটেলে। পাঁচতলার দশ নম্বর রুমটা বুক করল রানা। এয়ারকুলার ফিট করা আছে ওই ঘরে।

নয়

এয়ারকুলারের হাই কুল লেখা সাদা বোতামটা টিপে দিয়ে ইজি-চেয়ারে শুয়ে পড়ল রানা। এই ঘরের সাথে রানার অনেক পুরানো স্মৃতি জড়িয়ে আছে, কিন্তু সেগুলোকে মনের পর্দায় ভেসে উঠবার সুযোগ দিল না সে। বর্তমান পরিস্থিতিটা চিন্তা করে দেখতে হবে।

আবদুল হাইয়ের মৃত্যু-সংবাদটা পেয়েই এমন ব্যস্তসমস্ত হয়ে পাগলের মত গাড়ি চালিয়ে চলে এসেছে গোলাম হায়দার চিটাগাং-এ। সকালে ওর বুকিং ক্যান্সেল হয়ে যেতে দেখেই বুঝে ফেলেছে সে ব্যাপারটা। ওকেই যে এ ব্যাপারে সন্দেহ করা হয়েছে তা ও জানে। চিটাগাং-এ পৌঁছে সমস্ত ব্যাপারটা আগে ভাগেই আয়ত্তে আনতে চায় ও। নাকি আরও কোন কারণ আছে এই তাড়াহুড়োর? আবদুল হাইয়ের সঙ্গে রাহাত খানের যোগাযোগ আছে এটা ওর অজানা নেই, কিন্তু রানার সঙ্গে রাহাত খান বা পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর কি সম্পর্ক তা কি আন্দাজ করে নিয়েছে সে?

আজ রাতেই হোটেলটা পরিবর্তন করতে হবে। কারণ গাড়ি থেকে নেমেই দেখতে পেয়েছে রানা ধীর গতিতে সামনের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দুশো গজ দূরে দাঁড়াল সেই কালো শেভ্রোলে গাড়িটা। সামনে ইদু মিঞার গাড়িটা দেখতে না পেয়ে সে নিশ্চয়ই লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল কোথাও,

শহরে ঢোকার পর অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করতে হবে তা ওকে শিখিয়ে দিল কে? জেনে ফেলেছে ওরা রানার সত্যিকার পরিচয়? ওদের ডিপার্টমেন্টেই কোন ডাবল্ এজেন্ট নেই তো? ডোমিস্টিক সার্ভিসে তো প্যাসেঞ্জার লিস্ট পাঠায় না—ঢাকা থেকে কেউ লিস্টটা দেখে জানায়নি তো টেলিফোনে? অনেক কিছুই হতে পারে, কাজেই ও-সব চিন্তা বাদ দিয়ে এখন আপাতত কিছু নাস্তা করে বেরিয়ে পড়া দরকার। কিচেনের পাশ দিয়ে নামলে সরু রাস্তা পাবে, চেনাই আছে ওর—সামান্য মেক-আপ্ করে নিলে টের পাবে না কেউ।

সুটকেসটা খুলে গোটা কতক প্রয়োজনীয় জিনিস বের করে নিয়ে এগিয়ে গেল রানা ড্রেসিং টেবিলের দিকে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যত্নের সঙ্গে পাল্টে নিল সে মুখের চেহারাটা। কালচে রঙের টেট্রনের স্যুটটা পরে নিয়ে এবার দ্রুত কয়েকবার শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করা প্র্যাকটিস্ করল। সংক্ষিপ্তভাবে পরীক্ষা করল সে যন্ত্রটা, তারপর নিশ্চিন্ত মনে ঢুকিয়ে রাখল হোলস্টারে। এবার চারটে বালিশ আর দুটো কম্বলকে বিছানায় ওপর মানুষের মত করে শুইয়ে ঢেকে দিল সে চাদর দিয়ে। মাথার কাছে ট্র্যানজিস্টারটা খুলে দিতেই আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল কোন মহিলা। রানা বুঝল, রেডিও চিটাগাং থেকে আধুনিক বাংলা গান হচ্ছে। মৃদু হেসে সুটকেসের তালার ওপর ট্যালকম পাউডার ছিটিয়ে দিল সে খানিকটা, তারপর সন্তুষ্ট চিত্তে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ছোট একটুকরো কাগজ চার ভাঁজ করে কব্জার কাছে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করল রানা। একবার খুলে পরীক্ষা করে দেখল দরজাটা খুলতেই সত্যি সত্যি মাটিতে পড়ে যাচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, দরজা খুললেই পড়ে যাচ্ছে টুকরোটা। এবার তালা লাগিয়ে দিয়ে লিফটের কাছে এসে দাঁড়াল সে। না। সিঁড়ি দিয়ে নামাই ভাল, লিফট্-ম্যান সন্দেহ করতে পারে।

দোতলায় নেমে এল রানা সিঁড়ি বেয়ে। দোতলাতেই মিস্খার ডাইনিং-রুম ও রেস্তোরাঁ। প্রশস্ত হল ঘরটায় এখন থেকেই লোকজন জমতে শুরু করেছে। অনেকগুলো টেবিল ঘিরে জমে উঠেছে গল্প-গুজব আর চা-স্ন্যাক্সের আসর। ওয়েটাররা ছুটোছুটি করছে ব্যস্ত পায়ে। একটা ছোট্ট টেবিল বেছে নিয়ে বসে পড়ল রানা। হাফডজন সামুসা আর এককাপ কফির অর্ডার দিয়ে ঘরের প্রত্যেকটি লোককে পরীক্ষা করল সে একে একে। সন্দেহজনক একটি চেহারাও চোখে পড়ল না ওর। কফি খেতে খেতেই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করে ফেলল সে। প্রথমেই যাবে সে আগ্রাবাদের সেই বাড়িটাতে। ওখান থেকে যাবে আব্দুল হাইয়ের ফ্ল্যাটে। তারপর চিন্তা করা যাবে কি করা যায়।

বিল চুকিয়ে দিয়েই জেন্ট্স্ লেখা পর্দা টাঙানো ছোট্ট একটা বাথরুমের দিকে এগোল রানা। কিন্তু ওর ভিতর না ঢুকে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা ছোট বারান্দায়। সরু একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে। কয়েক সেকেন্ডেই রান্নাঘরের পাশে চলে এল রানা। একটা সরু গলি দিয়ে বিশ গজ এগোলেই পড়বে গিয়ে বড় রাস্তায়।

প্যান্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বেরিয়ে এল রানা গলিমুখ দিয়ে—ভাবটা, যেন অন্য কাজ করতে ঢুকেছিল সে ওই গলিতে।

অসংখ্য লোক হেঁটে যাচ্ছে ফুটপাথ দিয়ে। মিশে গেল রানা জনারণ্যে। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল সোজা বিপণী বিতানের সামনে। কেউ অনুসরণ করছে না তো? রাস্তা টপকে বিপণী বিতানে ঢুকে পড়ল রানা নিঃসন্দেহ হবার জন্যে। উজ্জ্বলা বুকস্টলে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটির ছলে দেখে নিল চারিটা পাশ ভাল করে। না কেউ অনুসরণ করেনি। নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে এসে হাঁটতে থাকল সে ফুটপাথ ধরে। প্রায় দুশো গজ হাঁটবার পর একটা বেবি-ট্যাক্সি ডাকল রানা। রেডিও অফিসের দিকে চালাতে বলল ওকে।

প্রকাণ্ড ছয়তলা বাড়িটা। গোলাম চেম্বার। পাঁচশো গজ থাকতেই ভাড়া চুকিয়ে বিদায় দিয়ে দিল রানা বেবি-ট্যাক্সিটাকে। তারপর হাঁটতে থাকল মন্থর পায়ে। রাত পোনে আটটাতেই বেশ নির্জন হয়ে এসেছে এলাকাটা। বাড়িটা গোলাম হায়দারের। একতলায় ব্যাঙ্ক আছে একটা—গেট লাগিয়ে দিয়ে ভেতরে বাতি জেলে হিসাব-কিতাব মেলানো হচ্ছে। দোতলা এবং তেতলাটা অন্ধকার—ইনশিওরেন্স কোম্পানির অফিস—বন্ধ করে চলে গেছে সবাই সাড়ে পাঁচটাতেই। চারতলাটা ভাগাভাগি করে ভাড়া নিয়েছে নামজাদা এক ট্র্যাভেল এজেন্ট আর ট্যুরিস্ট ব্যুরো। সব ক'টা বাতি জ্বালা। রানা জানে পাঁচতলায় গোলাম হায়দারের নুনা মোটরসের অফিস—জাপানী কয়েকটা গাড়ির এজেন্সী নিয়ে অফিস খুলেছে সে এখানে। আর ছয়তলার ওপর বারোটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করেছে সে আধুনিক ফ্যাশানে। গগনচুম্বী ভাড়া। সাতদিনে পাঁচ হাজার। কিন্তু সাধারণত খালি থাকে না একটা ঘরও। বিরাট বিরাট সব পয়সাওয়ালা লোক আসে এখানে হপ্তাখানেক এঞ্জয় করবার জন্যে। মন্দ লোকে বলে, তুলনাহীন লাঞ্চ এবং ডিনার তো আছেই, সাত দিনে সাত রকমের মদ এবং আরও নানা রকম আনন্দ সাপ্লাই দেওয়া হয় এখানে বিনা পয়সায়—এক্সট্রা কস্ট নেই। এখানেই নামিয়ে দিয়েছে সে রুমানাকে।

গেটের দারোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে সালাম করল।

'সীট আছে নাকি হে?' মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল রানা উপর দিকে ইঙ্গিত করে।

'হামকো মালুম ন্যহি, হাজুর,' গম্ভীর মুখে বলল বন্দুকধারী দারোয়ান।

এগিয়ে গিয়ে সেলফ অপারেটেড লিফটে উঠল রানা। সিক্স লেখা বোতামটা টিপে দিল। জায়গাটা একটু ঘুরে ফিরে দেখে নিতে চায় সে। এছাড়া করবারও কিছু নেই আজ। কাল সকাল থেকে আরম্ভ হবে ওর সত্যিকার ইনভেস্টিগেশন।

লিফট থেকে বেরিয়েই চওড়া করিডর। করিডরের শেষ মাথায় উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে একটা ঘরে। অ্যাংলো একজন মহিলা বসে আছে একটা ডেস্ক সামনে নিয়ে এইদিকে মুখ করে। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। একটু মাংসল বাড়ন্ত দেহ। ঠিক সুন্দরী বলা যাবে না, কিন্তু রংটা পেয়েছে বাপের, রীতিমত ফর্সা।

এগিয়ে গেল রানা।

'সরি। এ মাসে আমাদের একটা সীটও খালি নেই। মে-র ফার্স্ট উইকের জন্যে ফুল অ্যাডভান্স দিয়ে বুক করতে পারেন,' রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে বলল মেয়েটা।

'বসতে পারি?' জিজ্ঞেস করল রানা মেয়েটির চোখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে।

'ওহ্, শিওর। টেক এ সীট।' লাল ঠোঁটে চেপে ধরল সিগারেটটা।

চেয়ারে বসে ভুবন ভোলানো হাসি হাসল রানা। 'দেখুন, মে মাসের পয়লা সপ্তাহে আমি থাকব কেপটাউনে। আমার জাহাজ চিটাগাং পোর্ট ছেড়ে যাচ্ছে বাইশ তারিখে। আর কোনদিন হয়তো এখানে ফিরব না। আজই কোন ব্যবস্থা করা যায় না? টোকিও থেকে খুবই সুনাম শুনেছি আপনার এই অ্যাপার্টমেন্টের।'

'আমার কোথায়?' আর একটু গোলাপী দেখাল যুবতীর রুজ মাখা গাল। 'আমি চাকরি করি এখানে। তুমি তাহলে নাবিক একজন—সেইলার? দেশ কোথায় তোমার?'

'রিও ডি জেনারিও। ব্রাজিল। তোমার?'

'আমি এদেশী। অ্যাংলো। কিন্তু তোমাকে চেনা-চেনা লাগছে কেন বলতে পারো?'

'হয়তো পূর্ব জন্মে চেনাজানা ছিল—কে জানে!'

হাসল মেয়েটা। বলল, 'আমি দুঃখিত—সীট নেই। ভাল কথা, এখানকার রেট জ.নো তো? ফাইভ থাউজ্যান্ড আ উইক।'

'বলো কি! আমার পুরো পাঁচ মাসের বেতন! যাহ্, ঠাট্টা করছ।'

'তোমার কাছে তাই মনে হচ্ছে? তুমি নিশ্চয়ই ভেবেছিলে, সাতদিনে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া হবে?'

'না, অত কম না। ভেবেছিলাম বড় জোর চার-পাঁচশো টাকা। বাপ রে, পাঁ···চ হাজার! তাহলে মানে মানে কেটে পড়তে হয়। ওদিকে গর্ব করে বন্ধু-বান্ধবদের বলে এসেছি··· ছি-ছি।'

'কি বলে এসেছ?' মৃদু হাসি ফুটে উঠল যুবতীর মুখে।

'জাহাজের সবাই মুখ টিপে হেসেছিল, তখন বুঝিনি। ছি-ছি, বড় লজ্জার মধ্যে···'

'শোনো, যুবক। লজ্জার কিছু নেই। খোঁজ নিয়ে দ্যাখো গিয়ে, জাহাজের প্রত্যেকটি লোকই হয়তো একবার করে ঘুরে গেছে এখান থেকে বিফল হয়ে।'

'সম্ভব,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তুমি কি এখানেই থাকো?'

'আমার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে এখানে। আমরা দুই বোন থাকি।'

'কি নাম তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা নরম কণ্ঠে।

'আইভরী গিলবার্ট। তোমার?'

'আমার নাম স্যামুয়েল। আজ আমাকে ন'টার মধ্যেই জাহাজে রিপোর্ট করতে হবে। উঠি তাহলে, কেমন?' উঠে দাঁড়াল রানা। 'তোমাকে ধন্যবাদ। গুডবাই।'

'গুডবাই।'

সিঁড়ি বেয়ে নামতে আরম্ভ করল রানা। পঞ্চম তলাটা দেখেই চলে যাবে সে আবদুল হাইয়ের ফ্ল্যাটে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে পঞ্চম তলায় কিছু দেখতে পেল না রানা। তালা মেরে বাতি নিভিয়ে দিয়ে গেছে ওরা। অন্ধকারে অচেনা বাড়িতে চোর হিসাবে ধরা পড়বার কোন আগ্রহ দেখা গেল না রানার মধ্যে। মিছেমিছি সিঁড়ি ভাঙতেও আর ইচ্ছে হলো না ওর। লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। ওপরে উঠছিল লিফট, চলে গেল ছয়তলায়। কেউ উঠল কিংবা নামল লিফট থেকে। বোতাম টিপে দিল রানা। দরজা খুলতেই ঢুকে পড়ল সে ভিতরে। একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে লিফটের কোণে। লম্বায় বড়জোর চার ফুট তিন ইঞ্চি। যেমন বেঁটে তেমনি শুকনো, আর তেমনি মিশমিশে কালো। খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি সারা মুখে। চার পাঁচদিন ক্ষুর পড়েনি গালে। ঝাড়ুদার হবে বোধহয়। গোপনে লিফট ব্যবহার করছিল—এখন রানা উঠতেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। গলায় কালো একটা কম্ফোরটার প্যাঁচানো।

গ্রাউন্ড-ফ্লোরের বোতাম টিপে দিয়ে ফিরল সে সহযাত্রীটির দিকে। জড়সড় হয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা আর অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানার দিকে। হঠাৎ লক্ষ্য করল রানা কাঁপছে লোকটা টেনে ছেড়ে দেয়া তানপুরার তারের মত। ছুটে এসে রানার একটা হাত ধরল সে।

'খো-খো-খোদার কসম লাগে, আমাকে··· দোহাই লাগে আপনার···'

বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া রক্তশূন্য মুখে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর থেকে। কথাটা শেষ করতে পারল না, আটকে গেল মাঝপথেই। পড়ে যাচ্ছে লোকটা।

'ব্যাপার কি? কি হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ করছে?' চট্ করে লাল বোতামটা টিপে দিল রানা। থেমে গেল লিফট মাঝপথে।

এবার মুখের চেহারাটা সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গেল লোকটার। দুই হাত মাথার ওপর তুলে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল সে।

'শুয়ে পড়ো!' বলল রানা উত্তেজিত কণ্ঠে। অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে লোকটা। গোঁ-গোঁ আওয়াজ বেরুচ্ছে ওর গলা দিয়ে। চোখ দুটো বিস্ফারিত। কম্ফোর্টারটা আলগা করে দেবার জন্যে ঝুঁকে পড়ল রানা। কিন্তু গলার কাছে হাত নিয়ে যেতেই তীক্ষ্ণ বিকৃত কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল লোকটা। এক ঝাঁকিতে সরিয়ে নিল মাথাটা।

'মা-না-মা! মেরো না!! পায়ে পড়চি তোমার—ছেড়ে দাও আমাকে। আর কোনদিন করব না! কসম খোদার···'

'কী যা-তা বলছ তুমি? কি হয়েছে তোমার?' কথাটা বলেই আবার গ্রাউন্ড-ফ্লোরের বোতাম টিপে দিল রানা। খোলা বাতাস দরকার এখন এই

লোকটার। পকেট থেকে রুমাল বের করে বাতাস করতে থাকল ওর মুখে। লিফট থেমে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেল আপনা-আপনি। বলল, 'তুমি বরং এখানেই থাকো। দারোয়ানটাকে ডেকে আনছি আমি। দেখি, আশপাশে কোনও ডাক্তার থাকলে...'

কথা শেষ হবার আগেই তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে রানার কজি চেপে ধরল লোকটা। এক হাতে ওর পিঠটা জড়িয়ে ধরল রানা যেন পড়ে না যায়। থরথর করে সর্বশরীর কাঁপছে লোকটার।

'না, না কাউকে ডাকবেন না, স্যার। আমি ঠিক আচি। কিচ্ছু হোই নিকো আমার,' একটু সামলে নিয়ে বলল সে।

'তোমাকে দেখে তো তা মনে হচ্ছে না।'

'এক্ষুণি...এক্ষুণি ঠিক হয়ে যাবে, স্যার।' রানার হাতের ওপর ভর দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস টানতে থাকল লোকটা। এতক্ষণে কাছ থেকে ওর মুখটা দেখতে পেল রানা।

হঠাৎ রানা বুঝতে পারল। ভয়ঙ্কর ভয় পেয়েছে লোকটা। মৃত্যুভয়। চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে ওর কপালে। দেহের কাঁপুনিটা থামাতে পারছে না সে চেষ্টা করেও। আতঙ্কিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে সে এদিক-ওদিক। ব্যাপার কি? কে এই লোকটা? এই বাড়িতেই বা ঢুকল কেন? ভয়ই বা পেল কেন? চোর-টোর নয়তো? যাই হোক, একে নিয়ে সময় নষ্ট করলে চলবে না। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে রানার।

'আমাকে একা ছেড়ে যাবেন না, স্যার। দয়া করে আপনার সাথে লিয়ে চলুন,' কথার মধ্যে ক্যালকেশিয়ান টান।

'বেশ, তাই চলো। কিন্তু কি করে বুঝলে যে আমাকে বিশ্বাস করা যায়?'

গোল গোল চোখ করে চাইল লোকটা রানার দিকে। 'একই লিফটে নামলুম অতছ বেঁচে আচি এখনও, আপনাকে কি করে শত্রু ভাবি, বলুন?'

'শত্রু? কিসের শত্রু?'

'আমি মনে করেছিলুম, আপনি বুঝি ওদের...' থমকে থামল লোকটা কথার মাঝখানে। মৃদু গুঞ্জন তুলে ওপরে রওনা হলো খালি লিফট। 'চলুন, স্যার। আসচে ওরা। বাঁচান, স্যার, আমাকে!' কেঁপে উঠল ওর কণ্ঠস্বর শেষের দিকে।

বিরক্ত হয়ে উঠল রানা লোকটার ওপর। হয় পাগল, নয়তো নেশাখোর! আচ্ছা ফিলোপন-এ আসক্ত নয় তো লোকটা? কোথায় যেন একটা লম্বা আর্টিকেল পড়েছিল সে একবার এই জাপানী ওষুধ সম্পর্কে। এই নেশাখোররা সবসময় সামনে-পিছনে শত্রু কল্পনা করে। এদের বিশ্বাস, প্রত্যেকটা লোক সব সময় সুযোগ খুঁজছে, সবসময় মতলব আঁটছে ওদের খুন করবার। রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ ঘুরে ক্ষুর, ব্লেড বা ছুরি হাতে রুখে দাঁড়ায় ওরা পিছনের নিরীহ পথচারীর বিরুদ্ধে। এই লোকটাও সে রকম কিছু

একটা নয় তো?

যাই হোক, বেরোনো ওরও দরকার। এগোল রানা গেটের দিকে। ভয়ে ভয়ে রানার গায়ের সাথে প্রায় সেঁটে বেরিয়ে এল লোকটা বাড়ির বাইরে। রানা লক্ষ্য করল উঠে দাঁড়িয়ে সালাম করল ঠিকই, কিন্তু দারোয়ানের চোখ দুটোতে তীব্র একটা কৌতূহল ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। আরও লক্ষ্য করল তিনজন লোক বেরোল লিফটের দরজা দিয়ে। দ্রুত পায়ে এগোচ্ছে ওরা গেটের দিকে।

চঞ্চল হয়ে উঠল রানার সঙ্গীটি। ফুটপাথে পৌঁছেই জিজ্ঞেস করল, 'গাড়ি আছে, স্যার, আপনার?'

'না। কি হয়েছে, এত ভয় পাচ্ছ কেন তুমি?'

দমে গেল লোকটা গাড়ি নেই শুনে। চঞ্চল পায়ে এগোল সে রানার গায়ের সাথে সেঁটে। বাম পা-টা একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে লোকটা। মাঝে মাঝে ঝট্ করে পিছনে ঘুরে চাইছে সে। পিছনে একটা এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ হতেই রানার কোটের আস্তিনটা খামচে ধরল। রানাও পিছনে ফিরে চাইল একবার। দ্রুতপায়ে এগোচ্ছে তিনজন লোক ওদের দিকে। বেশ অনেক কাছে চলে এসেছে ওরা। এই লোকটার পিছনেই যে ওরা লেগেছে তাতে সন্দেহ রইল না রানার। বিপদ টের পেল রানা। পিছনের তিনজন লোকই সশস্ত্র। আচ্ছা, 'এটা ওকে সুদ্ধ কিডন্যাপ করবার পূর্ব-পরিকল্পিত প্ল্যান নয়তো? লোকটা অভিনয় করছে না তো? না। অতি বড় অভিনেতার পক্ষেও কপালের ওই ঘাম আর মুখের ওই ফ্যাকাসে ভাব আনা সম্ভব নয়। কিন্তু ছোটখাট ক্ষীণ দুর্বল এই লোকটা কি করেছে ওদের?

'কি নাম তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

একটা কালো ইসুযু বেলেট চলে গেল ওদের পাশ কাটিয়ে। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে সে দিকে চেয়ে লোকটা বলল, 'গিগ্... গিগ্.... গিলটি মিঞা। এসে গেল, স্যার, কি করব এখন, মেরে ফেলবে আমাকে ওরা...' কাছে চলে এসেছে পিছনের পদশব্দ। ককিয়ে উঠল গিলটি মিঞা। দুই হাঁটু ঠকাঠক বাড়ি খাচ্ছে ওর।

'শোনো, গিলটি মিঞা। তোমার কোন ভয় নেই। আরেকটু কাছে এলেই আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে আচমকা আক্রমণ করে বসব। তুমি লাইট পোস্টটার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকবে। বুঝলে? ভয় পেয়ো না।'

'পেস্তল আচে, স্যার, ওদের কাচে।'

'আছে, কিন্তু বের করবার সময় পাবে না। আর ও-জিনিস আমার কাছেও আছে একটা। দরকারের সময় ওদেরগুলো বেরোবার অনেক আগেই বেরিয়ে যাবে আমারটা। আহা, আমাকে আঁকড়ে ধরে থাকলে চলবে কেন? হাত ছেড়ে দাও...'

কিন্তু কে কার কথা শোনে! তিন গজের মধ্যে এসে গেছে পিছনের লোকগুলো। হঠাৎ লাফিয়ে রানার সামনে চলে গিয়ে নিজেকে আড়াল করল

গিলটি মিঞা ওদের থেকে। আর এগোনো অসম্ভব। আর চিন্তা করবারও সময় নেই। হঠাৎ ঝট্ করে ঘুরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা মাঝের লোকটার ওপর। আচমকা ঘুসি খেয়েই চিৎ হয়ে পড়ে গেল লোকটা সিমেন্ট করা ফুটপাথের ওপর। দ্বিতীয় জন হাঁটুর উপর খেলো প্রচণ্ড এক লাথি। ওখানটায় পঁয়ষট্টি পাউন্ড ওজনের একটা লাথি পড়লেই হাঁটু ডিজলোকেট হয়ে যায়—রানার লাথির ওজন হলো কমপক্ষে একশো পঁয়ষট্টি পাউন্ড, ফলে তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ করে বসে পড়ল এই লোকটাও। তৃতীয়জন বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার ওপর। লোকটা প্রকাণ্ড। পড়ে গেল রানা ওর ধাক্কায়। বুকের ওপর ডাইভ দিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, রানা গড়িয়ে সরে যেতেই পড়ল শানের ওপর। সাথে সাথেই ঘাড়ের পিছনে পড়ল কারাতের এক রদ্দা। মুহূর্তে জ্ঞান হারাল সে। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমজনের কজির ওপর লাথি মারল রানা। বিশ গজ দূরে ছিটকে পড়ল ওর হাতে ধরা রিভলভারটা। বাকি দু'জনের শোলডার হোলস্টার থেকে দ্রুত বের করে নিল রানা দুটো রিভলভার। দুই হাতে দুটো রিভলভার ধরে সোজা তাক করল দু'জনের বুকের দিকে। অজ্ঞান হয়ে যাওয়া লোকটাকে ধর্তব্যের বাইরে রাখল সে আপাতত।

'গিলটি মিঞা! ওই রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে এসো। তারপর ব্যবস্থা করছি ব্যাটাদের।'

কিন্তু কোথায় গিলটি মিঞা! পিছন ফিরে চেয়ে দেখল রানা প্রায় চল্লিশ গজ দূরে প্রাণপণে দৌড়ে পালাচ্ছে গিলটি মিঞা। বাম পায়ে খোঁড়াচ্ছে বলে দৃশ্যটা করুণ হলেও হাস্যকর দেখাচ্ছে ওর এই পলায়ন। হঠাৎ জ্বলে উঠল দুটো হেডলাইট গিলটি মিঞার ঠিক দশ গজ সামনে। থমকে দাঁড়াল সে দুই হাত ওপর দিকে তুলে। অসহায় দৃষ্টিতে রানার দিকে চাইল সে একবার পিছন ফিরে। তারপর আবার ডান ধারে দৌড় দিতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল স্থির হয়ে। রানা বুঝল দেরি হয়ে গেছে। এখন আর ছুটে গিয়েও কিছু করতে পারবে না সে। দু'পাশ থেকে দু'জন চেপে ধরল গিলটি মিঞার দুই হাত, তারপর শূন্যে তুলে ঝুলাতে ঝুলাতে নিয়ে গিয়ে ভরল ওকে গাড়ির ভিতর। রানার সামনে হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় ভোজবাজির মত ঘটে গেল ব্যাপারটা। কিছু বলতে পারল না সে। দড়াম করে গাড়ির দরজা বন্ধ করার শব্দ এল। সাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা রানার নাকের ডগা দিয়ে। এক ঝলক দেখতে পেল সে, ছট্ফট্ করছে গিলটি মিঞার অপরিপুষ্ট দেহটা অন্যান্য আরোহীদের মৃদু পীড়নে। চোখ ফিরাল রানা ফুটপাথের ওপর পড়ে থাকা তিনজন গুণ্ডার দিকে। আপাতত কিছু করবার নেই রানার। বিশ গজ তফাতে মাটিতে পড়ে থাকা রিভলভারটা তুলে নিল সে। হাঁটু মচকে যাওয়া লোকটা কিছুই করতে পারবে না, আর তৃতীয় লোকটা এখনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। রাস্তায়ও লোকজন নেই। কাজেই এখন নিরাপদে সরে যাওয়ার একমাত্র উপায় প্রথম লোকটাকে অচল করে রেখে যাওয়া। পা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল রানা লোকটাকে দশ বারো হাত তফাতে। তারপর জুজুৎসুর একটা সহজ প্যাঁচ

দিয়ে এমন ভাবে আটকে দিল ওর হাত-পা যে অন্য কেউ এসে সাহায্য না করলে ছুটবার ক্ষমতা রইল না আর। কেউ এসে ওকে মুক্ত করবার অনেক আগেই পগার পার হয়ে যাবে সে।

আবদুল হাইয়ের লাল ওপেল রেকর্ডটা নিয়ে রাত সাড়ে দশটায় ফিরে এল রানা হোটেল মিসৃখায়।

দশ

পরদিন সন্ধ্যায় চিটাগাং সেইলারস্ ক্লাবে একা বসে ডিনার খাচ্ছে রানা। ক্লাবঘর ছোট, কিন্তু মেম্বার অনেক। বিরাট প্রাঙ্গণটা তাই উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘিরে নেয়া হয়েছে। মস্ত তিরপল দিয়ে তাঁবুর মত করে সামিয়ানা টাঙানো। জায়গায় জায়গায় হরেক রকম ফুলের কেয়ারী—তাছাড়া নিচে ঘাসের কার্পেট। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে টেবিল পাতা। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ—নানান রঙের বালব জ্বলছে। কোথাও আলো, কোথাও ছায়া, সবটা মিলে এক স্বপ্নিল পরিবেশ। এক কোণে একা বসে ডিনার খাচ্ছে রানা। নানান রকম জুয়োর আড্ডা বসবে এই তিরপলের নিচে রাত ন'টার পর। এখন থেকেই টেবিল রেডি করছে জনাকয়েক ওয়েটার। রানা শুনেছে এখানে আসে গোলাম হায়দার। অপেক্ষা করছে সে তার জন্যে।

কয়েকটা ব্যাপারে মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে রানা। গত রাতে হোটেলে ফিরেই টের পেয়েছিল সে যে ওর অনুপস্থিতিতে ওর ঘরে প্রবেশ করেছিল একাধিক লোক। বিশেষ সাবধানতাও অবলম্বন করেনি তারা। চার ভাঁজ করা কাগজের টুকরোটা হয়তো লক্ষ্যই করেনি—পড়ে ছিল সেটা চৌকাঠের উপর, কিন্তু সুটকেসের তালার কাছে এবং মেঝেতে ট্যালকম পাউডার নিশ্চয়ই চোখে পড়েছিল ওদের, কেয়ার করেনি। সুটকেসের ভিতর জিনিসপত্র সব লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে—কিন্তু খোয়া যায়নি কিছুই।

সুটকেসের মধ্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে পোর্টারের অপেক্ষা না রেখেই হাতে তুলে নিয়ে চলে এসেছিল রানা লিফটের কাছে। বোতাম টিপতেই এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ লেখা নম্বরগুলোয় হলুদ বাতি জ্বলতে জ্বলতে উঠে এসেছিল লিফট উপরে। দরজা খুলে যেতেই পা বাড়িয়ে লিফটে উঠতে গিয়ে আঁতকে ওঠা ঘোড়ার মত লাফিয়ে সরে এসেছিল রানা। ফাঁকা! তলা খসিয়ে রাখা হয়েছে লিফটের! কোনমতে বাম হাতে দেয়াল ধরে টাল সামলে নিয়েছে রানা, নইলে ছাতু হয়ে যেত নিচে পড়ে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াটা আবার স্বাভাবিক হতেই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে বিল চুকিয়ে চলে গিয়েছিল সে আবদুল হাইয়ের ফ্ল্যাটে। আজ সকালে পেপার খুলেই চোখে পড়েছে ওর খবরটা। হেডিং--'মিসৃখা হোটেলে টাইম বম্ব।' তারপর সবিস্তারে লেখা হয়েছে, রাত

বারোটায় পাঁচতলার ওপর দশ নম্বর রূমে এক প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের কথা। কপাল ভাল, পালিয়ে এসেছিল রানা।

হঠাৎ একটা ছায়া পড়ল টেবিলের ওপর। ঝট্ করে ঘুরেই দেখল রানা তিন হাত তফাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে গোলাম হায়দার। জ্বলজ্বল করছে ওর নষ্ট চোখটা রানার দিকে চেয়ে।

'চমকে দিয়ে খাওয়াটা নষ্ট করে দিলাম না তো? বসতে পারি?' রানার উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই সামনের চেয়ারে বসে পড়ল গোলাম হায়দার। মচ্‌মচ্ করে উঠল চেয়ারটা। 'তারপর? চিটাগাং বেড়াতে এলেন বুঝি?'

'জ্বি, না। একটু কাজে এসেছি। তা আপনি হঠাৎ কোত্থেকে?' এক টেবিল স্পুন-ফুল বিরিয়ানি পুরে দিল রানা মুখের ভিতর, সেই সাথে গেল বড় সাইজের এক টুকরো খাসীর মাংস। সেগুলোকে একটু বাগে এনে আবার বলল, 'ভাল কথা, আপনার সেদিনকার চেকটা ডিজ-অনার হয়নি, ব্যাঙ্কের স্টেটমেন্ট পেয়েছি। ধন্যবাদ সেজন্যে।'

জবাব দিল না গোলাম হায়দার। ফাইভ ফিফটি ফাইভের টিন থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। তারপর স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানার মুখের দিকে। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করল রানা। দু'কাপ কফির অর্ডার দিল। তারপর সোজাসুজি চাইল গোলাম হায়দারের নষ্ট চোখের দিকে।

'কিছু বলবেন মনে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কোন জবাব নেই। তেমনি নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল সে এক মিনিট। যেন সম্মোহন করছে। মড়ার মত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওর মুখটা। অস্বস্তি বোধ করল রানা। হঠাৎ যেন ধ্যানভঙ্গ হলো এমনি ভাবে মাথা ঝাঁকাল গোলাম হায়দার, ফিরে এল মুখের স্বাভাবিক রং। এতক্ষণ পর দ্বিতীয় টান দিল সে সিগারেটে।

'এপ্রিলের নয়, আঠারো বা সাতাশ তারিখে ঠিক বেলা বারোটায় আপনার জন্ম। তাই না, মিস্টার মাসুদ রানা?'

মৃদু হাসল রানা। 'ঠিক বারোটায় কিনা জানি না, অত আগের কথা মনে নেই। তবে তারিখটা ঠিকই আন্দাজ করেছেন—এপ্রিলের নয়। কেন, কি ব্যাপার? জ্যোতিষ-বিদ্যা জানা আছে নাকি আপনার?'

'আছে। জ্যোতিষ-শাস্ত্র বিশ্বাস করেন না বুঝি আপনি?' জিজ্ঞেস করল গোলাম হায়দার।

'বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনটাই করি না। এ-নিয়ে মাথা ঘামাইনি কখনও।'

'সেটাই স্বাভাবিক। মেষ-এর জাতকের বৈশিষ্ট্যই এই। কিন্তু দুই মিনিটের মধ্যে এই শাস্ত্রে আপনার বিশ্বাস এনে দিতে পারি আমি।' তীব্র দৃষ্টিতে চাইল সে রানার মুখের দিকে।

'চেষ্টা করে দেখুন,' মৃদু হাসল রানা।

'নয় বছর বয়সে প্রথম মানুষ খুন করেছেন আপনি।' চমকে উঠল যেন

একটা নয় তো?

যাই হোক, বেরোনো ওরও দরকার। এগোল রানা গেটের দিকে। ভয়ে ভয়ে রানার গায়ের সাথে প্রায় সেঁটে বেরিয়ে এল লোকটা বাড়ির বাইরে। রানা লক্ষ্য করল উঠে দাঁড়িয়ে সালাম করল ঠিকই, কিন্তু দারোয়ানের চোখ দুটোতে তীব্র একটা কৌতূহল ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। আরও লক্ষ্য করল তিনজন লোক বেরোল লিফটের দরজা দিয়ে। দ্রুত পায়ে এগোচ্ছে ওরা গেটের দিকে।

চঞ্চল হয়ে উঠল রানার সঙ্গীটি। ফুটপাথে পৌঁছেই জিজ্ঞেস করল, 'গাড়ি আছে, স্যার, আপনার?'

'না। কি হয়েছে, এত ভয় পাচ্ছ কেন তুমি?'

দমে গেল লোকটা গাড়ি নেই শুনে। চঞ্চল পায়ে এগোল সে রানার গায়ের সাথে সেঁটে। বাম পা-টা একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে লোকটা। মাঝে মাঝে ঝট্ করে পিছনে ঘুরে চাইছে সে। পিছনে একটা এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ হতেই রানার কোটের আস্তিনটা খামচে ধরল। রানাও পিছনে ফিরে চাইল একবার। দ্রুতপায়ে এগোচ্ছে তিনজন লোক ওদের দিকে। বেশ অনেক কাছে চলে এসেছে ওরা। এই লোকটার পিছনেই যে ওরা লেগেছে তাতে সন্দেহ রইল না রানার। বিপদ টের পেল রানা। পিছনের তিনজন লোকই সশস্ত্র। আচ্ছা, এটা ওকে সুদ্ধ কিডন্যাপ করবার পূর্ব-পরিকল্পিত প্ল্যান নয়তো? লোকটা অভিনয় করছে না তো? না। অতি বড় অভিনেতার পক্ষেও কপালের ওই ঘাম আর মুখের ওই ফ্যাকাসে ভাব আনা সম্ভব নয়। কিন্তু ছোটখাট ক্ষীণ দুর্বল এই লোকটা কি করেছে ওদের?

'কি নাম তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

একটা কালো ইসুযু বেলেট চলে গেল ওদের পাশ কাটিয়ে। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে সে দিকে চেয়ে লোকটা বলল, 'গিগ্... গিগ্.... গিলটি মিঞা। এসে গেল, স্যার, কি করব এখন, মেরে ফেলবে আমাকে ওরা...' কাছে চলে এসেছে পিছনের পদশব্দ। ককিয়ে উঠল গিলটি মিঞা। দুই হাঁটু ঠকাঠক বাড়ি খাচ্ছে ওর।

'শোনো, গিলটি মিঞা। তোমার কোন ভয় নেই। আরেকটু কাছে এলেই আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে আচম্কা আক্রমণ করে বসব। তুমি লাইট পোস্টটার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকবে। বুঝলে? ভয় পেয়ো না।'

'পেস্তল আছে, স্যার, ওদের কাছে!'

'আছে, কিন্তু বের করবার সময় পাবে না। আর ও-জিনিস আমার কাছেও আছে একটা। দরকারের সময় ওদেরগুলো বেরোবার অনেক আগেই বেরিয়ে যাবে আমারটা। আহা, আমাকে আঁকড়ে ধরে থাকলে চলবে কেন? হাত ছেড়ে দাও...'

কিন্তু কে কার কথা শোনে! তিন গজের মধ্যে এসে গেছে পিছনের লোকগুলো। হঠাৎ লাফিয়ে রানার সামনে চলে গিয়ে নিজেকে আড়াল করল

গিলটি মিঞা ওদের থেকে। আর এগোনো অসম্ভব। আর চিন্তা করবারও সময় নেই। হঠাৎ ঝট্ করে ঘুরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা মাঝের লোকটার ওপর। আচমকা ঘুসি খেয়েই চিৎ হয়ে পড়ে গেল লোকটা সিমেন্ট করা ফুটপাথের ওপর। দ্বিতীয় জন হাঁটুর উপর খেলো প্রচণ্ড এক লাথি। ওখানটায় পঁয়ষট্টি পাউন্ড ওজনের একটা লাথি পড়লেই হাঁটু ডিজলোকেট হয়ে যায়—রানার লাথির ওজন হলো কমপক্ষে একশো পঁষট্টি পাউন্ড, ফলে তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ করে বসে পড়ল এই লোকটাও। তৃতীয়জন বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার ওপর। লোকটা প্রকাণ্ড। পড়ে গেল রানা ওর ধাক্কায়। বুকের ওপর ডাইভ দিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, রানা গড়িয়ে সরে যেতেই পড়ল শানের ওপর। সাথে সাথেই ঘাড়ের পিছনে পড়ল কারাতের এক রদ্দা। মুহূর্তে জ্ঞান হারাল সে। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমজনের কব্জির ওপর লাথি মারল রানা। বিশ গজ দূরে ছিট্‌কে পড়ল ওর হাতে ধরা রিভলভারটা। বাকি দু'জনের শোলডার হোলস্টার থেকে দ্রুত বের করে নিল রানা দুটো রিভলভার। দুই হাতে দুটো রিভলভার ধরে সোজা তাক করল দু'জনের বুকের দিকে। অজ্ঞান হয়ে যাওয়া লোকটাকে ধর্তব্যের বাইরে রাখল সে আপাতত।

'গিলটি মিঞা! ওই রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে এসো। তারপর ব্যবস্থা করছি ব্যাটাদের।'

কিন্তু কোথায় গিলটি মিঞা! পিছন ফিরে চেয়ে দেখল রানা প্রায় চল্লিশ গজ দূরে প্রাণপণে দৌড়ে পালাচ্ছে গিলটি মিঞা। বাম পায়ে খোঁড়াচ্ছে বলে দৃশ্যটা করুণ হলেও হাস্যকর দেখাচ্ছে ওর এই পলায়ন। হঠাৎ জ্বলে উঠল দুটো হেডলাইট গিলটি মিঞার ঠিক দশ গজ সামনে। থমকে দাঁড়াল সে দুই হাত ওপর দিকে তুলে। অসহায় দৃষ্টিতে রানার দিকে চাইল সে একবার পিছন ফিরে। তারপর আবার ডান ধারে দৌড় দিতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল স্থির হয়ে। রানা বুঝল দেরি হয়ে গেছে। এখন আর ছুটে গিয়েও কিছু করতে পারবে না সে। দু'পাশ থেকে দু'জন চেপে ধরল গিলটি মিঞার দুই হাত, তারপর শূন্যে তুলে ঝুলাতে ঝুলাতে নিয়ে গিয়ে ভরল ওকে গাড়ির ভিতর। রানার সামনে হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় ভোজবাজির মত ঘটে গেল ব্যাপারটা। কিছু বলতে পারল না সে। দড়াম করে গাড়ির দরজা বন্ধ করার শব্দ এল। সাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা রানার নাকের ডগা দিয়ে। এক ঝলক দেখতে পেল সে, ছট্‌ফট্ করছে গিলটি মিঞার অপরিপুষ্ট দেহটা অন্যান্য আরোহীদের মৃদু পীড়নে। চোখ ফিরাল রানা ফুটপাথের ওপর পড়ে থাকা তিনজন গুণ্ডার দিকে। আপাতত কিছু করবার নেই রানার। বিশ গজ তফাতে মাটিতে পড়ে থাকা রিভলভারটা তুলে নিল সে। হাঁটু মচকে যাওয়া লোকটা কিছুই করতে পারবে না, আর তৃতীয় লোকটা এখনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। রাস্তায়ও লোকজন নেই। কাজেই এখন নিরাপদে সরে যাওয়ার একমাত্র উপায় প্রথম লোকটাকে অচল করে রেখে যাওয়া। পা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল রানা লোকটাকে দশ বারো হাত তফাতে। তারপর জুজুৎসুর একটা সহজ প্যাঁচ

দিয়ে এমন ভাবে আটকে দিল ওর হাত-পা যে অন্য কেউ এসে সাহায্য না করলে ছুটবার ক্ষমতা রইল না আর। কেউ এসে ওকে মুক্ত করবার অনেক আগেই পগার পার হয়ে যাবে সে।

আবদুল হাইয়ের লাল ওপেল রেকর্ডটা নিয়ে রাত সাড়ে দশটায় ফিরে এল রানা হোটেল স্নিগ্ধায়।

দশ

পরদিন সন্ধ্যায় চিটাগাং সেইলারস্ ক্লাবে একা বসে ডিনার খাচ্ছে রানা। ক্লাবঘর ছোট, কিন্তু মেম্বার অনেক। বিরাট প্রাঙ্গণটা তাই উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘিরে নেয়া হয়েছে। মস্ত তিরপল দিয়ে তাঁবুর মত করে সামিয়ানা টাঙানো। জায়গায় জায়গায় হরেক রকম ফুলের কেয়ারী—তাছাড়া নিচে ঘাসের কার্পেট। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে টেবিল পাতা। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ—নানান রঙের বালব জ্বলছে। কোথাও আলো, কোথাও ছায়া, সবটা মিলে এক স্বপ্নিল পরিবেশ। এক কোণে একা বসে ডিনার খাচ্ছে রানা। নানান রকম জুয়োর আড্ডা বসবে এই তিরপলের নিচে রাত ন'টার পর। এখন থেকেই টেবিল রেডি করছে জনাকয়েক ওয়েটার। রানা শুনেছে এখানে আসে গোলাম হায়দার। অপেক্ষা করছে সে তার জন্যে।

কয়েকটা ব্যাপারে মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে রানা। গত রাতে হোটেলে ফিরেই টের পেয়েছিল সে যে ওর অনুপস্থিতিতে ওর ঘরে প্রবেশ করেছিল একাধিক লোক। বিশেষ সাবধানতাও অবলম্বন করেনি তারা। চার ভাঁজ করা কাগজের টুকরোটা হয়তো লক্ষই করেনি—পড়ে ছিল সেটা চৌকাঠের উপর, কিন্তু সুটকেসের তালার কাছে এবং মেঝেতে ট্যালকম পাউডার নিশ্চয়ই চোখে পড়েছিল ওদের, কেয়ার করেনি। সুটকেসের ভিতর জিনিসপত্র সব লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে—কিন্তু খোয়া যায়নি কিছুই।

সুটকেসের মধ্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে পোর্টারের অপেক্ষা না রেখেই হাতে তুলে নিয়ে চলে এসেছিল রানা লিফটের কাছে। বোতাম টিপতেই এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ লেখা নম্বরগুলোয় হলুদ বাতি জ্বলতে জ্বলতে উঠে এসেছিল লিফট উপরে। দরজা খুলে যেতেই পা বাড়িয়ে লিফটে উঠতে গিয়ে আঁতকে ওঠা ঘোড়ার মত লাফিয়ে সরে এসেছিল রানা। ফাঁকা! তলা খসিয়ে রাখা হয়েছে লিফটের! কোনমতে বাম হাতে দেয়াল ধরে টাল সামলে নিয়েছে রানা, নইলে ছাতু হয়ে যেত নিচে পড়ে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াটা আবার স্বাভাবিক হতেই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে বিল চুকিয়ে চলে গিয়েছিল সে আবদুল হাইয়ের ফ্ল্যাটে। আজ সকালে পেপার খুলেই চোখে পড়েছে ওর খবরটা। হেডিং--'স্নিগ্ধা হোটেলে টাইম বম্ব।' তারপর সবিস্তারে লেখা হয়েছে, রাত

বারোটায় পাঁচতলার ওপর দশ নম্বর রুমে এক প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের কথা। কপাল ভাল, পালিয়ে এসেছিল রানা।

হঠাৎ একটা ছায়া পড়ল টেবিলের ওপর। ঝট্ করে ঘুরেই দেখল রানা তিন হাত তফাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে গোলাম হায়দার। জ্বলজ্বল করছে ওর নষ্ট চোখটা রানার দিকে চেয়ে।

'চমকে দিয়ে খাওয়াটা নষ্ট করে দিলাম না তো? বসতে পারি?' রানার উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই সামনের চেয়ারে বসে পড়ল গোলাম হায়দার। মচ্‌মচ্ করে উঠল চেয়ারটা। 'তারপর? চিটাগাং বেড়াতে এলেন বুঝি?'

'জ্বি, না। একটু কাজে এসেছি। তা আপনি হঠাৎ কোত্থেকে?' এক টেবিল স্পুন-ফুল বিরিয়ানি পুরে দিল রানা মুখের ভিতর, সেই সাথে গেল বড় সাইজের এক টুকরো খাসীর মাংস। সেগুলোকে একটু বাগে এনে আবার বলল, 'ভাল কথা, আপনার সেদিনকার চেকটা ডিজ-অনার হয়নি, ব্যাঙ্কের স্টেটমেন্ট পেয়েছি। ধন্যবাদ সেজন্যে।'

জবাব দিল না গোলাম হায়দার। ফাইভ ফিফটি ফাইভের টিন থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। তারপর স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানার মুখের দিকে। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করল রানা। দু'কাপ কফির অর্ডার দিল। তারপর সোজাসুজি চাইল গোলাম হায়দারের নষ্ট চোখের দিকে।

'কিছু বলবেন মনে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কোন জবাব নেই। তেমনি নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল সে এক মিনিট। যেন সম্মোহন করছে। মড়ার মত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওর মুখটা। অস্বস্তি বোধ করল রানা। হঠাৎ যেন ধ্যানভঙ্গ হলো এমনি ভাবে মাথা ঝাঁকাল গোলাম হায়দার, ফিরে এল মুখের স্বাভাবিক রং। এতক্ষণ পর দ্বিতীয় টান দিল সে সিগারেটে।

'এপ্রিলের নয়, আঠারো বা সাতাশ তারিখে ঠিক বেলা বারোটায় আপনার জন্ম। তাই না, মিস্টার মাসুদ রানা?'

মৃদু হাসল রানা। 'ঠিক বারোটায় কিনা জানি না, অত আগের কথা মনে নেই। তবে তারিখটা ঠিকই আন্দাজ করেছেন—এপ্রিলের নয়। কেন, কি ব্যাপার? জ্যোতিষ-বিদ্যা জানা আছে নাকি আপনার?'

'আছে। জ্যোতিষ-শাস্ত্র বিশ্বাস করেন না বুঝি আপনি?' জিজ্ঞেস করল গোলাম হায়দার।

'বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনটাই করি না। এ-নিয়ে মাথা ঘামাইনি কখনও।'

'সেটাই স্বাভাবিক। মেষ-এর জাতকের বৈশিষ্ট্যই এই। কিন্তু দুই মিনিটের মধ্যে এই শাস্ত্রে আপনার বিশ্বাস এনে দিতে পারি আমি।' তীব্র দৃষ্টিতে চাইল সে রানার মুখের দিকে।

'চেষ্টা করে দেখুন,' মৃদু হাসল রানা।

'নয় বছর বয়সে প্রথম মানুষ খুন করেছেন আপনি।' চমকে উঠল যেন

রানা। 'তারপর বারো থেকে আঠারোর মধ্যে নয়টা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটেছে আপনার জীবনে। তিনবার আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে, তিনবার সড়ক দুর্ঘটনা আর তিনবার আগুন সংক্রান্ত দুর্ঘটনা। প্রতিবারই একটুর জন্যে প্রাণ রক্ষা পেয়েছে আপনার।' মুখ দেখে মনে হচ্ছে তাজ্জব বনে গেছে রানা। 'উনিশ বছর বয়সে আপনি বাবা-মা দু'জনকেই হারিয়েছেন একই সঙ্গে। আরও আগের কথা বলি—নইলে ভাববেন কোন কৌশলে এসব তথ্য যোগাড় করেছি আমি। আপনি জীবনে কখনও মায়ের দুধ খেতে পাননি। আপনার জন্মের পরই যে কোন কারণেই হোক, হয় আপনি খোয়া গিয়েছিলেন, নয়তো আপনার মা এক বছরের জন্যে আপনার কাছ থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। বলুন? বিশ্বাস এসেছে আমার জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উপর?'

সত্যিই হাঁ হয়ে গিয়েছে রানার মুখটা। আশ্চর্য! একটি কথাও কিন্তু মিলল না! অথচ গড়গড় করে এতগুলো মিথ্যেকথা বলে গেল গোলাম হায়দার—যেন প্রত্যেকটি কথা রানার জীবনের সাথে মিলে গিয়ে অবাক করে দেবে রানাকে, এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। ব্যাপার কি? কি মতলব ব্যাটার? কি বোঝাতে চাইছে এসব বলে? উত্তর দিল না।

খনখনে গলায় হেসে উঠল গোলাম হায়দার।

'অতীত যখন অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দিয়েছি, ভবিষ্যৎও বলতে পারব, তাই না?'

'বলুন দেখি?'

ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেল গোলাম হায়দারের মুখ। নষ্ট চোখটা জ্বলজ্বল করছে রানার চোখের দিকে চেয়ে।

'এই মুহূর্তে আপনার মাথার ওপর এক মহা বিপদ উপস্থিত, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না এই বিপদের ভয়ঙ্করত্ব। পজিটিভ মারস্ আপনার গভার্নিং প্ল্যানেট: সান এক্জালটেড। ফার্স্ট হাউস অফ ফায়ার ট্রিপলিসিটির মানুষ আপনি, বর্ন ফাইটার, অবস্টিনেট। এই রাশির লোকেরা আর্মিতে গেলে ভাল করে। মারস্ আপনাকে করেছে দুর্দান্ত সাহসী; এই সিম্বলের মানেই হচ্ছে ওঅর, অ্যাকশন্ অ্যান্ড পাওয়ার। আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে ইমপালসিভ অ্যাক্শন্। এরই ফলে মৃত্যু ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে আপনার।'

'কিভাবে এড়ানো যাবে এই নিশ্চিত মৃত্যু?'

'পাথর পরলে।'

'পাথর পরলে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। স্টোনস্। অদ্ভুত এর ক্ষমতা। কোরান শরীফেও এর গুণকীর্তন আছে। কেমিক্যাল রি অ্যাক্শন্ তো আছেই, মহাজাগতিক রশ্মি এর ভিতর দিয়ে মানুষের দেহে যখন প্রবেশ করে তখন তার মধ্যে আশ্চর্য ক্ষমতা সঞ্চার করতে পারে। কোন দুষ্ট গ্রহের কু-নজর এড়াতে হলে পাথর ছাড়া আর কোন গতি নেই। পার্সোনাল ম্যাগনেটিজম বাড়াতে হলেও এই পাথর।'

'কি পাথর লাগবে আমার?'

'ওটা অত সহজে বলা যায় না, অনেক ক্যালকুলেশন দরকার। কিরোর মতে আপনার লাগবে রুবি, গার্নেট, রেড স্টোন্‌স্, ডায়মন্ড, টোপায এবং অ্যাম্বার। অত্যন্ত হাস্যকর ব্যাপার। স্টোন সাজেস্ট করা কি এতোই সহজ? ঝেড়ে ছ'টা নাম বলে গেলেই হলো? আমি কাউকে একটার বেশি স্টোন দিই না। সত্যিই, একজন লোকের জন্যে এত পাথর হতেই পারে না। বহু চিন্তা-ভাবনার পর সব দিক বিচার-বিবেচনা করে সেই লাকি স্টোনটা বের করতে হয়।'

'তাহলে তো আজ আর বলতে পারছেন না। তাই না?'

'না। আজ স্টোন সিলেক্‌শন্‌ সম্ভব নয়, কিন্তু অন্য কোন প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে রানা বলল, 'বলুন দেখি, টাকা পয়সা কি রকম হবে?'

'প্রচুর আয়, প্রচুর ব্যয়। স্পেশালি লাকি ইন্‌ গ্যাম্বলিং। কিন্তু টাকা থাকবে না।'

'বিয়ে শাদী?'

'নেই। বিয়ের আগেই মৃত্যু ঘটবে আপনার। যদি কপালগুণে বেঁচে যান তাহলে মেষ রাশি দেখে বিয়ে করবেন।'

'স্বাস্থ্য?'

'আগুন, আগ্নেয়াস্ত্র, সড়ক দুর্ঘটনা থেকে সাবধান থাকবেন। আরও দু'একটা জিনিস বলে দিচ্ছি—নাইন এবং ওয়ান হচ্ছে আপনার সবচেয়ে ইম্‌পরটেন্ট নাম্বার, মনে রাখবেন। আপনার ম্যাগনেটিক ভাইব্রেশন বাড়াবার জন্যে সবসময় রেড, ক্রিমযন, রোয এবং গোল্ড, ইয়েলো, অরেঞ্জ, ব্রোঞ্জ অথবা গোল্ডেন ব্রাউন—এইসব রঙের জামা, কাপড়, জুতা আর টুপী পরবেন। আপনার জীবনের বেশির ভাগ স্মরণীয় ঘটনা ঘটবে নয়, আঠারো, সাতাশ, ছত্রিশ, পঁয়তাল্লিশ, চুয়ান্ন, তেষট্টি এবং বাহাত্তর বৎসর বয়সে।'

'অত বছর পর্যন্ত তো বাঁচবই না।'

'বাঁচতে পারেন, যদি আমার উপদেশ মত পাথর ব্যবহার করেন।'

'আচ্ছা বলুন দেখি, হঠাৎ পাঁচতলা থেকে নিচে পড়ে গিয়ে কিংবা টাইম বম্ব বিস্ফোরণে মৃত্যু আছে কিনা আমার কপালে?' আরেক চুমুক দিল রানা কফিতে।

'না। এই বৎসর ওতে আপনার মৃত্যু হবে না,' যেন কিছুই বোঝেনি এমনি ভাবে বলল গোলাম হায়দার।

'তাহলে নিতান্ত গর্দভ ছাড়া এই ধরনের অপচেষ্টা করবে না কেউ, কি বলেন?'

গালিটা হজম করে নিল গোলাম হায়দার। সিগারেট ধরাল আরেকটা। রানা লক্ষ করল কফির কাপটা নাড়াচাড়া করছে, কিন্তু এক চুমুকও খাচ্ছে না

লোকটা।

'আপনি নিজে কোন্ রাশির লোক, মিস্টার গোলাম হায়দার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি? আমি ক্যান্সারের জাতক। ফার্স্ট হাউজ অভ ওয়াটার ট্রিপলিসিটি। সেই জন্যেই বোধহয় আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হবে না কোনদিন। ওয়াটার এবং ফায়ার চিরকাল পরস্পর বিরোধী। চিরকাল পানির কাছে মাথা নত করতে হয়েছে আগুনকে। আপনার অনেক ক্ষমতা আছে, মিস্টার মাসুদ রানা। কিন্তু কোনদিন যদি ওয়াটার ট্রিপলিসিটির কোন লোকের সাথে যুদ্ধ বাধে, তাহলে?' প্রশ্ন করেই সিগারেটের আগুনটা ভরা কফির কাপে ডুবাল গোলাম হায়দার। ছ্যাঁৎ করে নিভে গেল আগুনটা। হেসে উঠল সে। তারপর নিজেই উত্তর দিল, 'নিভে যাবে।'

তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল সে রানার চোখের দিকে।

'অনেক ধন্যবাদ। বিনা পয়সায় অনেক মূল্যবান উপদেশ পাওয়া গেল,' বলল রানা।

'আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না?'

'না।'

'কেন? কি পাথর পরলে আপনার মাথার ওপর থেকে বিপদ কেটে যাবে জানতে ইচ্ছে করছে না আপনার?'

'ইচ্ছে করছে। কিন্তু আপনি কি তা বলবেন?'

হোঃ হোঃ করে বীভৎস হাসি হেসে উঠল গোলাম হায়দার, তারপর বলল, 'না বলাই উচিত। বিশেষ করে ব্রিজ খেলায় হারিয়ে দেয়ার পর তো নয়ই। কিন্তু তবু বলব। আমার উপদেশ মত একটা পাথর আংটি বানিয়ে পরলে কেটে যাবে আপনার সমস্ত বিপদ। অলৌকিক এর ক্ষমতা।'

'নাম তো বলছেন না।'

'কি করে বলব বলুন? হরেক রকমের পাথর আছে। ঠিক কোনটা আপনার স্যুট করবে তা বের করতে হলে সময় দরকার। অন্তত তিনটে ঘণ্টা লাগবে আপনার হাতের রেখার সাথে জন্মের সাল তারিখ মিলিয়ে প্রচুর অঙ্ক কষে প্রত্যেকটা গ্রহ-তারার অবস্থান নির্ণয় করে ঠিক পাথরটা সিলেক্ট করতে।'

'তাহলে তো আর হলো না।'

'হতে পারে এক কাজ করলে। কিন্তু ছ'দিন সময় লাগবে তাতে। আমি প্রতিদিন এক ঘণ্টার জন্যে আমার ইয়টে যাই। আপনি যদি হপ্তা খানেক ছুটি নিয়ে ওই ইয়টে আমার আতিথ্য গ্রহণ করেন তাহলে রোজ আধঘণ্টা করে আপনার পেছনে সময় দিতে পারি আমি। চালডিনের নিউমারোলজি আর কিরোর পামিস্ট্রির সাথে আমি ইন্ডিয়ান এবং টিবেটান অ্যাস্ট্রলজি যোগ করে নতুন এক জ্যোতিষ-শাস্ত্র তৈরি করেছি। শেষ বয়সে এর ওপর একটা বই লেখারও ইচ্ছে আছে। আপনি তাজ্জব হয়ে যাবেন আমার জ্ঞানের বহর দেখে। আসবেন?'

রানা বুঝল, এতক্ষণ মিথ্যে ভণিতার পর এবার আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করছে গোলাম হায়দার। এটা একটা চ্যালেঞ্জ। ইয়টে নিতে চায় ও রানাকে। সাতদিনের জন্যে। কিন্তু কেন? খুন করবে না যদ্দূর সম্ভব—কারণ ও জানে, গেলে রানা আঁটঘাট বেঁধে সবাইকে জানিয়েই যাবে। তাহলে? সাতদিন রানাকে নজরবন্দী রেখে লাভ কি ওর? এমন কী কাজ করতে যাচ্ছে ও এই সাতদিনে, যার থেকে রানাকে দূরে সরিয়ে রাখা দরকার? নিষেধ করে দেবে ও? কিন্তু তাহলে ইয়টে যাবার সুযোগ যদি আর না আসে? ভালমত ভেবে-চিন্তেই টোপ ফেলেছে গোলাম হায়দার। ও জানে, যে কোন ছুতোয় ইয়টে যাবার সুযোগ পেলেই লুফে নেবে রানা আনন্দের সঙ্গে। মন স্থির করে ফেলল ও।

'এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব। তা কবে থেকে স্টাডি আরম্ভ করতে চাইছেন?'

'কালই আসুন না। এই ধরুন এগারোটার দিকে?'

'বেশ। রাজি আছি আমি।'

'ঠিক আছে। আপনার ঠিকানা লিখে দিন, আমার শোফার আপনাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাবে সাগর-সঙ্গমে। ওখানে স্পীড বোট থাকবে আপনার অপেক্ষায়। এগারোটায় রেডি থাকবেন, পজিটিভলি। ওকে?'

'ওকে।'

একটা ভিজিটিং কার্ডের উল্টোপিঠে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে বাংলায় ঠিকানা লিখল রানা—জাহান্নাম।

এক নজর দেখে নিয়ে কার্ডটা পকেটে ফেলল গোলাম হায়দার।

'তাহলে এই ঠিকানাতেই পাঠিয়ে দেব আমার শোফারকে। গুড বাই।'

এগারো

এগারোটার মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে নিল রানা। কালো শেভ্রোলে গাড়ি এসে দাঁড়াল আবদুল হাইয়ের বাংলোর সামনে। ইউনিফরম পরা শোফার নেমে দাঁড়িয়ে পিছনের দরজা খুলে ধরল। বিসমিল্লা বলে উঠে পড়ল রানা গাড়িতে। পেটের মধ্যে সুড়সুড়ি জাতীয় একটা অনুভূতি হলো ওর কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। রানা জানে, এটা অজানার রোমাঞ্চ। অনিশ্চিত এখন ওর ভবিষ্যৎ। বাঘের খাঁচায় ঢুকতে চলেছে সে।

সেইলার্স ক্লাব ছাড়িয়ে ঝাড়া তিন মাইল গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় থামল কালো শেভ্রোলে। ঝকঝকে সুন্দর একটা স্পীড বোট দাঁড়িয়ে আছে তীরে, রানার অপেক্ষায়। সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় লাল আর সাদা পেইন্ট করা ছোট

বোটটা দেখতে চমৎকার লাগল রানার। মৃদুমন্দ ঢেউয়ে দুলছে সেটা। সানগ্লাস পরা একজন কালো লোক বসে আছে স্টিয়ারিং ধরে। রানা উঠে বসতেই সোজা ছুটল নোঙর ফেলা ইয়টের দিকে। একটিও বাক্য বিনিময় হলো না রানার ড্রাইভারের সঙ্গে। রানা চেয়ে রইল সুদৃশ্য ইয়টটার দিকে। সূর্যের আলোয় এক-আধটা ব্রাস ফিটিং ঝিক করে উঠছে। লক্ষ করল, ইয়টের পিছন দিকে বাঁধা রয়েছে আরেকটা স্পীড বোট।

রেলিং-এর ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে স্পীড বোটের দিকে চেয়ে ছিল তিনজন লোক। প্লেনের সিঁড়ির মত দেখতে অ্যালুমিনিয়াম সিঁড়ি নামিয়ে দিল ওরা নিচে। রানা ওপরে উঠে আসতেই স্যাল্যুট করল কোয়ার্টার-মাস্টার ও একজন স্টুয়ার্ড—তৃতীয় ব্যক্তিটি অদৃশ্য হয়ে গেছে তৎক্ষণে।

'এইদিকে চলুন, স্যার,' বিনীত কণ্ঠে বলল স্টুয়ার্ড। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সে রানাকে। এক ডেক ওপরে গিয়ে একটা দরজা খুলে ধরল। 'এইটাই আপনার সুইট, স্যার।'

দরজা দিয়ে ঢুকেই সিটিংরুম, তার ওপাশে বেডরুম এবং ড্রেসিংরুম। অ্যাটাচড বাথও আছে। সিটিং আর বেডরুম অত্যন্ত দামী আসবাবে সুসজ্জিত। এক নজরেই বোঝা যায়, এখানে নিজের বিলাসপ্রিয় মনটাকে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দিয়েছে গোলাম হায়দার। দুর্মূল্য, দুষ্প্রাপ্য সব বিলাস সামগ্রী যোগাড় করে সাজিয়েছে সে এই ইয়ট। কিন্তু কোথাও কুরুচির পরিচয় নেই। কোথাও আড়ম্বর নেই, হঠাৎ-আভিজাত্যের জগাখিচুড়ি নেই। ছিমছাম পরিচ্ছন্ন, অথচ সুন্দর। চমৎকার দুটো অয়েল পেইন্টিং ঝুলানো আছে বেডরুমে।

'জনাব গোলাম হায়দার নিজে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে পারছেন না বলে তিনি দুঃখিত। সাধারণত অতিথিদের তিনি নিজেই উপস্থিত থেকে অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু জরুরী কাজে আজ ওঁকে কক্সবাজার যেতে হয়েছে বলে ওঁর পক্ষে সেটা কিছুতেই সম্ভব হলো না। উনি আশা করেন, আপনি নিজগুণে এই ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন।'

আহা, বিনয়ের অবতার একেবারে!—ভাবল রানা। মুখে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে তো আজ শুধু শুধুই নষ্ট হলো দিনটা? কবে আসছেন উনি?'

'উনি আজই রাতে এসে পড়তে পারেন। ওঁর অনুপস্থিতিতে আপনার সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি হবে না। আসুন, স্যার, এই সুইটের ব্যবস্থাপনা সব বুঝিয়ে দিই আপনাকে।' দেয়ালের খাঁজ কাটা একটা জায়গায় হাত দিয়ে চাপ দিতেই কাঠের টুকরো সরে গেল একটা। 'এই যে বোতামগুলো দেখছেন প্রত্যেকটার ওপর লেখা দেখলেই বুঝতে পারবেন। যাকে ইচ্ছে ডাকতে পারেন: রুম সার্ভিস, নাপিত, বয়, শর্টহ্যান্ড-জানা সেক্রেটারি—যা চাই। বেডরুমে এর ডুপ্লিকেট বোতাম আছে।'

'চমৎকার।'

'শরীর মেসেজ দরকার হলে এই বোতাম—পুরুষ-নারী যে কোন রকম পেতে পারেন।' আরেকখানে একই উপায়ে চাপ দিতেই সরে গেল সামনের

কাঠ। 'আর এখানে আছে রেডিও, স্টিরিও টেপ-রেকর্ডার, রেডিও-টেলিফোন, আর ইন্টারনাল টেলিফোন। আর এই যে…'

ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল রানা, 'কতজন প্যাসেঞ্জার নেয়া যায় এই ইয়টে?'

'সেটা একেক অবস্থায় একেক রকম হতে পারে, স্যার।'

'যেমন?'

'যেমন, কোথায় এবং কতদূরে যাচ্ছি আমরা তার ওপর নির্ভর করবে প্যাসেঞ্জারের সংখ্যা।' রানা বুঝল স্পষ্ট কথা বলছে না লোকটা। বোকা-বোকা দেখালেও আসলে পাকা ঘোড়েল। চট্‌ করে অন্য কথায় চলে গেল স্টুয়ার্ড। 'আসুন, স্যার, বেডরুমে আরও কিছু কৌশল আছে। এই যে লিভারটা দেখতে পাচ্ছেন খাটের সাথে, এটা নিচু করে দিলেই দুলবে না খাট। সমুদ্র যত মাতামাতিই করুক নিশ্চিন্তে আরামে ঘুমাতে পারবেন।'

চট্‌ করে লোকটার মুখের দিকে চাইল রানা। তার মানে কি? সমুদ্রের কথা আসছে কেন? ইয়ট ছেড়ে দেবে নাকি আবার? ফুল-স্পীডে যদি চলতে আরম্ভ করে তাহলে প্লেন ছাড়া ঠেকাবার সাধ্য নেই একে কারও।

'আর এই যে এয়ার কন্ডিশনের বোতাম। এছাড়াও টার্কিশ বাথের ব্যবস্থা আছে এই ইয়টে, জিমনেশিয়াম আছে, ছবির গ্যালারি আছে, ডাক্তার আছে।' সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে বলে চলল লোকটা। 'আর এই যে বোতামটা দেখছেন, কিছুই লেখা নেই এতে। এটা টিপলে একজন হোস্টেস আসবে। দু'জন সী-হোস্টেস আছে আমাদের।'

'বাহ্‌! চমৎকার ব্যবস্থা!'

'অতিথির সব রকম প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রাখাই তাদের কাজ।'

'ক'টা থেকে ক'টার মধ্যে পাওয়া যাবে তাদের? মানে, ওয়ার্কিং আওয়ারটা কি?'

'দিনে-রাতে যখন খুশি ডাকতে পারেন আপনি তাদের। আপনার সেবা করতে পারলে ধন্য হয়ে যাবে তারা।'

'প্রায়ই অতিথি আসেন বোধহয় তোমাদের এখানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সেটা মালিকের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। আমি চলি, আপনি বিশ্রাম করুন, স্যার। যে-কোন সুখ-সুবিধা আদায় করে নিতে দ্বিধা করবেন না, স্যার। মনে করবেন, সবকিছু আপনারই জন্যে।'

'আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ।'

লোকটা বেরিয়ে যেতেই দরজা দিয়ে ঢুকল একজন লোক রানার সুটকেসটা হাতে নিয়ে। রানা আঁচ করল, এতক্ষণে ভিতরের জিনিসপত্র নিশ্চয়ই পরীক্ষা হয়ে গেছে একবার। আদেশের অপেক্ষা না রেখেই সুটকেস খুলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বের করে গুছিয়ে দিল লোকটা নিপুণ হাতে। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দরজা লাগিয়ে দিয়ে তিনটে ঘরই

ভাল করে পরীক্ষা করল রানা। কোন স্পাইহোল বা মাইক্রোফোন পাওয়া গেল না। খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ড্রেসিংরূমে জামা-কাপড় খুলে রেখে বাথরূমে গিয়ে ঢুকল সে। অল্প খোঁজাখুঁজির পরই পিস্তলটা লুকিয়ে রাখার একটা জায়গা পেয়ে গেল সে। ভেন্টিলেটার গ্রিলটা তুলে ফেলতেই খানিকটা গর্ত পাওয়া গেল, যন্ত্রটা লুকিয়ে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট। হোলস্টারসুদ্ধ ওর একান্ত প্রিয় অটোমেটিক ডাবল অ্যাকশন ওয়ালথার পি. পি. কে. রেখে দিল সে গর্তটার মধ্যে, তারপর নামিয়ে দিল গ্রিলটা। এইবার ঠাণ্ডা পানিতে তৃপ্তির সঙ্গে স্নান সেরে নিল রানা। দেহের সমস্ত বাড়তি উত্তাপ চলে যেতেই অপূর্ব এক স্নিগ্ধতায় ভরে গেল ওর মন। সাবানটা অর্ধেক ক্ষয় করে ফেলল সে গায়ে মেখে। বাথ-রোব জড়িয়ে পরিতৃপ্ত রানা ফিরে এল বেডরূমে। এয়ার-কন্ডিশনটা চালু করে দিয়েই রূম-সার্ভিসে টেলিফোন করে একটা ডাবল মার্টিনি আনতে বলল। এছাড়া সারাদিন কি করবে সে? হাজার অনুরোধ করলেও যে ওকে শহরে ফিরে যাবার অনুমতি দেয়া হবে না তা ওর ভাল করেই জানা আছে। কাজেই সময় কাটাবার এছাড়া উপায় কি?

এসে গেল মার্টিনি। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ঘরটা ইতিমধ্যেই। আরাম করে একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বসল রানা। সারা দেহে শিরশিরে একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পরস্পর জড়িয়ে থাকা ভেজা লোমগুলো একে অপরের কাছ থেকে মুক্ত করছে নিজেকে। ঘুম ঘুম একটা আলস্য ভর করতে চাইছে ওর দেহ মনে। ছোট ছোট চুমুকে আধ-ঘণ্টা ধরে উপভোগ করল রানা তরল পদার্থটুকু। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। জামা-কাপড় পরে নিয়ে বেরিয়ে এল সে ঘর থেকে। বেরিয়েই দেখল পনেরো গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে স্টুয়ার্ড। পাহারা দিচ্ছে নাকি ওকে? এত প্রকট ভাবে?

'দুই ডেক নিচেই আমাদের বার। লাঞ্চের আগে যদি কিছু ড্রিঙ্ক করতে চান তাহলে যেতে পারেন, স্যার। এই যে লিফট এইখানটায়।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।' কঠোর কণ্ঠে ধন্যবাদ জানিয়ে লিফটের দিকে এগোল রানা।

সরু অপ্রশস্ত লিফট। ঠেসে-ঠুসে তিনজন দাঁড়ানো যায়। নিচে নেমে কাউকে দেখতে না পেয়ে একটু বিস্মিত হলো রানা। লিফট থেকে বেরোতেই ওপরে উঠে গেল সেটা। এগিয়ে গেল রানা সামনে। বড়সড় গোল একটা ঘর। চমৎকার করে সাজানো। ধবধবে সাদা দেয়াল, তিন ফিট উঁচুতে চার ইঞ্চি চওড়া নীল বর্ডার সারাটা ঘরে, এক পাশে চিতাবাঘের চামড়ায় ঢাকা একটা ডিভান, দু'পাশে তেপায়ার ওপর প্রকাণ্ড দুটো ফ্লাওয়ার-ভাসে প্লাস্টিকের ফুল, কয়েকটা নরম গদি আঁটা আরামচেয়ার, আর মিষ্টি সবুজ আলো। মিষ্টি একটা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুর ভেসে আসছে আবছা ভাবে। বার আছে, কিন্তু বারম্যান নেই। কেউ নেই ঘরের ভিতর।

মৃদু হেসে এগিয়ে গিয়ে নিজেই খানিকটা মার্টিনি ঢেলে নিল সে, কাগজি লেবুর খানিকটা চামড়া কেটে নিয়ে চিমটি দিল তার ওপর, তারপর ফেলল

টুকরোটা গ্লাসের ভিতর। আশপাশে কাউকে দেখতে না পেয়ে নিজেরই স্বাস্থ্য কামনা করে খেলো এক ঢোক।

হঠাৎ চমকে উঠল রানা। একটা ফর্সা হাত উপরে উঠল উল্টোদিকে ফিরানো একখানা আরম-চেয়ারের ওপাশ থেকে। ধীরে ধীরে আরেকটা হাত উঠে ধরল সেই হাতটা। আড়মোড়া ভাঙল যেন কেউ। হাত দুটো অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার ধীরে ধীরে দেখা গেল একটি স্ত্রীলোকের মাথা, কাঁধ। সোজা হয়ে বসল সে আরমচেয়ারে, তারপর পিছন ফিরে চাইল রানার দিকে স্থির ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে। রুমানা!

বারো

'তুমি? তুমি এখানে কেন?' প্রশ্ন করল রুমানা। অস্পষ্ট ফ্যাশফেঁশে ওর কণ্ঠস্বর।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রুমানা। বিস্ময় ফুটে উঠল ওর ভ্রমর কালো সুন্দর দুই চোখে। সুন্দরী সন্দেহ নেই, কিন্তু কতখানি সুন্দরী, এই প্রথম পুরোপুরি উপলব্ধি করল রানা: নাক, চোখ, কপাল, ঠোঁট, থুতনি শিল্পীর সমস্ত প্রেম আর আবেগ ঢেলে বহু যত্নে টিপেটিপে তৈরি করা প্রতিমার মত। মেয়ে তো নয়, সোনালী স্বপ্ন যেন একটা—ভাবল রানা। সুন্দর গলাটা নেমে এসে মিলিয়ে গেছে চমৎকার একটা কাঁধে। সরু দুটো শোলডার স্ট্র্যাপ ছাড়া কাঁধটা খোলা। গোলাপী রঙের একটা ইভনিং ড্রেস পরেছে রুমানা।

'বলো, কেন তুমি এখানে?' চিৎকার করে উঠল রুমানা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে। সোনালী স্বপ্ন ভেঙে গেল রানার। 'অ্যাই, ভদ্দরলোক! জবাব দিচ্ছ না কেন? বোবা নাকি তুমি? কে তোমাকে আসতে দিয়েছে আমার বারে?' দু'পা এগিয়েই হঠাৎ মেঝে থেকে একটা বোতল তুলে ছুঁড়ে মারল সে রানার দিকে। চট্ করে মাথা নিচু করল রানা। পিছনের একটা র‍্যাকে গিয়ে লাগতেই ঝন্ ঝন্ শব্দে ভেঙে গেল কয়েকটা মদের বোতল।

'অ্যাই, বদমাইশ! মরবার আর জায়গা পাওনি? কে পাঠিয়েছে তোমাকে এখানে?'

'দেখুন...' কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা। ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল রুমানা।

'বেরোও, বেরোও বলছি! কাউকে চাই না আমি। কোন কথা শুনতে চাই না। একা থাকব। গোলাম হায়দার যদি তোমাকে পাঠিয়ে থাকে তাহলে ওকে জাহান্নামে যেতে বলো গে যাও। কাউকে পরোয়া করি না আমি আর।'

'আপনি হঠাৎ একি...'

আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কয়েক পা এগিয়েই হঠাৎ ঘুরল রুমানা। সোজা গিয়ে দাঁড়াল লিফটের দরজার সামনে। দমাদম পিটাল সে দরজাটা কিছুক্ষণ।

অনর্গল গালি বকে যাচ্ছে সে দুর্বোধ্য এক ভাষায়। খুব সম্ভব এগুলো বর্ষণ হচ্ছে স্টুয়ার্ডের উদ্দেশে। কড়া নাড়ল সে কিছুক্ষণ মুখ চালাতে চালাতে। কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না উপর থেকে। বোঝা গেল, প্রাণে ভয়-ডর আছে স্টুয়ার্ডের।

আবার ঘুরল রুমানা। সোজা এসে দাঁড়াল রানার থেকে ছয় ইঞ্চি দূরে। যেন পরীক্ষা করছে সে রানার মুখটা। জিভ দিয়ে নিচের ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিল সে একবার, তারপর কামড়ে ধরল ঠোঁট।

'তুমি ঢাকার সেই স্মার্ট, হ্যান্ডসাম জুয়াড়ী না? কি যেন নাম তোমার?'

'মাসুদ রানা। আমি দুঃখিত। এঘরে আর কেউ আছে আমি জানতাম না।'

'আর কেউ? আর কেউ মানে? তুমি জানো না এটা আমার বার? জানো না আমার অনুমতি ছাড়া গোলাম হায়দারেরও ক্ষমতা নেই এ ঘরে ঢোকার?'

'না। আমার জানা ছিল না কথাটা।'

'তাহলে জেনে রাখো। আর এ-ও জেনে রাখো, বিচ্ছিরি সব টেডি ছুঁড়িদের নিয়ে যতই ঘুরুক, ফিরে আসতে হবে ওকে আমার কাছে। কাঁদতে হবে ওকে আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে। যাক, আমার জন্যে একগ্লাস বানাও; হ্যাঁ, হুইস্কি।'

একটা গ্লাসে ব্ল্যাক লেবেল স্কচ আর সোডা ঢেলে এগিয়ে দিল রানা মেয়েটির দিকে। ঢক্‌ঢক্ করে মদটুকু নিঃশেষ করে নামিয়ে রাখল সে গ্লাসটা। সোনালী চুলের মধ্যে দিয়ে আঙুল চালিয়ে দিল একবার। তারপর বলল, 'এখানে কি করতে এসেছ তুমি?'

'চিটাগাং এসেছিলাম একটু ব্যবসার কাজে। গোলাম হায়দারের সাথে দেখা হয়ে যাওয়ায় নিমন্ত্রণ করে বসল। বলল, হাত দেখে দেবে। কিন্তু এখানে পৌঁছে শুনছি সে নাকি কক্সবাজার গিয়েছে, আজ আসতে পারবে না।'

'নিশ্চয়ই ওই ছুঁড়িকে নিয়ে গেছে। তা যাক, কিন্তু তোমার তো এখানে আসা উচিত হয়নি, মাসুদ রানা। নিমন্ত্রণ করল আর তুমি সরল বিশ্বাসে চলে এলে? তুমি বোকা নাকি একটা? যাক, এসেই যখন পড়েছ তখন আরেক গ্লাস বানাও আমার জন্যে। আছ ক'দিন এখানে?'

'সাতদিন।' আবার একগ্লাস হুইস্কি তৈরি করতে আরম্ভ করল রানা। 'কিন্তু মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না? অনেকক্ষণ ধরেই খাচ্ছ মনে হচ্ছে?'

হাসি ফুটে উঠল রুমানার ঠোঁটে। বিচিত্র এক জগৎ দেখতে পেল রানা সে হাসিতে। চুম্বক আছে মেয়েটির মধ্যে। এর অমোঘ আকর্ষণ উপেক্ষা করা অতি বড় সংযমীর পক্ষেও অসম্ভব।

'পৃথিবীতে এক-আধজনের মাত্রা-জ্ঞান একটু কম থাকাই তো ভাল। তাতে অনেকে অনেক রকমের সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে। সবে তো মাত্র দু'বোতল হয়েছে, আরও অন্তত তিন বোতল তো লাগবেই। উহ্! অসহ্য!' হঠাৎ খেপে উঠল সে মিষ্টি বাজনাটার ওপর। 'প্যানর প্যানর আর ভাল লাগে

না। জ্যায চাই, হৈ-চৈ, হট্টগোল।' কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটা বোতাম টিপতেই বন্ধ হয়ে গেল বাজনা। ফিরে এসে রানার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে ঢক ঢক করে সবটুকু তিন ঢোকে শেষ করল রুমানা। তারপর বলল, 'চলো, তোমাকে পাতালে নিয়ে যাব। ওই যে সাদা বোতামটা দেখা যাচ্ছে, টিপে দাও ওটা।'

বোতাম টিপতেই সড়াৎ করে একটুকরো ছয়ফুট বাই চারফুট কাঠের প্যানেল সরে গেল একপাশে। প্লেট-গ্লাসের জানালা দেখা গেল একটা। সী-লেভেল থেকে বারো ফুট নিচে। প্রখর সূর্যের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বেশ অনেক দূর পর্যন্ত। একটা মাছ কাঁচের গায়ে নাক ঘষতে ঘষতে ওপরে চলে গেল। সত্যিই, রূপকথার অদ্ভুত সেই পাতালপুরীতে নেমে গিয়েছে যেন রানা।

খিলখিল করে হেসে উঠল রুমানা, 'অবাক হয়ে গিয়েছ, না? গভীর সমুদ্রে যখন থাকি তখন রাতের বেলায় অদ্ভুত এক জগৎ দেখতে পাই আমরা এই জানালা দিয়ে। বিনে পয়সার টেলিভিশন। বাতি জ্বেলে দিলেই কৌতূহলী জায়ান্ট স্কুইড, প্রকাণ্ড স্টিং-রে, মান্টা-রে, হাঙর, ব্যারাকুডা আরও কত কি জীবজন্তু এসে হাজির হয়। আধহাত তফাতে দাঁড়িয়ে এইসব জীবজন্তু দেখতে পছন্দ করে গোলাম হায়দার। আর তখন আমি নাচি।'

হঠাৎ আড়মোড়া ভেঙে নাচের ভঙ্গিমায় দুইহাত ছড়িয়ে রানার দিকে চাইল রুমানা। বলল, 'স্টেরিওটা চালিয়ে দাও, নাচব আমি!'

গোপন স্পীকার থেকে ভেসে এল উদ্দাম জ্যায। ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল রুমানা। জুতো জোড়া ছুঁড়ে দিল একটা চেয়ারের দিকে, তারপর আরম্ভ করল স্লেভ ডান্স। সারা জগৎটা যেন দুলতে আরম্ভ করল রানার চোখের সামনে।

'আরও জোরে!' চিৎকার করে উঠল রুমানা। অর্ধ নিমীলিত ওর চোখ। ভলিউম বাড়িয়ে দিল রানা। সারা ঘর ভরে গেল ড্রামের প্রচণ্ড শব্দে। লয় বাড়ছে ক্রমে ক্রমে, সেই সঙ্গে বাড়ছে উদ্দাম স্টেপিং। সামনের দিকে খানিকটা ভাঁজ হয়ে গিয়েছে হাঁটু। পেটের পেশীগুলো একবার সামনে যাচ্ছে, একবার পিছনে।

'আরও!' আরও বাড়াল রানা ভলিউম। কানে তালা লাগার যোগাড়।

চোখ বন্ধ করে নাচছে এখন রুমানা। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে আছে। ঘাম দেখা দিল ওর কপালে। মাথাটা হেলে আছে পিছন দিকে। ক্ল্যারিওনেটের এক একটা লম্বা টানে রক্ত উঠে আসতে চাইছে রানার মাথায়।

রানা বুঝল, এইবার অ্যালকোহলে ধরেছে ওকে। তাল রাখতে পারছে না সে আর বাজনার সঙ্গে। দুই হাত মাথার উপর তুলে নাচছে সে এখন, দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে, বেতালা পা পড়তে আরম্ভ করেছে ওর। টলছে দেহটা। ঝোঁক সামলাতে না পেরে হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল সে সামনের দিকে।

হাত ধরে তুলে দাঁড় করাল ওকে রানা। মাথাটা ঝুঁকে আছে নিচের

দিকে। শুইয়ে দিল সে ওকে ডিভানের উপর। চুপচাপ পড়ে রইল রুমানা। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

রানা বুঝল, এখানে জমবে না। ঘড়ি দেখল—ঠিক বারোটা বাজে। লিফটের দিকে ঘুরতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

হঠাৎ চোখ পড়েছে কাঁচের জানালাটার দিকে। কি ব্যাপার! লাল হয়ে গেছে কেন পানি? দীর্ঘ পদক্ষেপে কাছে এসে দাঁড়াল রানা। দেখল লালচে পানিতে হুটোপুটি খাচ্ছে তিনটে প্রকাণ্ড হাঙর। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে এদিক থেকে ওদিক আর ওদিক থেকে এদিক ছুটোছুটি করছে ওরা। অত্যন্ত সুস্বাদু কোন খাবারের গন্ধ পেয়েছে যেন ওরা।

ঝিক্ করে বিদ্যুৎ চমকে উঠল যেন রানার মনের মধ্যে এক মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে আবদুল হাইয়ের মৃত্যু-রহস্য। যেন কোনও ফ্রগম্যান পানির নিচ দিয়ে গোপনে ইয়টের কাছে আসতে না পারে সেজন্যে এই সহজ এবং ভয়ঙ্কর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেছে গোলাম হায়দার। কিছুক্ষণ পরপর ইয়ট থেকে রক্তের গুঁড়ো স্প্রে করা হচ্ছে পানিতে। ফলে প্রতিমুহূর্তে ঘিরে রেখেছে এটাকে একদল হাঙর। রক্তের নেশায় পাগল হয়ে আছে ভয়াল জন্তুগুলো। এই হাঙরের হাতেই মারা গেছে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের আবদুল হাই।

কিন্তু কেন এই সাবধানতা? কি এমন গোপন জিনিস আছে এই ইয়টে? জানতেই হবে ওকে সেটা।

তেরো

পরদিন সকাল সাতটায় ঘুম ভাঙল রানার। আড়মোড়া ভেঙে প্রকাণ্ড এক হাই তুলল সে। দমটা ছাড়ার সময় কুকুরের কান্নার মত বিকট আওয়াজ বেরোল ওর মুখ দিয়ে। নিজেই হেসে ফেলল রানা বিচিত্র শব্দটা শুনে। পাশ ফিরে একটা বালিশ টেনে নিল।

কাল বেড়াবার ছলে ইয়টের অনেকখানি দেখে নিয়েছে সে। সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়েনি ওর। ঠিক ছ'টার সময় আশপাশের পানি লাল হয়ে উঠেছিল আবার। আন্দাজ করে নিয়েছে, রানা, প্রতি ছ'ঘণ্টা পর পর এই ব্লাড-পাউডার ছড়ানো হয় পানিতে, হয়তো কোন যন্ত্রের সাহায্যে। আশ্চর্য উপায়ে প্রাকৃতিক শক্তিকে ব্যবহার করছে গোলাম হায়দার নিজের কাজে।

রুমানার ঘরে আর যায়নি সে কাল। দুপুরের সেই মাতলামি কাটিয়ে উঠে প্রকৃতিস্থ হবার পর কয়েকবার ফোন করে ডেকেছিল রুমানা বিকেলে, সন্ধ্যায়, রাতে। নানান ছুতো দেখিয়ে এড়িয়ে গেছে রানা। দু'জন হোস্টেসের একজন যে রুমানা নয় এটা বুঝে নিয়েছে সে। আলাদা দু'জন ড্যানিশ যুবতী

আছে ইয়টে। রুমানা খুব সম্ভব গোলাম হায়দারের উপপত্নী গোছের কিছু একটা হবে। প্রচণ্ড এক বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে এই অ্যাংলো-ঈজিপশিয়ান মেয়েটির মধ্যে গোলাম হায়দারের অন্য নারীতে আসক্তি দেখে। এই বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে কিছু তথ্য বের করতে হবে ওর কাছ থেকে।

বিকেলে ফোর এবং অ্যাফট্ ডেকে ঘণ্টা দু'য়েক কাটিয়ে ঘরে ঢুকেই একটা কথা মনে পড়ায় ছুটে গিয়েছিল রানা বাথরুমে। ভেন্টিলেটার গ্রিলটা তুলে ভেতরে হাত দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়েছিল সে। আছে। কিন্তু কি ভেবে হোলস্টারটা বের করে এনেই বোকা হয়ে গিয়েছিল। ভিতরের বস্তুটি নেই, খোয়া গেছে।

আবার একবার আড়মোড়া ভেঙে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল রানা। একেবারে স্নান সেরে বেরোল সে বাইরে। দরজায় টোকা পড়ল। বাথ-রোব পরে খুলে দিল সে দরজাটা। ঘরে ঢুকল স্টুয়ার্ড।

'আপনার নাস্তা আফটার ডেকে দেয়া হবে, স্যার। জনাব গোলাম হায়দার অপেক্ষা করছেন সেখানে আপনার জন্যে।'

'আচ্ছা! গোলাম হায়দার এসে গেছেন তাহলে?'

'জ্বি।'

'ঠিক আছে। আমি আসছি।'

তিন মিনিটেই তৈরি হয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল রানা ঘর থেকে। দূর থেকেই দেখতে পেল খাওয়া শুরু করে দিয়েছে গোলাম হায়দার। একটা কম্প্যানিয়ন-ওয়ে পেরিয়ে অর্ধবৃত্তাকার একটা বারান্দায় চেয়ার-টেবিল পাতা। রানাকে দেখে সৌজন্যের আতিশয্যে উঠে দাঁড়াল গোলাম হায়দার।

'আসুন, মিস্টার মাসুদ রানা। একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ায় কাল আসতে পারিনি। নিন বসুন।'

টেবিলের দিকে চেয়েই এক মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল রানার চোখ। টেবিলের ওপর পড়ে আছে রানার ওয়ালথার পি. পি. কে.। মুখের ভাব পরিবর্তন হলো না রানার একবিন্দুও। ধন্যবাদ জানিয়ে বসে পড়ল একটা চেয়ারে।

'কোন কষ্ট হয়নি তো ইয়টে?' রানার 'না' বলবার আগেই বলল, 'বলেছিলাম না, আনন্দেই কাটবে আপনার সাতটা দিন।'

স্টুয়ার্ড কাছে ঘেঁষে দাঁড়াতেই অর্ডার দিল রানা অ্যাপল জুস, বাটার টোস্ট, ডিম পোচ, কলা আর চা।

'আপনি কিসের ব্যবসা করেন, মিস্টার মাসুদ রানা?'

'ব্যবসাটা আমি করি না, করে আমার কোম্পানি। ইমপোর্ট, এক্সপোর্ট, ইনডেনটিং। আমি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। "অলরাউন্ড ট্রেডার্স লিমিটেড" আমাদের কোম্পানির নাম।'

অল্পদিন হলো জানাজানির ভয়ে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং করপোরেশন নামটা বদলে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের বাহ্যিক নাম রাখা হয়েছে

অলরাউন্ড ট্রেডার্স লিমিটেড।'

'কিসের ইনডেন্ট করেন?'

'ট্রাক, ক্রেন, বুলডোজার, রোলার, ট্রাকটার, ড্রিলিং রিগ—নানান রকম আইটেম।'

এই প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হয়ে গেল। নাস্তা খেতে খেতে রানাকে পিস্তলটার দিকে চাইতে দেখে মুচকি হেসে গোলাম হায়দার বলল, 'এটা একটা খেলনা পিস্তল। শুনলাম আপনার ঘরে পাওয়া গেছে। কোন-অতিথি হয়তো ফেলে গেছে ভুলে। ভাবলাম আপনারও হতে পারে। কিন্তু ব্যবসার কাজে তো এ জিনিস দরকার হয় না, তাই সন্দেহ হচ্ছে অন্য কারও হবে হয়তো। আপনার তো নয় এটা, তাই না?' পাপড়িবিহীন নষ্ট চোখটা ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানার মুখের দিকে।

'জিনিসটা আমারই। মাঝে মাঝেই টাকা-পয়সা নিয়ে চলাফেরা করতে হয়; তাই সঙ্গে রাখি আমি পিস্তলটা।'

'ও, তাই বলুন।' পিস্তলটা এগিয়ে দিল গোলাম হায়দার। 'তাহলে আপনারই জিনিস। ওর কলকজা কিছুই বুঝি না আমি। চেষ্টা করেও একটা গুলি ফুটাতে পারলাম না। মনে করুন, ওই সী-গালটা আপনার টাকা কেড়ে নিতে চায়—দেখি তো লাগাতে পারেন কিনা?'

বিশ গজ ওপরে একটা খুঁটির মাথায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে একটা সীগাল্। রানা একবার চাইল ওরটার দিকে। মৃদু হাসল। অতি সহজ টার্গেট। পিস্তলটা তুলল সে। কিন্তু ট্রিগার চাপতেই বসে গেল সেটা নিচু হয়ে—গুলি বেরোল না।

ভেঙে দিয়েছে গোলাম হায়দার। দ্রুত একবার পরীক্ষা করেই বুঝল রানা এক্সপার্টের হাতের কাজ। টরশন পিনগুলো ভেঙে দেয়া হয়েছে। ম্যাগাজিন ও চেম্বারে গুলি আছে, কিন্তু ট্রিগার আর হ্যামার সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যাওয়ায় কারখানা থেকে ঠিক না করালে একটি গুলিও বেরোবে না আর ওই পিস্তল থেকে। রানা চেয়ে দেখল নিঃশব্দে হাসছে গোলাম হায়দার।

'ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে নষ্ট করে ফেলিনি তো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'নষ্টই করে ফেলেছেন,' মৃদু হাসল রানা। 'কিন্তু তাতে এত লজ্জা পাওয়ার কিছুই নেই, স্পেয়ার আরেকটা আছে আমার কাছে। যাক্, এখন জ্যোতিষ-বিদ্যা নিয়ে আলাপ করা যাক, হাতটা দেখবেন নাকি?'

'আজ আর হাত দেখব না। আমার ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা ফেলে এসেছি। কাল সকাল থেকে শুরু হবে আমার স্টাডি। ভেতর ভেতর স্টাডি অবশ্য আরম্ভ হয়ে গেছে আগেই। যতই দেখছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। নামটাই ধরুন না কেন। মাসুদ এর ভাইব্রেশন ৪১৩৬৪ বের করলে দেখা যায় বেরোচ্ছে ১৮: আঠারো মানে ১ আর ৮, অর্থাৎ ৯; রানার ভাইব্রেশন ২১৫১—তার মানে ৯। এখন মাসুদ রানা যোগ দেন। ৯ আর ৯ হচ্ছে ১৮, আর আঠারো মানেই ৯। মেষ এর নাম্বার নাইন পারসন আপনি, আপনার

পক্ষে নামটা কি পরিমাণ জাস্টিফায়েড হয়েছে কল্পনা করুন। আর আমি হচ্ছি কর্কট রাশির মানুষ। ফার্স্ট হাউস অফ ওয়াটার ট্রিপলিসিটি। আমিও ইনডেস্ট্রাক্‌টিব্‌ল্‌। চোখের পাপড়ি তুলে নিয়ে একটা চোখ নষ্ট করে দিয়েছে—গলায় রশি বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে গাছের ডালে—তবু বেঁচে আছি, এবং থাকবও। একটা মস্ত ফাঁড়া আছে সামনে, কাটিয়ে উঠতে পারলে চুরাশি বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচব আমি।'

'কারা অত্যাচার করেছিল আপনার ওপর?'

'সে অনেক কথা। পরে বলব একসময়। বারবার চোখ আর গলার দিকে চাইছেন বলেই আভাসটা দিয়ে রাখলাম। জীবনে বহু বিচিত্র ঘটনা আর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সব রকমের প্রতিবন্ধকতা চুরমার করে ভেঙে গুঁড়িয়ে উঠতে হয়েছে আমাকে ওপরে।'

এমনি সময়ে ডেকের উপর এসে হাজির হলো পনেরো-ষোলো বছর বয়সের একটা টেডি মেয়ে। খুব সম্ভব ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। বড়লোকের বখে যাওয়া মেয়ে। রানা বুঝল এই মেয়েটির কথা বলতে গিয়েই হিংসায় জ্বলে উঠেছিল রুমানার চোখ।

'এসো, নাজনীন। পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং করপোরেশন, থুড়ি, অলরাউন্ড ট্রেডার্স লিমিটেডের ম্যানেজার মি. মাসুদ রানা। আর এ হচ্ছে আমার বান্ধবী, নাজনীন লায়লা।'

মিষ্টি করে কৃত্রিম হাসি হাসল নাজনীন। রানাও দাঁত বের করল একটু। একটা চেয়ারে বসে পড়ল নাজনীন গোলাম হায়দারের গা ঘেঁষে। নানান ধরনের হালকা আলাপ চলল বেশ কিছুক্ষণ।

রানা বিশেষ ভাবে লক্ষ করল নাজনীনকে। কার মেয়ে কে জানে। অতিরিক্ত স্মার্টনেস, নির্ভুল ইংরেজি উচ্চারণ আর ইংরেজি ছবির অনুকরণে আলট্রা মডার্ন হলেও মেয়েটি যে একেবারে ছেলেমানুষ তা এক নজরেই বোঝা যায়। জীবনের কঠোর দিকটা সম্পর্কে কিচ্ছু অভিজ্ঞতা নেই। গোলাম হায়দারের পয়সায় মদ খেয়ে, জুয়া খেলে, নিজেকে মহা ভাগ্যবতী মনে করছে সে।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল নাজনীন। 'দেখো, দেখো, হায়দার। কী অদ্ভুত একটা মাছ!'

সবাই ফিরে চাইল পানির দিকে। টর্পেডোর মত কি যেন একটা তীর বেগে ছুটে আসছে ইয়টের দিকে। স্পীড বোটের মত ঢেউ উঠে গেছে দুই পাশে। একটু কাছে আসতেই রানা দেখল, আসলে সাঁতার কেটে এগিয়ে আসছে একজন লোক। অসম্ভব দ্রুত গতিতে আসছে লোকটা। হাঙরের কথা মনে হতেই চমকে উঠল রানা ভিতর ভিতর।

'ও কিছু নয়,' বলল গোলাম হায়দার। 'আমাদের লোবাক। সাঁতারে ওর জুড়ি নেই পৃথিবীতে।'

ইয়টের গা থেকে নামানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল লোবাক উপরে। উঠেই

গা ঝাড়া দিল কুকুরের মত। হাতের ইশারায় ওকে ডাকল গোলাম হায়দার। এল সে সামনে।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল রানার। নাজনীনেরও নিশ্চয়ই একই দশা হলো, কিন্তু সেটা দেখার সুযোগ পেল না রানা। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে সে লোবাকের হাত ও পায়ের দিকে। অবিশ্বাস্য রকমের বড় বড় হাত-পা। হাতের তালুটাই হবে দশ বাই সাত ইঞ্চি—তার ওপর রয়েছে বিরাট বিরাট আঙুল। এলিফ্যান্টিয়াসিস! আশ্চর্য! রানার সমান লম্বা আর রানার দ্বিগুণ চওড়া—কিন্তু হাত-পা দেখলে মনে হয় বিশাল এক মূর্তির হাত-পা দেখছি।

'খুব আশ্চর্য হয়ে গেছেন, তাই না?' বলল গোলাম হায়দার, 'এ রকমের অঙ্গ-বৈকল্য অতি অসাধারণ। দুর্লভ একটা দর্শনীয় বস্তু ও আমার। চীন দেশে গিয়ে বসতি করে খিরগিজ-আমা বলে খিরগিজের এক যাযাবর সম্প্রদায়—তারাই প্রথম আবিষ্কার করে এই রকম আশ্চর্য অঙ্গ-বৈকল্যের উপায়। এখন অবশ্য আইন করে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এমন কাজ।'

'তার মানে ওকে ইচ্ছে করে এমন করা হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই! ও এক অদ্ভুত সৃষ্টি। প্রচণ্ড শক্তি আছে ওর হাত-পায়ে। ওকে সাঁতার প্র্যাকটিস করাচ্ছি আমি। সমস্ত ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ব্রেক করে দিয়ে রাতারাতি পৃথিবী-বিখ্যাত করে দেব ওকে আমি একদিন।'

কানে কানে কি যেন বলল ওকে গোলাম হায়দার। নিঃশব্দ এক ভয়ঙ্কর হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। চলে গেল সে নিচে। রানা লক্ষ করল একবিন্দু পানিও লেগে নেই লোবাকের গায়ে। প্লাস্টিকের জাঙ্গিয়া পরে আছে সে। সারা গায়ে তেলতেলে কি যেন মাখা। আন্দাজ করল রানা—শার্ক রিপেল্যান্ট লোশন মেখে নেমেছিল লোবাক পানিতে।

'কিন্তু কি করে এমন দানব তৈরি করা সম্ভব···আর কেনই বা একটা মানুষের হাত-পা···?'

'খিরগিজ-আমা সম্প্রদায় সে রহস্যের চাবিকাঠি দেয়নি আমাকে। আর কাজটা কঠিনও খুব। বিশেষজ্ঞ ছাড়া অসম্ভব। পিটুইটারী গ্ল্যান্ডটাকে বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় উত্তেজিত করে বড় করে তোলা হয় প্রথমে। ফলে জাইগ্যান্টিজম্ বলে একরকম রোগের উৎপত্তি হয়। দৈত্যাকার হয়ে যায় সাধারণ মানুষ। ক্রমাগত বাড়তে থাকে। কিন্তু স্রেফ দানবাকার হলে ততখানি ভয়ঙ্কর দেখায় না, তাই এরা প্রক্রিয়াটাকে আরও একটু উন্নত করে দেহের লম্বা হাড়গুলো শক্ত না হওয়া পর্যন্ত গ্ল্যান্ডটাকে বেশি না ঘাটিয়ে অ্যাকরোমেগলি স্টেজ-এ নিয়ে আসে। এরই ফলে প্রকাণ্ড হাত-পা বিশিষ্ট দানবের সৃষ্টি হয়। অসম্ভব শক্তি থাকে এদের দৈত্যাকার অঙ্গে। তিন ইঞ্চি ডায়ামিটারের লোহার রড অক্লেশে বাঁকিয়ে ফেলতে দেখেছি আমি লোবাককে। একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে রাখা দশটা মহিষের শুকনো চামড়া কাগজের মত ফড়ফড় করে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে দেখেছি। অমূল্য সম্পদ ও আমার। এই যে রুমানার কুকুর এসে গেছে।'

প্রকাণ্ড একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুরকে নিয়ে এল লোবাক, চেন ধরে। গোলাম হায়দারকে চিনতে পেরে গম্ভীর গলায় ঘেউ ঘেউ করে উঠল কুকুরটা। নিকৃষ্ট জীব—মনের ভাব গোপন রাখতে পারে না। রানা বুঝল যে কারণেই হোক, পছন্দ করে না সে গোলাম হায়দারকে। হঠাৎ রানা বুঝতে পারল ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে চলেছে। মাথা ঝাঁকাল গোলাম হায়দার লোবাকের দিকে চেয়ে।

দুই হাতে অ্যালসেশিয়ানের মাথাটা ধরে চাপ দিল লোবাক। ছট্‌ফট্‌ করে উঠল কুকুরটা। পর মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল। মড়মড় করে মাথার হাড় ভাঙার বিশ্রী শব্দ শুনতে পেল রানা। শিউরে উঠল সে। যা খেয়েছিল সব ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল মুখ দিয়ে। টপটপ করে কয়েক ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ল ডেকের ওপর। পিছিয়ে গেল রানা এক পা।

এবার একে একে চারটে পা ছিঁড়ে ফেলে দিল লোবাক পানিতে। মহা আন্দোলন শুরু হলো পানির মধ্যে। দেহটাও ছুঁড়ে ফেলল সে পানিতে। আঙুলের রক্তগুলো চেটে খেয়ে নিল। বীভৎস দৃশ্য।

রানার মুখের ভাব লক্ষ করছিল গোলাম হায়দার। হঠাৎ হেসে উঠল সে উচ্চকণ্ঠে।

'কুকুরটা পছন্দ করত না আমাকে। তেড়ে এসেছিল সেদিন কামড় দিতে। তাই এই পরিণতি।'

চলে গেল গোলাম হায়দার ওর কেবিনে নাজনীনকে একহাতে জড়িয়ে ধরে।

চোদ্দ

চলে গেল গোলাম হায়দার স্পীড বোটে করে নাজনীনকে একহাতে জড়িয়ে ধরে।

এইবার! এইবার নামবে রানা নিচে!

ঘর থেকে বেরিয়ে চারপাশে কাউকে দেখতে পেল না রানা। জিমনেশিয়াম আর সুইমিং পুলের পাশ দিয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল সে গোলাম হায়দারের কেবিনের দিকে। একটা লোহার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রানা। সাবধানে এগোল সে। গোলাম হায়দারের কেবিনে চাবি দেয়া। পাতলা চারকোনা একটা সেলুলয়েডের টুকরো বের করল সে পকেট থেকে। দশ সেকেন্ডের মধ্যেই ভিতর থেকে বল্টু তুলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল গোলাম হায়দারের কেবিনের মধ্যে।

বড়সড় ঘরটা। সাদা চাইনিজ কার্পেট বিছানো। ফোম রাবারের সোফা, আর কয়েকটা হোয়াইট লেদারের চেয়ার, কয়েকটা পেইন্টিং ঝুলছে। তন্নতন্ন

করে খুঁজেও কিছু পাওয়া গেল না সিটিং-রুমে। এবার বেডরুমে চলে এল রানা। লাইট জ্বালতে সাহস হচ্ছে না, হাতের পেন্সিল-টর্চটা ব্যবহার করতে হচ্ছে ওকে। যে কোন মুহূর্তে কেউ এসে পড়তে পারে, তাই দ্রুত কাজ সারতে হবে ওকে। কিছু একটা পাবেই সে এই ঘরে, কিন্তু কোথায়? গোপন সিন্দুক পেল সে একটা খুঁজে, কিন্তু ওর পিছনে বৃথা সময় নষ্ট করল না সে খুলবার চেষ্টা করে। আরও বিরাট কিছু আছে। অদ্ভুত কিছু আছে এই ইয়টে। সেই আকর্ষণেই এখানে আসতে চেয়েছিল আবদুল হাই—প্রাণ দিয়েছে সে হাঙরের মুখে।

ইয়টের ওপর প্রোটেকশনের বিশেষ কোন ব্যবস্থা দেখতে পায়নি রানা। কেন? এমন হতে পারে যে উপরে সত্যি সত্যিই প্রোটেক্ট করার কিছুই নেই। তাহলে? ইয়টের তলার কোন ব্যাপার নয় তো? হাঙরগুলো গার্ড দিচ্ছে তলাটুকু, অর্থাৎ যেটুকু অংশ পানির নিচে আছে। ইয়টের নিচে নামার উপায়?

ড্রেসিং-রুম থেকে ঘুরে এল রানা একপাক। কিছুই নেই সেখানে। আবার বেডরুমটা ভাল করে দেখতে যাবে এমনি সময় পিছন থেকে একটি তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনে চমকে ঘুরে দাঁড়াল রানা। ডেস্কের ওপর টেলিফোন বাজছে। লাল একটা আলো জ্বলে উঠেছে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে। কেউ ডাকছে গোলাম হায়দারকে। বাইরে থেকে শব্দ শুনতে পেয়ে কেউ ঢুকতে চাইবে না তো ভিতরে? তার আগেই ভেগে পড়া দরকার। দরজায় গিয়ে কান পাতল রানা আশপাশে কোন সাড়া-শব্দ নেই। আবার ফিরে এল সে বেডরুমে।

হঠাৎ চোখ পড়ল রানার ঘরের কোণে দাঁড়ানো মূর্তিটার ওপর। নারীর ফুল-সাইজ শ্বেত পাথরের মূর্তি। এগিয়ে গেল সে মূর্তিটার কাছে। নাহ্। এখানেও কিছু নেই। দেহের ওপর একবার আলো বুলিয়ে নিয়ে ফিরতে যাচ্ছিল রানা, হঠাৎ পেন্সিল-টর্চের আলো এসে স্থির হলো মূর্তিটার কপালে লাল টিপের উপর। কি ব্যাপার? ওখানে আঙুলের ছাপ কেন? মূর্তির কপালে কে হাত···আচ্ছা! সুইচ নয় তো! তর্জনী দিয়ে টিপে ধরল রানা লাল বোতামটা। সড় সড় করে সরে গেল দুই হাত তফাতে এক টুকরো কাঠ। লোহার দরজা দেখা গেল একটা। চকচকে নিকেল করা হ্যান্ডেলের পাশেই চাবির ফুটো।

মিনিট দু'য়েক চেষ্টার পর খুলে গেল দরজাটা। ভিতরে অন্ধকার। টর্চ জ্বেলে ভিতরটা দেখে নিল রানা একনজর। খাড়া একটা লোহার সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে। দরজা ভিড়িয়ে রেখে নিচে নেমে গেল রানা। সরু একটা পথ পাওয়া গেল। কয়েকটা বাঁক ঘুরে মিলেছে গিয়ে আরেকটা পথে। আবছা আলো দেখা গেল সামনের পথটায়। পথের দু'পাশে স্টীলের দেয়াল। টর্চটা নিভিয়ে দিল রানা। বুঝল ইয়টের তলায় চলে এসেছে সে। কিন্তু এই গোপন পথটা গেছে কোথায়?

সামনের আবছা আলোকিত পথটার কাছে এসে মাথা বাড়িয়ে দুইধার

দেখল রানা সাবধানে। কেউ নেই। হঠাৎ ক্যাঁচ করে শব্দ তুলে খুলে গেল একটা দরজা দশ গজ তফাতে। ডানদিকে। উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল দেয়ালের গায়ে। স্যাৎ করে সরে গেল রানা। সাদা নাবিকের ড্রেস পরা কয়েকজন অফিসার বেরিয়ে আসছে একটা ঘর থেকে। এই দিকেই আসবে মনে হচ্ছে। কোন্ দিকে যাবে ওরা? এই গলিতে ঢুকে পড়বে না তো?

এক ছুটে সরে গেল রানা অন্ধকার গলির ভিতরে বেশ খানিকটা দূরে। না। এই গলিতে ঢুকল না ওরা। অন্ধকার গলিমুখটা পেরিয়ে ছয়জন অফিসার চলে গেল বাঁয়ে। প্রথম দর্শনে চিনতে পারেনি রানা—এইবার পর পর ছয়জন লোককে দুই সেকেন্ড করে দেখবার সুযোগ পেল। চমকে উঠল সে। ইন্ডিয়ান ন্যাভাল্ ফোর্সের ড্রেস! ব্যাপার কি? এই ইয়টে ইন্ডিয়ান নেভির অফিসার কেন? আশ্চর্য! দ্রুত চলে এল রানা গলিমুখে। মাথা বাড়িয়ে দেখল বাঁয়ে মোড় নিচ্ছে ওরা। ডাইনে চেয়ে কাউকে দেখতে পেল না সে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এক ছুটে চলে এল রানা বাঁয়ে বাঁকটার কাছে। ভারতীয় নেভির পোশাক এবং একটা শিখ চেহারা দেখে বুঝল রানা, সন্দেহ নেই, এরা ইন্ডিয়ান নেভির লোক। আশ্চর্য!

পথটা শেষ হয়ে গিয়েছে সামনে। একটা বাল্‌ব জ্বলছে শেষ মাথায়। ডানধারে দেয়ালের গায়ে হাত ঢুকিয়ে দিল সামনের লোকটা। চাবি বের করে এনে খুলে ফেলল একটা দরজা। চাবিটা রেখে দিল সে আবার কী-বোর্ডে। খটাং করে বন্ধ করে দিল গর্তের ঢাকনি। এবার একটা নব ঘুরাতেই পথের শেষ মাথায় খুলে গেল দরজা। একরাশ ধোঁয়া এসে ঢুকল গলিপথে। আবছা হয়ে গেল সব কিছু। ধোঁয়াটা মিলিয়ে যেতেই আবার বাতি দেখা গেল পরিষ্কার। দরজাটাও। লোকগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ছুটে গিয়ে দাঁড়াল রানা দরজার সামনে। নবটা সাবধানে ঘুরিয়ে ধাক্কা দিল, কিন্তু খুলল না দরজা। ভিতর থেকে হুক তুলে বন্ধ করে গেছে ওরা। চাবির ফুটোয় চোখ রেখে কিছুই দেখতে পেল না রানা। কি আছে ওপাশে? আপাতত বুঝবার উপায় নেই। ডান পাশের দেয়ালে চাবি রাখার গর্তটার ঢাকনি দেখতে পেল সে চারকোনা। খানিকক্ষণ টানাটানি করতেই খুলে গেল সেটা। দশ বারোটা চাবি ঝুলছে কী-বোর্ডে। কোন চাবিটা? আট নম্বর চাবি দুলছে অল্প অল্প। খুলে আনল রানা সেটা। পকেট থেকে বের করল একটুকরো সাদা কাগজ। চাবিটা এবার কাগজ দিয়ে মুড়ে নিয়ে টিপে টিপে পরিষ্কার ছাপ তুলল সে। এখন কি করবে সে? চাবি দিয়ে দরজা খুলে যাবে নাকি ওপাশে? না। আজকের মত ফিরে যেতে হবে। এতক্ষণে খোঁজ পড়ে গেছে হয়তো। চাবিটা যথাস্থানে রেখে ঢাকনি লাগিয়ে দিয়ে দ্রুত ফিরে এল রানা গোলাম হায়দারের ঘরে। দরজাটা লাগিয়ে কেবিনের গায়ে সরে যাওয়া কাঠের প্যানেলটা আবার যথাস্থানে ঠিকমত বসিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল সে কেবিন থেকে। ফিরতি পথে একজন ক্রু-র সাথে দেখা হলো। গম্ভীরভাবে স্যালিউট করে চলে গেল সে রানার পাশ কাটিয়ে। জিমনেশিয়ামের কাছে আসতেই

দেখা হলো রুমানার সঙ্গে।

'কোথায় ছিলে তুমি, রানা?'

'এই তো, একটু ঘুরে ফিরে দেখছিলাম।'

'কোথায় ঘুরছিলে তুমি? সারা ইয়ট তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পেলাম না তোমাকে? ঘরে নেই, ডেকে নেই, সুইমিং পুলে নেই...।'

'কি ব্যাপার? হঠাৎ এত কি দরকার হয়ে পড়ল তোমার?' কথাটা ঘুরিয়ে দিতে চাইল রানা। বিষয়বস্তুর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে হয়তো ভুলে যাবে রুমানা রানার গায়েব হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা।

'গোলাম হায়দারকে দেখলাম ওই ছুঁড়িটাকে জড়িয়ে ধরে চলে যাচ্ছে স্পীড বোটে করে। হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলাম না তোমাকে। সত্যি, কোথায় ছিলে বলো তো?'

'গোলাম হায়দার কাল কত রাতে এসেছিল ইয়টে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তা ঠিক বলতে পারব না। আমার সাথে দেখা করেনি ও।'

ডেকের দিকে এগোল ওরা। রানা জিজ্ঞেস করল, 'গেল কোথায় ওরা?'

'এই নদী-পথে মাইল তিনেক এগোলে বামে পাহাড়ের মাথায় ওর একটা বাড়ি আছে। গোলাম ভিলা। খুব সম্ভব সেখানেই গেছে। ওটা ওর বাগান বাড়ি। ওই যে লাল বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, ওরই পাশ দিয়ে পাহাড়ে উঠবার রাস্তা।'

'কতদিন হলো মেয়েটা জুটেছে ওর সঙ্গে?'

'সাত-আটদিন। যাক্ ওদের কথা বাদ দাও। ভুলে যেতে চাই আমি ওদের। চলো, বারে গিয়ে গল্প করা যাক। ভয় নেই—নাচ দেখাব না। শুধু দুই ঢোক হুইস্কি খাব।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হয়ে গেল রানা। লিফটে করে নেমে এল ওরা বারে। লিফট থেকে বেরিয়ে একপায়ে ভর দিয়ে হাইহিলের গোড়ালির ওপর পাঁই করে একপাক চক্কর খেলো রুমানা।

'এই রে! আবার বোধহয় শুরু হলো! শোনো, রুমানা...'

খিলখিল করে হেসে উঠল রুমানা। মাথাটা পিছনে হেলিয়ে রাখল আহ্লাদী অবাধ্য মেয়ের মত। অপরূপ চোখের লম্বা বাঁকা পাপড়িগুলো বুজে এল ওর।

'শোনো, রুমানা, আজও যদি আবার নাচের সেশন আরম্ভ হয় তাহলে বলো, এক্ষুণি কেটে পড়ি আমি,' বলল রানা মৃদু হেসে।

'আচ্ছা, নাচব না। কই, বানিয়েছ আমার হুইস্কি?'

ডিভানের ওপর পাশাপাশি বসে গ্লাস ঠোকাঠুকি করে নিল দু'জন। মিষ্টি একটা সেন্ট মেখেছে রুমানা। আর পরেছে রূপালী বর্ডার দেয়া দুধসাদা ড্রেস। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে ওকে দেখতে। গুনগুন করছে মিশরীয় সুর।

একে দিয়ে কথা বলাতে হবে। যতটা সম্ভব তথ্য বের করে নিতে হবে

এর কাছ থেকে—ভাবল রানা।

'সুরটা কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করল রুমানা।

'চমৎকার! ইজিপশিয়ান সুর বুঝি? তা তুমি এই ইয়টে যোগ দিলে কবে?'

রানার পাশে বসে অনেক কথা বলতে আরম্ভ করল রুমানা। কি ভাবে কায়রো থেকে পালিয়ে যায় এক কোটিপতির সঙ্গে, তারপর এখানে সেখানে, এর কাছে ওর কাছে বিচিত্র জীবন যাপন করেছে সে। ছ'মাস হলো পরিচয় হয়েছে ওর গোলাম হায়দারের সঙ্গে। ফ্রান্স থেকে নিয়ে এসেছে ওকে গোলাম হায়দার। ইয়টেই থাকে সে বেশির ভাগ সময়। কক্সবাজার আর টেকনাফের মাঝামাঝি কয়েক বর্গ মাইল জঙ্গল কিনে নিয়েছে গোলাম হায়দার। কাঠের ব্যবসা আরম্ভ করেছে মাস কয়েক হলো। হাতি শিকার করে সে সেখানে। চমৎকার একটা কাঠের বাংলো আছে ওর। ইয়টটা মাঝে মাঝে যায় ওখানে—একটা জেটি বানিয়েছে সে ওখানে ইয়টের জন্যে পাহাড় খুঁড়ে। আর যায় সুন্দরবনে শিকার করতে। বঙ্গোপসাগর দিয়ে খুলনার দক্ষিণে চলে যায় সে ইয়টে করে। একেবারে ইন্ডিয়া-পাকিস্তান বর্ডারের কাছে। রাই-মঙ্গলের মোহনার দক্ষিণে ইয়ট নোঙর করে স্পীড বোটে শিকার করতে যায় সে জঙ্গলের মধ্যে। প্রায়ই যায়।

গল্প করতে করতে অনেক সহজ হয়ে উঠল রুমানা।

'সত্যি বলো তো, সেদিন ঢাকায় তাস খেলতে গিয়ে তুমি আমাদের ঠকালে কি কৌশলে?'

'তাসগুলো সাজানো ছিল।'

'বদলালে কি করে?'

'হাত সাফাই।'

'গোলাম হায়দারও তাই বলছিল। কিন্তু ওর কথায় এই ইয়টে চলে এলে কোন্ সাহসে? তোমার কি ভয় বলতে কিছুই নেই? জানো, তোমাকে এখন যা খুশি তাই করতে পারে গোলাম হায়দার?'

'জানা ছিল না আমার সে কথা।'

'খুব সাবধান, রানা! গোলাম হায়দারের কোনও কিছু কখনও ভাল হতে পারে না—লোকটা কত খারাপ, বলে বোঝানো যাবে না।'

'আমি সাবধান থাকব, রুমানা। তোমাকে ধন্যবাদ।'

'আর, আমাকে বেসামাল অবস্থায় পেয়েও কোন সুযোগ নাওনি বলে তোমাকে ধন্যবাদ।'

পনেরো

বেলা চারটের সময় ঘুম ভাঙল রানার। মাথাটা ধরেছে।

দুটো অ্যালকাসেলযার পানিতে গুলিয়ে খেয়ে নিয়ে রিং করল রুম-সার্ভিসে গোটা কয়েক স্যান্ডউইচ আর কড়া দু'কাপ কফির জন্যে। কেবিনের দরজাটা খুলে দিল। বাথরুমের শাওয়ার খুলে দাঁড়িয়ে রইল তার নিচে ঝাড়া দশ মিনিট। তারপর শুধু মাথা মুছে নিয়ে ব্যাকব্রাশ করে ভেজা শরীরে বাথরোব জড়িয়ে চলে এল বেডরুমে। এয়ারকুলার অন্ করে দিয়ে ইজিচেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল তার সামনে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় জুড়িয়ে গেল দেহটা। আবার ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে, কিন্তু জেগে রইল সে—কাজ আছে।

দরজায় টোকা পড়তেই হাঁক ছাড়ল রানা, 'ভেতরে এসো।'

হাফ ডজন চিকেন স্যান্ডউইচ আর বড় এক পট কফি রেখে চলে গেল ওয়েটার। খেয়ে নিল রানা। কফি খেতে খেতে চিন্তা করছে। মাথা ধরাটা ছেড়ে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু তবু মাথার ভিতর কেমন যেন ভার বোধ করল। মগজটা ভোঁতা হয়ে গেছে যেন। কফি শেষ করে ধীরে-সুস্থে তৈরি হয়ে নিল রানা। জামা-কাপড় পরে বেরিয়ে এল বাইরে। বিকেলের রোদে ঝিলমিল করছে সাগর-সঙ্গম। আফটার ডেকের রেলিং-এর ধারে গিয়ে দাঁড়াল সে—যেন হাওয়া খাচ্ছে।

লোবাক দাঁড়িয়ে কি যেন বলছিল একজন লোককে, নিরুৎসুক দৃষ্টিতে চাইল একবার রানার দিকে। যেখান দিয়ে ওপরে ওঠার বা নিচে নামার সিঁড়ি, সেখানে বোটের চিহ্নও নেই। রানা জানে দুটো বোট আছে এই ইয়টে। সেদিন ইয়টে উঠবার সময় দেখছিল ঠিক একই রকম দেখতে আরেকটা বোট ইয়টের পিছনে বাঁধা। একটা বোট তো নিয়ে গেছে গোলাম হায়দার, আরেকটা বোট নিশ্চয়ই আছে যথাস্থানে। ধীর পায়ে এগোল রানা। পিছন ফিরে দেখল লোবাক চেয়ে আছে ওর দিকে। স্টার বোর্ড সাইডের দিকে হেঁটে চলে গেল রানা। ঝুঁকে দেখল, আছে বোটটা। ডেক হাউসের সঙ্গে বাঁধা। লোবাকও চলে এসেছে এই ধারে। সন্দেহ করেছে, রানার মতলব আছে কোনও। কাছাকাছিই দাঁড়িয়ে রইল সে। কয়েকটা সী-গাল চোখে পড়ল ওর। দূরে সবুজ গাছপালা দেখা যাচ্ছে। চোখটা তেরছা করে দেখল নড়বার লক্ষণ নেই লোবাকের দাঁড়াবার ভঙ্গিতে।

লোবাক নিশ্চয়ই আশা করবে পালাতে হলে পানিতে ঝাঁপ দেয়ার চেষ্টা করবে রানা। ইয়ট থেকে পালাতে চাইলে সেটাই স্বাভাবিক। ওর তো জানা নেই হাঙরের রহস্য ভেদ করেছে সে। সেইজন্যেই বোধহয় দাঁড়িয়ে আছে

কাছাকাছি, ঝাঁপ দেবার আগেই ঠেকাবে। কাজেই রেলিং থেকে দূরে সরে গেলেই চলে যাবে সে নিজের কাজে। একটা রশি দেখতে পেল রানা। ওই রশি বেয়েই নামতে হবে ওকে। খানিকটা সরে এসে একটা ডেক চেয়ারে বসল রানা। স্টুয়ার্ডকে দেখতে পেয়ে লোবাককে শুনিয়ে রুমানাকে এখানে পাঠিয়ে দিতে বলল। কিন্তু নড়ল না লোবাক একচুল।

সাড়ে পাঁচটা বাজে। এখন যদি রুমানা এসে হাজির হয় তাহলে আরও সাড়ে ছয়টা ঘণ্টা বেজে যাবে রানার। আজকের সব প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে যাবে তাহলে। স্টুয়ার্ড চলে গেছে রুমানাকে খবর দিতে। অসহায়ভাবে এদিক ওদিক চাইল রানা।

এমনি সময় ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো রানার প্রতি। কয়েকজন ক্রু ডেকের ওপর দিয়ে একটা তেলের ড্রাম গড়িয়ে নিয়ে আসছিল এইদিকে, হঠাৎ একটা হিঞ্জে লেগে ফুটো হয়ে গেল। গলগল করে তেল বেরোতে আরম্ভ করল ফুটো দিয়ে। হাঁ-হাঁ করে ছুটে গেল লোবাক সেইদিকে। কিন্তু তার আগেই দপ করে জ্বলে উঠল আগুন। খুব সম্ভব কারও ফেলে দেয়া সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরো ছিল ওখানে।

আর দেরি করল না রানা। এক লাফে রেলিং-এর ধারে চলে এল। পিছনে কি ঘটছে ফিরেও দেখল না একবার। অল্পক্ষণেই আগুনটা আয়ত্তে চলে আসবে তাতে ওর কোন সন্দেহ নেই। রেলিং টপকে চেপে ধরল রানা রশি। কয়েকজন লোকের হৈচৈ-হট্টগোলের শব্দ কানে এল। সড়সড় করে নেমে এল সে বারো-চোদ্দ ফিট নিচে। ডেক-হাউসে পৌঁছতে হলে দোলাতে হবে রশিটা। ধীরে ধীরে ঝুল বাড়তে থাকল। ওপরে কি ঘটছে, ওকে দেখতে না পেয়ে কি করবে লোবাক, কিছুই বুঝতে পারল না সে। ছুটে নিচে আসবে, না ডাইভ দিয়ে পড়বে পানিতে? নাকি, কেটে দেবে রশিটা? সোজা পানিতে গিয়ে পড়বে রানা অহলে।

হাঙ্গরগুলোর অস্তিত্ব ভুলে যাবার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু নিচের দিকে চেয়েই অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল ওর। আবছা মত প্রকাণ্ড কি যেন দেখা যাচ্ছে পাঁচ-ছয় ফিট পানির নিচে। আর তিনবার ঝুলেই পৌঁছে গেল রানা ডেক-হাউসে। এক দৌড়ে পিছনে চলে গেল সে। একটা দড়ির মই ঝুলছে পিছন দিকে। বোটের মধ্যে শেষ হয়েছে ওটার আরেক মাথা। রেলিং টপকানোর জন্যে একটা পা উঁচু করতেই পিছন থেকে কেউ চেপে ধরল রানার কাঁধ। পিছনে না চেয়েই কনুই চালাল রানা প্রথমে, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। কোয়ার্টার মাস্টার। মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে ওর আচমকা পেটের ওপর প্রচণ্ড এক গুঁতো খেয়ে। সামলে নেয়ার আগেই নক আউট পাঞ্চ কষাল রানা ওর নাক বরাবর। আছড়ে পড়ল সে ওপাশের রেলিং-এর উপর। কিন্তু পরমুহূর্তেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছুরি বের করল লোকটা। শক্তিতে সে রানার চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। পালাবার পথ নেই। তলোয়ারের মত করে ছুরিটা ধরে এগিয়ে আসছে লোকটা। আঘাত খেয়ে রানাকে ধরবার চেয়ে

মারবার দিকেই ওর আগ্রহ বেশি মনে হলো। ক্রুদ্ধ গর্জন ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। ছুরিটা চালাবার ঠিক আগের মুহূর্তে স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে খানিকটা বাঁয়ে সরে গেল রানা, তারপর বাঁ পা-টা খানিকটা ভাঁজ করে কাৎ হয়ে ডান পায়ে লাথি চালাল লোকটার হাঁটু লক্ষ্য করে। বেমক্কা লাথি খেয়ে বেঁকে গেল কোয়ার্টার মাস্টারের পা, ধাক্কার চোটে পিছিয়ে গেল খানিকটা। এইবার দুই হাতে কব্জিটা চেপে ধরে সেঁটে গেল রানা লোকটার গায়ের সাথে পিছন ফিরে। ছুরি ধরা হাতটা চিত হয়ে রয়েছে ওর কাঁধের ওপর দিয়ে। নিচের দিকে হ্যাঁচকা এক টান দিতেই মড়াৎ করে ভেঙে গেল লোকটার হাত কনুয়ের কাছে। তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ করে উঠল কোয়ার্টার মাস্টার। টপকে পেরিয়ে গেল রানা রেলিং। চেয়ে দেখল ভাঙা হাতে এখনও ছুরিটা ধরা আছে। ব্যথায় গড়াগড়ি খাচ্ছে লোকটা মেঝেতে। দড়ির মই বেয়ে নেমে গেল বোটের উপরই। রশি খুলে দিল বোটের।

চোক্ দিয়েই স্টার্টার টানল রানা। এইটিন হর্স পাওয়ার জনসন মোটর গম্ভীর গোছের একটা গর্জন করে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে উপরের ডেক থেকে ঝপাং করে পানিতে পড়ল ভারি কিছু। বোট থেকে বারো হাত তফাতে। রানার চোখে মুখে পানির ছিটে লাগল। ক্লাচ চেপেই ফরওয়ার্ড গিয়ার দিল রানা, তারপর টুইস্টগ্রিপ থ্রটলটা সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিল।

ভুস করে ভেসে উঠল একটা মাথা আট হাত দূরে। লোবাক। ধীরে ধীরে চলতে আরম্ভ করেছে বোটটা—আরও অন্তত চার মিনিট লাগবে এটার ফুল স্পীড উঠতে। অয়েল-ট্যাঙ্ক ইন্ডিকেটার কাঁটা প্রায় 'ফুল্'-কে স্পর্শ করে রয়েছে, সেদিক দিয়ে চিন্তা নেই—কিন্তু এসে পড়েছে লোবাক। ছপাৎ ছপাৎ করে প্রকাণ্ড হাত দুটো উঠছে আর পড়ছে, পা দুটো প্রপেলারের মত চলছে পিছনে। দূরত্ব কমে আসছে। বোটের গতি যতই বাড়ছে ততই জোর সাঁতার কাটছে লোবাক। কিচ্ছু করবার নেই রানার। স্পীড বোটকেও যদি কেউ সাঁতার কেটে ধরে ফেলে তাহলে নিজের ভাগ্যকে দোষ দেয়া ছাড়া করবার আর কি থাকতে পারে?

প্রায় পঁচিশ গজ দূরে সরে এসেছে ওরা ইয়ট থেকে। রানা চেয়ে দেখল রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে অনেক লোক। রুমানাকেও দেখতে পেল সে ওদের মধ্যে। আর তিনহাত এগোলেই বোট ধরে ফেলবে লোবাক। পিস্তল সম্পূর্ণ অকেজো। হাতের কাছে একটা কিছু নেই যা ব্যবহার করতে পারে রানা।

হঠাৎ মনে হলো রানার, দেখিই না চেষ্টা করে—হয়তো পিস্তলটা যে খারাপ করে দেয়া হয়েছে সেটা লোবাকের জানা নেই। দুই হাত দূরে থাকতে শোল্ডার হোলস্টার থেকে ঝট্ করে বের করল রানা পিস্তলটা। সোজা তাক করল সে ওটা লোবাকের কপালের দিকে। জাদুমন্ত্রের মত কাজ হলো।

প্রায় ধরে ফেলেছে, তাও এই লোকটার মধ্যে কোন রকম চাঞ্চল্য দেখতে না পেয়ে আশ্চর্যই হয়েছিল লোবাক। এইবার বুঝল তার কারণ। ভীত

দৃষ্টিতে চাইল পিস্তলটার দিকে। থমকে থেমে গেল সে। কি যেন চিৎকার করে বলছে স্টুয়ার্ড ইয়ট থেকে—আউট বোর্ড মোটরের গর্জনে শোনা যাচ্ছে না। পিছিয়ে পড়ল লোবাক। অনেকখানি দূরে সরে গেল বোটটা। মৃদু হেসে ঢুকিয়ে রাখল রানা ওর একান্ত প্রিয় পিস্তলটা শোল্ডার হোলস্টারে।

এতক্ষণে শুনতে পেল লোবাক স্টুয়ার্ডের কথাগুলো। রানার পিস্তলটা নিজের হাতে নষ্ট করে দিয়েছে ওদের মালিক—গুলি বেরোবে না ও থেকে। আবার রওনা হতে গিয়েও থেমে গেল সে। বুঝতে পেরেছে, নাগালের বাইরে চলে গেছে স্পীড বোট, এখন আর ধরা সম্ভব নয়।

দূর থেকে হাত তুলে টাটা করল রানা ওকে।

সাগরসঙ্গম-২

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৬৭

এক

সোজা সদরঘাটে এসে থামল স্পীড বোট। একটা খুঁটির সঙ্গে ওটাকে বেঁধে নেমে গেল রানা। কিছুদূর হাঁটতেই বেবি-ট্যাক্সি পাওয়া গেল। পৌনে সাতটা বাজে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আধঘন্টার মধ্যেই আঁধার হয়ে যাবে। এখনই এক-আধটা বাতি জ্বলতে আরম্ভ করেছে এখানে-ওখানে। বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে খুশি হয়ে উঠল রানার মন।

গোলাম হায়দারের বাগান বাড়িটার কথা জানা ছিল না রানার। ইয়টে কথায় কথায় রুমানার কাছে জেনেছে সে এই খবর। ওখান থেকেই আজ রাত্রির কাজ শুরু করবে সে। লাল বাড়িটা চিনে নিয়েছে, তারই পাশ দিয়ে গেছে রাস্তা। পাহাড়ের মাথায় গোলাম ভিলা।

লাল বাড়িটার কাছেই বেবি-ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে হেঁটে উঠে এল রানা অর্ধেক পথ। বাড়িটার চারপাশে উঁচু দেয়াল। ভাঙা কাঁচ বসানো। গেটটা বন্ধ। ভিতরে ঢুকবার কোনও উপায় দেখা গেল না। রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে উঠল রানা অনেকদূর, তারপর বাঁয়ে একটা পায়ে-চলা পথ পেয়ে রওনা হলো সেদিকেই। সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ। খুব সম্ভব কেউ নেই বাড়িতে। দেয়াল ঘেঁষে পুরো বাড়িটা ঘুরল সে একবার। কোনও রাস্তা পাওয়া গেল না ঢোকার। আবার গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে রানা। কি মনে করে আস্তে ধাক্কা দিল সে গেটে। খড় খড় করে চার ইঞ্চি ফাঁক হয়ে গেল সেটা। সন্ধ্যার নিস্তব্ধ আবছা অন্ধকারে এই শব্দটা কানে বড় বেশি করে বাজল রানার। মনে হলো সবাই শুনতে পাচ্ছে। গেটের ফাঁকে সাবধানে চোখ রাখল সে। সোজাসুজি একটা গ্যারেজ দেখা যাচ্ছে। একটা প্রকাণ্ড, কালো মার্সিডিস থ্রী হানড্রেড দাঁড়িয়ে আছে গ্যারেজের ভিতর রানার দিকে মুখ করে। চকচকে নিকেল করা নাক দেখেই গাড়িটা চিনতে পারল সে। তিন মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রানা। না। কেউ নড়ছে না গ্যারেজের ভিতর। আশপাশে যতদূর দেখা যায় জনমানবের চিহ্ন নেই। বাড়ির সামনে ঘাস বিছানো প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। ফাঁকা। মনে হলো যেন ঠোঁটে তর্জনী রেখে 'চুপ!' বলে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। একটিও বাতি জ্বলছে না কোথাও।

বিসমিল্লা বলে ঢুকে পড়ল রানা। প্রথমেই সোজা চলে গেল সে গ্যারেজে। সামনের বনেটের উপর হাত রেখেই টের পেল, অল্পক্ষণ আগেই ব্যবহার করা হয়েছে গাড়িটাকে। গরম হয়ে রয়েছে এঞ্জিন। গ্যারেজের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে এল সে। চারদিক নিস্তব্ধ। যে লোকটা এই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছে সে বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে।

অদ্ভুত এক থমথমে নীরবতা বিরাজ করছে বাড়িটা ঘিরে।

পিছন দিকে একপাক ঘুরে সামনে চলে এল রানা। গাড়ি-বারান্দা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে দেখল দরজা বন্ধ। হয় বাইরে থেকে চাবি লাগানো, নয়তো ভিতর থেকে দরজা লাগিয়ে দিয়েছে কেউ। বাড়িটা যদি তালাই মারা হবে তাহলে গাড়ির এঞ্জিন গরম কেন? বাড়ির পিছনে মালীর ঘরে ঢোকেনি তো ড্রাইভারটা? যাই হোক, ঢুকতে হবে এই বাড়িতে। দরজার সামনে রাখা পাপোশের তলায় আশা করেছিল রানা চাবিটা, কিন্তু পেল না। পিছনের খোলা জানালা দিয়েই ঢুকতে হবে।

বাথরুমের মধ্যে ঢুকল রানা জানালা গলে। পাশেরটা ডাইনিংরুম। পেন্সিল টর্চ জ্বেলে এগিয়ে গেল সে ড্রইংরুমের ভিতর দিয়ে একটা রীডিংরুমে। মহা মূল্যবান আসবাবে সাজানো প্রত্যেকটি ঘর। সুরুচির পরিচয় রয়েছে প্রতিটি জিনিস ঠিক জায়গা মত গুছিয়ে রাখার নৈপুণ্যে। পা টিপে চলে এল রানা সিঁড়িঘরের কাছে। কাঠের সিঁড়ি। বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে উঠে গেল সে দোতলায়।

প্রথম ঘরটা তালা মারা। সেটা ছেড়ে অন্যান্য ঘরগুলো পরীক্ষা করল সে। অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না ওর। করিডরের শেষে বাথরুমটায় ঢুকেই থমকে গেল। মোজাইক করা মেঝের ওপর দু'ফোঁটা রক্ত পড়ে আছে।

নিচু হয়ে লক্ষ করল রানা রক্তটা তাজা। এখনও কালচে হয়ে আসেনি। একটা ব্র্যাকেটের ওপর স্নো, সাবান, চিরুনি, ক্ষুর, পাউডার রাখা। সব শুকনো। আশ্চর্য!

সিঁড়ির মাথায় ফিরে যেতেই অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনতে পেল রানা। থমকে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করল সে। কিন্তু আর হলো না কোনও শব্দ। যতদূর সম্ভব তেতলা থেকে এসেছে শব্দটা। টর্চ নিভিয়ে অতি সাবধানে উঠে এল রানা তেতলায়। সতর্ক দৃষ্টিতে চাইল চারপাশে। ট্র্যাপ হতে পারে।

হঠাৎ আবার শব্দটা শুনতে পেল রানা। অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ। চটাস্ করে চড় পড়ল কারও গালে। এগিয়ে গেল রানা। তৃতীয় ঘরটার বন্ধ দরজায় কান পাতল। চাপা কণ্ঠে কথা বলে উঠল কেউ।

'তাহলে বলবি না? ঠিক আছে, চিরতরে মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি তোর, শুয়োরের বাচ্চা!'

গোঙানির শব্দ হলো আবার। মুখ বন্ধ করে গোঙাচ্ছে কে যেন। অনেক চেষ্টা করল রানা ঘরের ভিতরটা দেখবার জন্যে। কিন্তু দরজা বন্ধ তো আছেই, ওপাশে কালো পর্দা ঝুলিয়ে দেয়া আছে। কিছুই দেখতে পেল না সে।

দোতলার ঘরগুলোর কথা মনে হলো রানার। প্রত্যেকটা ঘরের মধ্যে দিয়ে পাশের ঘরে যাবার দরজা আছে। দ্বিতীয় ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল রানা। ওপাশের ঘরে যাবার দরজাটাও বন্ধ। কিন্তু পর্দা নেই। দরজার গায়ের এক চিলতে ফাঁক দিয়ে ভিতরের বেশ খানিকটা অংশ দেখতে পেল সে।

একজন লোকের পিছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে রয়েছে সে রানার দিকে পিছন ফিরে। প্রকাণ্ড চেহারা। একটা রশি ঝুলছে ছাত থেকে লোকটার দুই হাত সামনে। লোকটার এক হাতে চকচকে ছুরি একটা, আরেক হাতে বড় সাইজের স্ট্যাপলিং মেশিন।

'জিনিসটা দিয়ে দিলেই প্রাণ বাঁচাতে পারতিস, হারামজাদা। যাক, মালিকের হুকুম, প্রথমে একটা চোখ তুলতে হবে। ভাবছি কোন্‌টা তুলব, বাম চোখ, না ডান চোখ?' বলেই বীভৎস কণ্ঠে হেসে উঠল লোকটা।

টেলিফোন বেজে উঠল ঘরের ভিতর। হাসি থামিয়ে সেদিকে এগোল সে। লোকটা সামনে থেকে সরে যেতেই চমকে উঠল রানা।

দুই হাত বাঁধা অবস্থায় সিলিং থেকে ঝুলছে গিলটি মিঞা!

দুই

নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে গিলটি মিঞার। দুই ঠোঁট একত্র করে স্ট্যাপল্‌ করা। কপালের ডানধারটা ফুলে আছে অনেকখানি। গালে পোড়া পোড়া দাগ—বোধহয় চুরুটের আগুন ঠেসে ধরা হয়েছিল সেখানে। সরল নিষ্পাপ দুই চোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত—কিন্তু জল নেই সে-চোখে। এদের কাছে করুণা ভিক্ষা করা যে বাতুলতা এটুকু সে বুঝে নিয়েছে।

অপরিপুষ্ট, শীর্ণ, ক্ষীণ, দুর্বল এই লোকটা কী এমন ক্ষতি করেছে এদের যে এমনি ভয়ঙ্কর চরম শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে? ওর বালকসুলভ সরল মুখটার দিকে চেয়ে মাথায় খুন চেপে গেল রানার। হঠাৎ খেয়াল করল রাগে থরথর করে কাঁপছে সে। সারা দেহের পেশীগুলো টান হয়ে গেছে ওর। ঘরের মধ্যে কয়জন লোক আছে জানে না সে—জানবার দরকার নেই। লোকটার কাছে ছুরি ছাড়া আর কি অস্ত্র আছে জানে না সে—জানবার দরকার নেই। কিছুটা পিছিয়ে এসে দৌড়ে গিয়ে দড়াম করে লাথি মারল রানা কপাটের মাঝ বরাবর, প্রাণপণ শক্তিতে।

ছিটকিনি ভেঙে দরজা খুলে যেতেই হুড়মুড় করে পড়ল রানা পাশের ঘরের মেঝের উপর। কথা বলছে লোকটা তখনও টেলিফোনে। মুখের এক পাশ দেখেই চিনতে পারল রানা—সেদিন রাস্তার ওপর যে লোকটাকে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে এসেছিল, এ সেই তৃতীয় লোকটা। প্রকাণ্ড চেহারা, গালে গভীর একটা ক্ষতচিহ্ন।

এক লাফে উঠে দাঁড়াল রানা। যেন কিছুমাত্র বিস্মিত হয়নি, এমনি ভাবে ফোনটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা ছুরি হাতে। ঝট্‌ করে পিস্তল বের করল রানা। ভাবল, এবারও নিশ্চয়ই কাজে লেগে যাবে কৌশলটা। কিন্তু পিস্তল দেখেই হেসে উঠল লোকটা। তরমুজের বীচির মত

দুই সারি নোংরা কালো দাঁত বেরিয়ে পড়ল। কাটা দাগটা কুঁচকে ওঠায় আরও বীভৎস দেখাচ্ছে ওকে।

'আমাকে বুদ্ধু লোবাক পাওনি, বাছা, যে খেলনা দেখিয়ে কাবু করবে। আজ এসো তোমার বাহাদুরি ঘুচিয়ে দিই।' এক পা এগোল লোকটা রানার দিকে।

রানা বুঝল ফোনে ওর কথাই হচ্ছিল। আর এ-ও বুঝল, এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। ফোনটা ক্রেড্লের ওপর রাখেনি লোকটা, রেখেছে টেবিলের ওপর। ঘরের সমস্ত কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে রিসিভার কানে ধরা ওপাশের লোকটা। অর্থাৎ দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে ওরা দলবলসহ।

সাঁ করে ছুঁড়ে মারল রানা পিস্তলটা। খপ করে ক্রিকেট বল ধরার মত বাম হাতে ধরে ফেলল লোকটা সেটা শূন্যেই। একই গতিতে ফিরে এল সেটা রানার দিকে। এতটা আশা করেনি রানা। সরে যাবার সময় পেল না সে। দড়াম করে বাঁটটা এসে পড়ল ওর বুকের ওপর।

লাফিয়ে চলে এসেছে লোকটা কাছে। খাটের পাশে রাখা টিপয়টা তুলে নিল রানা। প্রথম আঘাতটা গেল টিপয়ের ওপর দিয়ে। লাথি চালাল রানা কিন্তু লাগল না। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল সে। এক সেকেন্ডের এই সুযোগটুকুর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল লোকটা। বাম হাতের এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল সে সামনে থেকে টিপয়টা। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বিপুল বিক্রমে। পড়ে গেল রানা। পেটের উপর চেপে বসে ছোরা তুলল লোকটা রানার বুক লক্ষ্য করে।

এমনি সময় ধাঁই করে এক লাথি পড়ল লোকটার হাতের ওপর। শূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় সব দেখছিল গিলটি মিঞা—ঠিক সময় মত চালাল লাথিটা। ছিটকে চলে গেল ছুরি কোণে দাঁড়ানো আলমারির তলায়। সঙ্গে সঙ্গে দুই পায়ে পেঁচিয়ে ধরল গিলটি মিঞা লোকটার গলা। পা দুটো ছাড়াবার চেষ্টা না করে দুই হাতে টিপে ধরল লোকটা রানার গলা। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ওর দুই কনুই ধরে দুই দিক থেকে চাপ দিল রানা জোরে। বাপ্‌রে বলে হাত সরিয়ে নিল সে রানার গলা থেকে। হাত দুটো অবশ হয়ে গেছে ওর। চোখে সরষে ফুল দেখছে সে এখন। কিন্তু তবুও হেঁচকা টানে শক্তিশালী লোকটা ছাড়িয়ে ফেলল গিলটি মিঞার পা। এবার পিছন থেকে রানার দুই পা উঠে এল বাঁকা হয়ে। গলায় বাধিয়ে জোরে এক ধাক্কা দিতেই ডিগবাজি খেয়ে সরে গেল লোকটা রানার গায়ের ওপর থেকে। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছে রানা। লোকটাও উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। কোনরকম সুযোগ দিলে চলবে না। প্রচণ্ড এক লাথি চালাল রানা ওর তলপেটে। ছিটকে পড়ল সে দেয়ালের গায়ে। মাথা ঠুকে গেল দেয়ালের সঙ্গে। দমাদম দুটো ঘুসি পড়ল নাকের ওপর। পা ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল সে মাটিতে। আরেকটু নিশ্চিন্ত হবার জন্যে পড়বার আগে আঙুলগুলো সোজা রেখে রাম দা চালানোর মত রদ্দা লাগিয়ে দিল রানা ওর কানের লতির দেড় ইঞ্চি নিচে। দড়াম করে মাটিতে আছড়ে

পড়ল ওর জ্ঞানহীন দেহটা। ব্যস্, আধঘন্টার জন্যে নিশ্চিন্ত।

আলমারির তলা থেকে ছুরিটা বের করে রশি কেটে নামিয়ে আনল রানা গিলটি মিঞাকে। মাংস ফুঁড়ে ঠোঁট দুটো স্ট্যাপল করা। অতি সাবধানে যত্নের সঙ্গে ছুরির আগা দিয়ে সোজা করল রানা স্ট্যাপল পিনের দুই মাথা। এবার আস্তে চাড় দিতেই বেরিয়ে এল খানিকটা। রানা বুঝল অত্যন্ত ব্যথা পাচ্ছে গিলটি মিঞা। রানার এই অবস্থা হলে পানি বেরিয়ে যেত চোখ থেকে। কিন্তু একবিন্দু পানি নেই গিলটি মিঞার চোখে। নিজেই এবার একটানে বের করে আনল পিনটা। জামার আস্তিনে মুছে ফেলল চারফোঁটা রক্ত।

'উহ্! এক্কেবারে দারোগার মার মেরেচেন, স্যার। স্লা কোনদিন ভুলবে নি কো। চলুন, এখন কেটে পড়া যাক।'

অবাক হলো রানা গিলটি মিঞার উপমা শুনে। টেবিলের কাছে গিয়ে রিসিভারটা কানে তুলল সে। কোনও শব্দ নেই। একবার নামিয়ে রেখে আবার কানে তুলতেই ডায়াল টোন পাওয়া গেল। অর্থাৎ রিসিভার নামিয়ে রেখেছে ওধারের লোকটা। রওনা হয়ে গেছে এতক্ষণে।

'আর কোনও লোক আছে এ বাড়িতে?' জ্ঞানহীন লোকটার পকেট থেকে গাড়ির চাবি বের করে নিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, স্যার, আর তো কোনও লোক দেকলুম না।'

'তবু সাবধানে নামতে হবে।'

সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা নিচে। নামতে নামতে থেমে গিয়ে দুই-তিনবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা সত্যিই গিলটি মিঞা ওর সাথে নামছে কিনা। কারণ রানার পায়ের এবং জামাকাপড়ের সামান্য খশখশ আওয়াজ হচ্ছে, কিন্তু গিলটি মিঞার চলায় বিন্দুমাত্র শব্দ নেই। প্রতিবারই দেখতে পেয়েছে রানা, পিঠের কাছে সেঁটে আছে ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নামছে, কিন্তু আশ্চর্য রকম নিঃশব্দ ওর চলা।

জানালা গলে নেমেই আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি দেখতে পেল রানা গিলটি মিঞার মুখে। কৌতূহল হলেও জিজ্ঞেস করল না রানা কিছু। দ্রুত এগোল সে গ্যারেজে দাঁড়ানো মার্সিডিস গাড়িটার দিকে।

এমনি সময় খুলে গেল গেটটা। তীব্র একটা আলো পড়েছে গেটের ওপর। এসে পড়েছে ওরা। একছুটে ঢুকে পড়ল রানা গ্যারেজের ভিতর। লুকিয়ে পড়ল গাড়িটার আড়ালে। সাঁ করে গাড়ি-বারান্দার দিকে চলে গেল একখানা সিট্রন ডি.এস.। সিট্রনের এঞ্জিন বন্ধ হবার আগেই চালু হয়ে গেল মার্সিডিসের এঞ্জিন। গেটটা অর্ধেক লাগিয়ে ফেলেছিল একজন লোক, পাঁচ হাত তফাতে দপ করে মার্সিডিসের হেড লাইট জ্বলে উঠতেই লাফিয়ে সরে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা সিট্রন থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন লোক গাড়ি-বারান্দায়। বাম পাশের বাম্পার দিয়ে ঠেলে খুলে ফেলল রানা গেট। তারপর দ্রুত নামতে আরম্ভ করল রাস্তা বেয়ে। লাল বাড়িটার কাছে এসে পিছন ফিরে চাইল রানা একবার। জ্বলজ্বল করছে সিট্রন ডি. এসের চোখ। পিছু পিছু নেমে

আসছে সেটা টিলা থেকে।

এতক্ষণ পর কথা বলল রানা।

'কি হে, গিলটি মিঞা, তখন হাসছিলে কেন?'

'কখোন, স্যার?'

'ওই যে জানালা গলে বেরিয়ে?'

'ও। ভাবছিলুম স্যার, আপনারা বড় বড় কারবার করেন, মস্ত কোনও গদি কিংবা ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক ম্যানেজ করেন, কিন্তুক আমাদের কায়দাও দিব্যি রপ্ত আচে। এতখানি আশা করতে পারিনি, স্যার, তাইতেই হাসছিলুম।'

গিলটি মিঞা কি বলতে চায় ভাল করে বুঝতে পারল না রানা। কাজের কথায় এল সে এবার।

'তোমাকে কেন ধরেছিল ওরা? আর এত অত্যাচারই বা করছিল কেন?'

'স্যার, সত্যি বলতে কি, কেন যে ওরা এত খেপে গেল আমিও ঠিক বুজে উটতে পারিনি। আপনার কাচে গোপন করবার কিচুই নেই। ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বলি। ক'দিন আগে আন্দরকিল্লার একটা বাড়িতে থ্রি সেবেনটি নাইন করতে গিয়েছিলুম। টিপ-টপ হাল ফ্যাচাঙের বাড়ি—কিন্তুক লোকজন আচে বলে মনে হলো না। ঝাড়া দু'টি ঘণ্টা লাগল আমার শুদু ভেতরে ঢুকতেই। জানালাগুলোয় সব মর্টিস লক্ মারা, অ্যালার্মের ব্যবস্তা। মনে সন্দো হলো—এই নির্জন বাড়িতে এত সব বায়নাক্কা কেন। ক্যালকাটাতেও কালে-ভদ্রে এ-রকম এক-আদটা বাড়ি চোকে পড়েচে। তিন-তিনটে অ্যালার্মের তার কাটলুম, স্যার। একবার ভাবলুম খামোকা সময় নষ্ট করচি, পরমুহূত্তে ওস্তাদের কতা মনে পড়ল—কষ্ট করলে কেষ্ট মিলবেই। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবেন না, স্যার, কিচুই চোকে পড়ল নি। বত্রিশ বচোর এ লাইনে আচি, স্যার—এমনটি আর কখনও দেকিনি!'

'মানে তুমি কি চুরি করতে ঢুকেছিলে?' রানা অবাক না হয়ে পারল না। ঝানু চোরকে সে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছে খুনে ডাকাতের হাত থেকে। বাহ্। কাজের কাজই করেছে! এইবার ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল এত মারেও চোখ দিয়ে পানি বেরোয়নি কেন গিলটি মিঞার।

'ওই একই কতা, স্যার,' বলল গিলটি মিঞা। 'আপনারা বড় বড় ব্যাঙ্ক, অফিস, আদালত দিনে-দুপুরে ম্যানেজ করেন পেস্তল দেকিয়ে, আর আমরা কাজটা নিরিবিলি রাতের অন্দোকারে চুপি চুপি সারি। লাইনটা তো একই। রাতে ম্যানেজ করি বলেই কাজটা ছোট হয়ে গেল নাকি, স্যার?'

অবাক হয়ে গিলটি মিঞার মুখের দিকে চাইল রানা। না, ঠাট্টা করছে না। তার মানে ওর স্থির বিশ্বাস একই লাইনের লোক রানা এবং ও। আজ দিনে তেমন কিছু জোটেনি দেখে সন্ধে লাগতে না লাগতেই নেমে এসেছে রানা ওর পর্যায়ে—ঢুকে পড়েছে জানালা গলে। চট্ করে রিয়ার ভিউ মিররে নিজের চেহারাটা দেখে নিল সে। একবার ভাবল, সেই রকমই কি লাগে? না তো!

'আচ্ছা, যাই হোক। তারপর কি হলো, বলো।'

'বের করলুম। টাকা, স্যার। ঘর ভর্তি টাকা। দোতলায় পাশাপাশি তিনটে ঘর একশো, পঞ্চাশ আর দশ টাকার নোটে ঠাসা। ছাদ সমান উঁচু করে ঠেকি দেয়া। আমার বাপের জম্মেও এত টাকা আমি দেকিনি এক সাতে। গুণে গুণে লাক তিনেক ব্যাগে পুরলুম। আর আঁটলোনি। আরেকটা ঘরে যন্তোর ছিল কতকগুলোন। আর ছিল ক্যামেরা একটা। একটা চকচকে যন্তোর পচোন্দ হয়ে গেল। ক্যামেরা আর সেই যন্তোরটা লিয়ে চলে এলুম। পরদিন ক্যামেরাটা বিক্রি করতে যেয়েই বোধায় চোকে পড়ে গেলুম ওদের। এমনিতেই এক হারামী সাব-ইন্সপেক্টর কিচুদিন যাবত আঠার মতন লেগে আচে পিচনে, তার ওপর আবার বিচ্ছিরি চেহারার লোকগুলোর পাল্লায় পড়ে ভাবলুম, ভ্যালা বিপদ রে, বাবা! প্রথম দিন শুদু মুকে মুকে কতা হলো। পাত্তাই দিলুম না। ওরা বললে, টাকা চাই না, যন্তোরটা দিয়ে দাও। আমি মনে মনে বললুম, লে হালুয়া, লিয়েচি কি দেবার জন্যে? এক স্যাঙাৎকে দিয়ে ঢাকায় পেটিয়ে দিলুম ওটা। বললুম, সৈয়দ ওয়ালিউল্লা চৌধুরীর নামে যেন পোস্ট পার্সেল করে পেটিয়ে দেয় এখানে...'

'সৈয়দ ওয়ালিউল্লা চৌধুরী কে?' জিজ্ঞেস করল রানা। বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে স্টিম ডি. এস.। কিন্তু ভয়ের কিছুই নেই। স্টেশন রোডে এসে পড়েছে ওরা।

'ওটা আমারই ভাল নাম, স্যার,' বলল গিলটি মিঞা একগাল হেসে।

'বলো কি? সৈয়দের ছেলে হয়ে তুমি...'

'আমি সৈয়দের ছেলে না, স্যার। আমার ছেলেপুলে যারা হবে তারা হবে সৈয়দের ছেলে। নামের সামনে পিচনে নিজেই দুটো ছাপ মেরে নিইচি। এ রকম অনেকেই করচে হরহামেশা। একবার চালু হয়ে গেলে আর কে ঠেকায়? কেউ সন্দো করে না। তা যা বলছিলুম, স্যার, শালারা ধরে ফেললে। আগ্রাবাদের গোলাম চেম্বারে ধরে লিয়ে গিয়ে বেঁদে রেকে অকত্য অত্যোচার করলে। একুশ দফা হাজত আর জেল খেটেচি স্যার, কিন্তুক এত কষ্ট পাইনি আর কখনও। স্বীকার গেলুম। কিন্তুক ওরা বলচে আমি মিথ্যে কতা বলচি। পোস্ট অফিসে খোঁজ লিয়ে আসচে আর বলচে এই নামে কোন পোস্ট-পার্সেল আসেনিকো। খুব মেরেচে, স্যার, ন্যাংটো করে সারা গায়ে সিগ্রেটের আগুন দিয়ে ছ্যাঁকা দিয়েচে। তিনদিন তিনরাত না খাইয়ে রেকে আজ একেবারে সাবড়ে দেয়ার যোগাড় করেছিল। সেদিনকে যে পালিয়েছিলুম, ধরে লিয়ে গিযে সে কি মার! তবে, স্যার, মার অনেক খেইচি, ওসব পরোয়া গিলটি মিঞা করে না। কিন্তুক দুঃখ, সাদারণ একটা যন্তোরের লেগে এত যন্তোনাও ছিল কপালে!'

'যন্ত্রটা পাওয়া গেল না কেন? তোমার স্যাঙাৎ কি পাঠায়নি ওটা?'

'সেই তো ভাবচি, স্যার। সে তো ওরকম ছেলে নয়। তবু এরা বলচে আসেনি...'

'টাকাগুলোর কি হলো?' বিশ্বাস করেনি রানা টাকার গল্প।

'দু'লাক স্বীকার গিয়েছিলুম—ওরা লিয়ে লিয়েচে। শালারা টেরও পায়নি যে এক লাক গাপ্ করে দিইচি—এতই টাকা ওদের!'

'এক লাখ টাকা কি করেছ?' দূরে আবদুল হাইয়ের বাড়ির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল রানা।

'দান করে দিইচি। এক স্যাঙাৎ বড় দুঃখে পড়েছিল। সে আর এক হিস্টিরি। আমারই...' হঠাৎ সচকিত হয়ে রানার মুখের দিকে চাইল গিলটি মিঞা। 'এ কোতায় লিয়ে এলেন, স্যার? চারদিকে তো পুলিস দেকচি খালি! প্রাণে বাঁচিয়ে শেষ কালে ধরিয়ে দিলেন, স্যার? আপনি তাহালে পুলিসের লোক।'

মিলিটারি পুলিস গাড়ি আটকাল। আবদুল হাইয়ের বাড়িটা চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে আর্মড ফোর্স। খুব সম্ভব মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের আদেশে। আইডেন্টিটি কার্ড বের করে দেখাল রানা। শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেল সার্জেন্টের। খটাশ্ করে বুটে বুট ঠুকে স্যালুট করল সে। গাড়ি গিয়ে থামল সোজা আবদুল হাইয়ের গাড়ি-বারান্দায়।

'আমি পুলিসের লোক নই, গিলটি মিঞা। এরাও কেউ পুলিস নয়—মিলিটারি। তোমার ভয়ের কিছু নেই। নেমে এসো আমার সঙ্গে।'

চোখ ছানাবড়া করে চেয়ে রইল গিলটি মিঞা রানার দিকে। কয়েক সেকেন্ড কোনও কথা বলতে পারল না। তারপর বলল, 'অনেক অন্যায় কতা বলে ফেলেচি, স্যার, মাপ করবেন। আপনাকে আমারই মতন চোর-ছ্যাঁচোর ভেবে...'

'ওসব ভুলে যাও, গিলটি মিঞা। আমাদের হাতে সময় নেই। নিশ্চিন্তে চলে এসো।'

বেরিয়ে এল গিলটি মিঞা গাড়ি থেকে। রানার পিছন পিছন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে এল ড্রইংরুমে। রানার অনুরোধেও বসল না সে, দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ সরল নিষ্পাপ দুই চোখ মেলে।

দরজার কাছে একজন ইউনিফর্ম পরা লোককে কি যেন বলল রানা। খট্‌খট্ জুতোর শব্দ তুলে চলে গেল লোকটা।

'শোনো, গিলটি মিঞা। তোমাকে ছেড়ে দিলে কতক্ষণ ওদের হাত থেকে বেঁচে থাকতে পারবে বলে মনে করো?'

'ছেড়ে দিয়ে দেকুন না, স্যার। একবার ধরে লিয়েচে বলেই কি বারবার? আমার ন্যাজের কাচেও তো আসতে পারবে না ওরা আর। থ্রি-সেবেনটি নাইন করি আজ বত্রিশ বচোর...'

'আচ্ছা, আরেকটা কথা। সৈয়দ ওয়ালিউল্লা চৌধুরী—এতবড় নামটা যদি তোমার স্যাঙাৎ ভুলে গিয়ে থাকে, তাহলে কি নামে পাঠাবে সে জিনিসটা?'

চমকে উঠল গিলটি মিঞা। বিস্ময় ফুটে উঠল ওর চোখে। হঠাৎ অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে। বলল, 'হায় খোদা! এই সামান্য কতাটা

একবার যদি মাত্রায় আসত! ঠিক বলেছেন, স্যার, তাই হয়েছে। গিলটি মিঞার নামেই ও পেটিয়েছে যন্ত্রোরটা। উহ্! কী অকত্য অত্যোচারটা...'

'শোনো, গিলটি মিঞা, আমাদের পেছনে লোক লেগে গেছে তা তো দেখতেই পেয়েছ। ওই কালো গাড়িটা নিয়ে সেজন্যে আমার মত দেখতে একজন লোক চলে গেছে পাহাড়তলীর দিকে। আরেকজন লোক আরেকটা গাড়ি নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে ওই বড় রাস্তার ওপর। এখুনি বেরুতে হবে আমাকে। পিছন দরজা দিয়ে গোপনে বেরিয়ে যাব আমরা। কোথায় নামতে চাও তুমি?'

'যেখানে খুশি ছেড়ে দিন আমাকে, স্যার। এক মিনিটে হাওয়া হয়ে যাব।'

'বেশ, চলো তাহলে।'

দশ মিনিট পর আতর ডিপোর এক গলির মুখে নামিয়ে দিল রানা গিলটি মিঞাকে। রানার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে পিছন ফিরল গিলটি মিঞা। কয়েক পা গিয়েই থামল রানার ডাকে। দশ টাকার দুটো নোট এগিয়ে দিল রানা।

'তোমার পেটে তো দানাপানি পড়েনি কিছুই গত তিনদিন। পয়সাও নেই পকেটে। এটা দিয়ে কিছু কিনে খেয়ে নাও গিয়ে।'

চুপচাপ টাকাটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল গিলটি মিঞা। ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠল ওর সরল নিষ্পাপ চোখ দুটো। এত মারেও যার চোখ থেকে একফোঁটা পানি পড়েনি সেই গিলটি মিঞারই গাল বেয়ে মাটিতে ঝরে পড়ল দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু। হঠাৎ ঘুরে বাম পা-টা টেনে টেনে অদৃশ্য হয়ে গেল সে ভিড়ের মধ্যে।

তিন

পোস্ট অফিস থেকে প্যাকেটটা নিয়ে ফিরে এল রানা হাইয়ের বাংলোয়।

প্যাকেট থেকে বেরোল অদ্ভুত একটা পিনিয়ান জাতীয় পার্ট। কোন্ মেশিনের পার্ট বোঝা গেল না। একটা জায়গায় ই এল ৩১৫৭ এবং মেড ইন জার্মানী লেখা। এই ছোট্ট জিনিসটার কী এমন গুরুত্ব থাকতে পারে যে প্রাণ যেতে বসেছিল গিলটি মিঞার?

ডিনার খেয়ে নিয়ে আরাম করে বসল রানা আরামচেয়ারে। কফির কাপ হাতে নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। এই কয়দিনের প্রত্যেকটি ঘটনা মনে মনে খুঁটিয়ে দেখে বুঝতে পারল, গোলাম হায়দারের বিরুদ্ধে একটি প্রমাণও আবিষ্কার করতে পারেনি সে।

আশ্চর্য! কোনও প্রমাণ নেই রানার হাতে। অথচ প্রমাণ ছাড়া এতবড় একজন লোককে খামোকা হেনস্তা করলে হুলস্থূল পড়ে যাবে সারা দেশে।

প্রমাণ তো দূরের কথা, কিসের প্রমাণ সে চায় তা-ও জানা নেই রানার। কিছু একটা করছে গোলাম হায়দার। ভয়ঙ্কর কিছু। অন্য দেশের প্রত্যক্ষ সাহায্য আছে ওর পিছনে। কিন্তু কি সেই জিনিস? কি করছে বা করতে যাচ্ছে গোলাম হায়দার?

নিজের বিশ্রী বেকায়দা অবস্থার কথা চিন্তা করে রাগ হলো রানার। আত্মরক্ষা ছাড়া কিছুই করবার নেই ওর এখন। নির্বিচারে আক্রমণ করে চলেছে গোলাম হায়দার যেদিক থেকে খুশি। কিছুই বলতে পারবে না সে উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া। রানার যদি মৃত্যুও হয় এই আক্রমণের মুখে, কারও কিছু করবার নেই।

কিন্তু তাই বলে যা খুশি তাই করবে নাকি গোলাম হায়দার? বেশি সময় এবং সুযোগ পেলে ভয়ঙ্কর কিছু করে বসবে। যে করেই হোক ঠেকাতে হবে ওকে। আগামীকাল কক্সবাজার রওনা হবে রানা। কিন্তু তার আগে আজ একবার দেখা হওয়া দরকার গোলাম হায়দারের সঙ্গে।

উঠে দাঁড়াল রানা। হঠাৎ সামনের টেবিলে একটা ছায়া দেখতে পেয়ে পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল। আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে দাঁড়িয়ে রয়েছে গিলটি মিঞা।

'চিন্তে করচেন বলে ডিস্টাব করলুম না, স্যার। বিশ মিনিট ধরে ডেঁড়িয়ে রইচি।'

'ঢুকলে কি করে তুমি এই বাড়িতে, গিলটি মিঞা?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রানা। 'চারপাশে মিলিটারি পাহারা দিচ্ছে। কেউ বাধা দিল না তোমাকে?'

'দিত স্যার, দেকতে পেলেই ঐটকে দিত। তাই লুকিয়ে চলে এলুম।'

যেন এমন কিছুই কাজ করেনি, এমনি স্বাভাবিক ভাবে কথাগুলো বলে গেল গিলটি মিঞা; অথচ ধরা পড়লে যে ওরা গুলিও ছুঁড়ে বসতে পারত সে জ্ঞানটুকুও আছে ওদিকে টনটনে।

'তা কি ব্যাপার? হঠাৎ চলে এলে যে?'

'জিনিসটা রাকতে এলুম।' পকেট থেকে কালো রঙের ছোট্ট একটা বাক্সমত কি যেন বের করল গিলটি মিঞা। একটা বোতাম টিপতেই ডালা খুলে গিয়ে একখানা সাইমা টাইম পিস বেরিয়ে পড়ল। এবার চিনতে পারল রানা। গত বছর হংকং থেকে নিয়ে এসেছিল সে ওটা আবদুল হাইয়ের জন্যে। কী খুশিই না হয়েছিল সে ওটা পেয়ে! ঘড়িটাকে গিলটি মিঞার পকেট থেকে বেরোতে দেখে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল রানা ওর মুখের দিকে।

'ওই টেবিলটার দু'লম্বর দারাজের ভেতর ছিল, স্যার। লোভ সামলাতে না পেরে ম্যানেজ করে ফেলেছিলুম। মনটা বড় খুঁত খুঁত করতে লাগল, স্যার। তাই ফেরত দিতে এলুম।'

'তুমি ওটা চুরি করেছিলে?'

'আমি একে চুরি বলি না, স্যার। একটা সকের জিনিস, সক হয়েচে

লিয়েচি। চাইলে দেবে না, কিনবার পয়সা নেই—অতচ সক হয়েছে। কি করবে তখোন মানুষ, বলুন? যে যা চাইচে সে যদি তাই পেত তাহলে সব চোর ব্যামো হয়ে মারা যেত, স্যার। আর আমার নামও গিলটি মিঞা হত না।'

'কেন, নামটা তো ভালই লাগে আমার কাছে,' বলল রানা মৃদু হেসে।

'আমার ওস্তাদ নামটা দিয়েছিল বলে আপত্তি করিনি—আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগে না, স্যার। গিলটি কতাটার মানে ভাল না। একুশ দফা কাঠগড়ায় ডেঁড়িয়ে এই কতাটা স্বীকার যেতে হয়েচে আমাকে বিচারের শেষে। পাঁচবারের বার বিরক্ত হয়ে উটলুম, স্যার। ঘণ্টা ভর মিচে প্যানর প্যানর যাতে শুনতে না হয় তাই কাটগড়ায় ডেঁড়িয়েই বলে উটলুম—গিলটি। শুনে তো আমার ওস্তাদ হেসেই খুন। সঙ্গে সঙ্গে নাম দিয়ে দিলে গিলটি মিঞা। ও নামটা আমার পচোন্দ নয়, স্যার।'

কথা শুনতে শুনতে জামা কাপড় পরতে আরম্ভ করে দিয়েছিল রানা। এগিয়ে এল গিলটি মিঞা।

'কোতাও চললেন নাকি স্যার, আবার?'

'হ্যাঁ, একটু বেরোতে হবে।'

'রাস্তার দু'মাতায় চারজন করে লোক ভোয়ের আচে, স্যার, আপনার জন্যে। এইসব দারোয়ানগুলোর ভয়ে এগোতে পারচে না। তাছাড়া রাত হয়েছে নটা-দশটার কম নয়। এখন বেরোনো কি ঠিক হচ্চে?'

'তোমাকে কে আমার গার্জেন বানাল, গিলটি মিঞা?'

'তোবা, তোবা! এ আপনি কি বলচেন, স্যার? আমি আপনাকে বারণ করবার কে? তবে কিনা এখান থেকে বেরোবার একটা গোপন রাস্তা আমার জানা আচে—তাই বলছিলুম···'

'বেশ, সেই গোপন রাস্তা দিয়ে সোজা বেরিয়ে যাও। তোমার সাহায্য আমার দরকার হবে না।'

নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না গিলটি মিঞার। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রানা আবার বলল, 'কি হে, ডেঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও।'

'রাগ করলেন, স্যার? বেয়াদবি হয়ে থাকলে নাহায় জোড়হাত করচি মাপ করে দিন, চুকে যাক ন্যাঠা।' রানার কোন উত্তর না পেয়ে যোগ করল 'আর যদি সিদে আঙুলে ঘি না ওটে, তাহালে পা চেপে ধরব বলে দিচ্চি, শেষকালে লজ্জায় পড়ে যাবেন, স্যার।'

হেসে ফেলল রানা। আচ্ছা পাল্লায় পড়েছে সে।

রানাকে হাসতে দেখে দ্বিগুণ জোরে নিজেই হাসতে আরম্ভ করল গিলটি মিঞা। বলল, 'হাসলে বড় সুন্দর দেখায় আপনাকে, স্যার। একেবারে উত্তম কুমারের মত।' রানাকে গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে বলল, 'না না, দিলিপ কুমারের মত।' তাতেও যখন রানা খুশি হলো না তখন অন্য কোন নাম বলতে যাচ্ছিল গিলটি মিঞা, হাত তুলে থামতে বলল ওকে রানা।

'একটা কাজ করতে পারবে, গিলটি মিঞা?'

'একশো বার পারব। আমার অসাধ্য কিছুই নেই, স্যার। পরীক্ষে করে দেকুন।' মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল সে।

জুতোর গোড়ালি থেকে চাবির ছাপ তোলা কাগজ বের করে দিল রানা ওর হাতে। উল্টে-পাল্টে পরীক্ষা করে দেখল সেটা গিলটি মিঞা।

'কি জিনিস এটা বলো তো?'

'একটা চাবির ছাপ তুলেচেন, স্যার। ভাল কায়দা হয়েছে। যন্তোর পেলে দু'মিলিট লাগবে আমার চাবিটা তোয়ের করতে।'

'কাল সকালে চাবিটা বানিয়ে নিয়ে আসতে পারবে?'

'পারব।'

'আচ্ছা, আরেকটা কাজ আছে। তুমি তো খলিফা লোক, ভাল কোনও এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের হেড মেকানিকের সাথে আলাপ আছে?'

'আচে। না থাকলেই বা কি? আলাপ করে নিতে কতক্ষণ?'

গিলটি মিঞার চুরি করা পার্টটা দিল রানা এবার ওর হাতে।

'জেনে আসবে কোন্ মেশিনের পার্ট এটা, কি কাজে লাগে।'

'ঠিক আচে, স্যার; এ তো সামান্য কাজ। সব খবর পাবেন আপনি কাল।'

'আর গোপনে ঢুকবার চেষ্টা কোরো না দিনের বেলা। আমি বলে রাখব গার্ডদের। আটকাবে না তোমাকে। বুঝলে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গিলটি মিঞা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

আধ ঘণ্টা পর রানাও বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

চার

ঠিক সাড়ে দশটায় ঢুকল রানা সেইলার্স ক্লাবে। চোখ তুলে চাইল শুধু গোলাম হায়দার, যেন চিনতেই পারেনি এমনি ভাবে খেলায় মন দিল।

লাল ওপেল রেকর্ডটা নিয়ে এসেছে রানা। ঠিকই বলেছিল গিলটি মিঞা। চারজন গুণ্ডা কিসিমের লোক দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তার মোড়ে একটা সাদা করোনার গায়ে হেলান দিয়ে; রানা বিশ গজ যেতে না যেতেই টপাটপ উঠে পড়েছে ওরা গাড়িতে। পিছন পিছন ওরাও এসেছে এখানে। সারি সারি গাড়ি আর ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্লাবের সামনে। এন্ট্রান্স থেকে বেশ খানিকটা দূরে পার্ক করতে হয়েছে রানার গাড়ি।

কয়েক দান রুলেত খেলে হারল রানা। আজ কপালটা প্রসন্ন নেই। একটা টেবিলে বসে কফির অর্ডার দিল সে। বাকারাত খেলছে গোলাম হায়দার। বেঁটে দেয়া তাসগুলো তুলল গোলাম হায়দার—দেখল এক নজর,

কার্ড চাইল। তাঁবুর তলায় চলে এসেছে চারজন অনুসরণকারী। গোলাম হায়দারের আশপাশে ভিড় করে খেলা দেখছে ওরা। রানার দিকে চেয়ে অদ্ভুত বাঁকা রহস্যময় হাসি হাসল গোলাম হায়দার। জুতো মেরে ওর দাঁত ক'টা খসিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করল রানার—কিন্তু উপায় নেই।

এতক্ষণে ইন্ডিয়ান নেভির লোকগুলো নিশ্চয়ই অদৃশ্য হয়ে গেছে। আন্দরকিল্লার টাকা ভর্তি ঘর নিশ্চয়ই খালি হয়ে গেছে। কোনও দিক দিয়ে আটকানো যাবে না গোলাম হায়দারকে। কাজেই আক্রমণের সুযোগ দিতে হবে ওকে। এই আক্রমণের সময়েই হয়তো কোনও দুর্বলতা আবিষ্কার করে ফেলবে সে। এ ছাড়া আর উপায় কি? হেড অফিসও সেই নির্দেশ দিয়েছে—প্রোটেকশন নিয়ে আক্রমণের সুযোগ দাও। মূল উদ্দেশ্য বের করে ফেলো কোনও দুর্বলতার সুযোগে।

গোলাম হায়দারের কাছ থেকে সরে গেল চারজন লোক। চারজন ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। একেক টেবিলে দর্শক সেজে দাঁড়িয়ে গেল ওরা। কিন্তু প্রত্যেকের সদা সতর্ক দৃষ্টি রইল রানার ওপর। ঘরের চারদিকে চাইল রানা। আরেকটা পরিচিত মুখ দেখতে পেল সে। হ্যাংলা মত লম্বা লোক। ছোট ছোট দুই চোখের কোলে কালি পড়েছে। কিংবা হয়তো মোটা কাঁচের চশমা পরেছে বলে ওরকম দেখাচ্ছে। একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নখ থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ময়লা বের করছে লোকটা ম্যাচের কাঠি দিয়ে। গোলাম হায়দারের ইয়টে দেখেছে রানা ওকে।

অনেক লোক। ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সবাই কপাল ফেরাবার জন্যে। গোলাম হায়দারের আর কয়জন লোক আছে এখানে? ঠিক বুঝতে পারল না রানা। হঠাৎ মনে পড়ল ওর আইভরির কথা। ওর কাছ থেকে তো কিছু সংবাদ জানা যেতে পারে! উঠে দাঁড়াল সে। সঙ্গে সঙ্গেই হেলান দেয়া লোকটা সোজা হয়ে গেল।

পাকা দালানটার দিকে কয়েক পা এগিয়েই টের পেল রানা, পিছন পিছন আসছে চশমা পরা লোকটা। শেমিন দে ফার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। খেলোয়াড়দের পিছনে চলে গেল সে। সেই লোকটাও আসছে পিছন পিছন। চলতে গিয়ে মড়মড় করে মাজার হাড় ফুটছে লোকটার। ঘুরে দাঁড়িয়ে দুই পা এগিয়ে গেল রানা লোকটার দিকে। নিচু গলায় বলল, 'আর এক পা এগোলে এক ঘুসিতে নাক ফাটিয়ে দেব।'

কোন কথা না বলে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল লোকটা রানাকে। তারপর পাশ ফিরে খেলা দেখতে লাগল। রুলেত টেবিলের কাছে অনেক ভিড়। কাছাকাছি পৌঁছতেই দু'দিক থেকে দু'জন দু'জন করে চারজন ঘিরে ধরল ওকে। সামনে এসে দাঁড়াল সেই চশমা পরা হ্যাংলা মত লম্বা লোকটা।

পিছন দিক ছাড়া আর কোন দিকে যাবার রাস্তা রইল না। কিন্তু এক প পিছনে সরতেই মোটা মত একজন ঠোঁট-কাটা লোক পা মাড়িয়ে ধর রানার। সামনের লোকটা কি যেন বের করছে কোটের পকেট থেকে। হাতট

বেরিয়ে আসতেই চমকে উঠল রানা। চকচকে সূচ দেখা যাচ্ছে একটা কাঁচের সিরিঞ্জের মুখে। দ্রুত চিন্তা চলল রানার মাথার মধ্যে। এ-ধরনের কিছু ঘটতে পারে তা কল্পনাও করতে পারেনি সে। ভিড়ের মধ্যে এর চাইতে ভাল অস্ত্র আর কিছুই হতে পারে না। এই তো ক'দিন আগেও করাচিতে এক সিনেমা হল থেকে বেরোবার সময় শো-ভাঙা ভিড়ে এই একই উপায়ে খুন করা হলো একজন লোককে। পোস্ট মর্টেমের আগে কেউ টেরই পায়নি ব্যাপারটা।

এরা বেমালুম মিশে যাবে ভিড়ের মধ্যে। রানা মেঝেতে পড়ে যেতেই কয়েকজন ছুটে আসবে, টেনে তুলবে, কেউ পানি আনবে, কেউ চেয়ার এগিয়ে দেবে। পাঁচ মিনিটের আগে কেউ টেরই পাবে না যে মারা গেছে সে। সবাই ভাববে সব টাকা হেরে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেছে। আহা-উহু করবে। যখন বুঝতে পারবে যে মারা গেছে লোকটা, তখন আরও উথলে উঠবে ওদের সহানুভূতি। হার্টফেল সম্পর্কে সন্দেহ থাকবে না কারও। ভাববে একদিন ওদেরও এই অবস্থা হতে পারে। কেউ সন্দেহ করবে না যে খুন করা হয়েছে ওকে এত লোকের মধ্যেখানে। রানার হাত চেপে ধরল সামনের লোকটা।

রুলেত টেবিলে ক্রুপিয়েই চিৎকার করে উঠল, 'সেভেনটিন। রেড। লো অ্যান্ড অড।'

একটানে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পাশ ফিরল রানা। চেপে ধরবার চেষ্টা করল ওকে একজন পাশ থেকে। এগিয়ে আসছে সিরিঞ্জটা। গা ঝাড়া দিয়ে লাফ দিল সে পিছন দিকে। চিৎকার করে উঠল, 'জিতেছি! সব আমার!'

দশ জোড়া চোখ এসে পড়ল রানার ওপর। একটু থমকে গেল গোলাম হায়দারের লোকগুলো। সিরিঞ্জটা চলে গেল লম্বা লোকটার পকেটে। ছুটে টেবিলের কাছে গিয়ে প্লেকগুলো গুছাতে আরম্ভ করল রানা। আপত্তির ঝড় উঠল টেবিলের চারপাশ থেকে।

'কিন্তু জনাব···'

ভদ্রভাবে শুরু করতে যাচ্ছিল একজন। কর্কশ কণ্ঠে রানা বলল, 'এই দান আমার।'

'কি যা-তা বলছেন? ছেড়ে দিন ওগুলো। দান আমার!'

'ক্রুপিয়েই! এই অন্যায়···' নালিশ জানাতে চাইল রানা।

'মিথ্যুক কোথাকার! আমি প্লেক রেখেছি এই ঘরে।'

কয়েক সেকেন্ডেই গোলমাল বেধে ভণ্ডুল হয়ে গেল খেলা। সবাই মিলে বোঝাবার চেষ্টা করছে রানাকে যে ভুল হয়েছে ওর, কিন্তু উত্তরোত্তর খেপে উঠতে থাকল রানা। কিছুতেই বুঝবে না সে।

'সব চোর। আমি জানি। সবাই মিলে সাট করে আমার টাকাগুলো মেরে দেবার চেষ্টা করছে। আমি সেক্রেটারির সাথে দেখা করব।' জেদ ধরল রানা।

ক্লাবের মধ্যে এই ধরনের হুলস্থূল কাণ্ড হলে ক্লাবের বদনাম হয়।

লোকটাই না অনুসরণ করেছিল ওকে? হ্যাঁ, এইবার পরিষ্কার চিনতে পারছে রানা ওকে। সে-ই।

দ্রুত স্পীড বেড়ে যাচ্ছে গাড়িটার। সামনের এবং পিছনের সীট আলাদা হয়ে গেছে কোথা থেকে এক কাঁচের পার্টিশন এসে। কাঁচটা সরাবার চেষ্টা করল রানা। একচুলও নড়ল না সেটা। দরজার হাতলে চাপ দিল সে উপর-নিচে: ফল হলো না কোনও। লক করা। ড্যাশবোর্ডের একটা রেডিও সেট নাড়াচাড়া আরম্ভ করেছে ড্রাইভার। বাম হাতে ধরা একটা মাউথ পিসে কিছু বলল সে। কি বলল বুঝতে পারল না রানা। এক মিনিট পর সুইচ অফ করে দিয়ে ড্রাইভিং-এ মন দিল সে। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ। তারপর মৃদু খড়খড় শব্দ শুনতে পেল রানা স্পীকারের। পরমুহূর্তে ভেসে এল গোলাম হায়দারের কণ্ঠস্বর।

'কেমন বোধ করছেন, মিস্টার মাসুদ রানা? নিশ্চিন্তে বসে দু'পাশের দৃশ্য দেখুন। গাড়ি থেকে বেরোবার কোন উপায় নেই—চেষ্টা করলে শুধু শুধুই জখম হবেন। আপনাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে: ভয় পাবেন না। আজই রাতে দেখা হবে আপনার সঙ্গে। তারপর লম্বা এক টুরে যাব আমরা। ভাল কথা, ট্যাক্সির ভাড়াটা আমিই দিয়ে দেব, আপনার দিতে হবে না। আর একটা দুঃসংবাদ আছে। সিরিঞ্জ হাতে যে ডাক্তারটা ঘুরছিল আপনার পিছন পিছন, খুব সম্ভব এতক্ষণে মারা গেছে সে। ওর কিছু বন্ধু-বান্ধব যদি আপনার সঙ্গে ভদ্রতা বজায় রাখতে না পারে তাহলে দয়া করে নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন।'

খট্ করে শব্দ তুলে নীরব হয়ে গেল লাউডস্পীকার। চারদিক নিস্তব্ধ। চাকার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কেবল মৃদু।

প্রচণ্ড এক লাথি মারল রানা আন্‌ব্রেকেবল্ গ্লাসের পার্টিশনের ওপর। সীটের পিঠে হেলান দিয়ে আবার দুইপায়ে একসাথে লাথি মারল সে প্রাণপণ শক্তিতে। কেঁপে উঠল পার্টিশনটা, ওপর থেকে খসে পড়ল একটা কব্জা। আবার জোড়া পায়ের লাথি চালাল রানা।

এবার ভয় পেল ড্রাইভার। বারবার পিছন ফিরে চাইছে সে। চতুর্থ লাথিতেই চড়াৎ করে ফেটে গেল কাঁচ। স্টীলের পাত বসানো সোলের লাথি সহ্য করতে পারল না সেটা। ভেঙে পড়ল খানিকটা জায়গা। যতটা সম্ভব সামনের দিকে ঝুঁকে রইল ড্রাইভার আত্মরক্ষার তাগিদে, কিন্তু স্পীড কমাল না। আরেক লাথিতেই বেশ খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল ভাঙা জায়গাটায়। এবার ড্রাইভিং সীটের পিছনে পড়ল একটা লাথি। দুলে উঠল গাড়িটা। কাঁচের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে স্টিয়ারিং হুইলটা চেপে ধরে ঘুরাবার চেষ্টা করল রানা। দুইহাতে টেনে সোজা করে ফেলল ড্রাইভার গাড়িটা আবার। জনশূন্য রাস্তার ওপর মাতলামি শুরু করল গাড়ি। একবার রাস্তার বামে যায়, একবার ডাইনে। রানার কাঁধের ধাক্কায় আরও খানিকটা কাঁচ ভেঙে পড়ল। একটা মোড়ের কাছে এসে পড়েছে ওরা এখন। ধাঁই করে লোকটার নাকের ওপর

একটা থাবড়া লাগিয়ে দিয়ে জোরে চেপে ধরল রানা স্টিয়ারিং। প্রাণপণে দুইহাতে টেনে বাঁকাবার চেষ্টা করল ড্রাইভার স্টিয়ারিং হুইল, শেষে বিপদ বুঝতে পেরে ব্রেক করল। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। ফুটপাথের ওপর উঠে গেল গাড়িটা। তারপর নেমে গেল ডিচের মধ্যে। চাকাগুলো আকাশের দিকে তুলে পিঠের ওপর ভর করে চিৎ হয়ে গেল গাড়ি নর্দমার মধ্যে উল্টানো গুবরে পোকার মত।

গাড়িটা নর্দমায় নামার ঠিক আগের মুহূর্তে পিছনের সীটের গদির ওপর শুয়ে পড়েছে রানা। প্রবল ঝাঁকুনির চোটে একবার দরজায় একবার ছাতে ধাক্কা খেয়ে হতভম্ব হয়ে গেল সে। কয়েকটা জায়গায় কেটেছে—কিন্তু ভাঙেনি কোথাও। কোটের ডান হাতাটা নিচ থেকে নিয়ে কনুই পর্যন্ত ছিঁড়ে গেছে। আশ্চর্য! গাড়ির এঞ্জিন চালু আছে এখনও। চিৎ হয়ে শুয়ে ফুল স্পীডে চলছে চাকাগুলো। একটা হেড লাইট জ্বলছে। সেই আলোর সামনে দিয়ে একজন লোককে হামাগুড়ি দিয়ে সরে যেতে দেখে সংবিৎ ফিরে পেল রানা। ড্রাইভারটা। দরজা খুলে ছিটকে পড়ে গিয়েছিল সে বাইরে। খুব সম্ভব ওর ওপর দিয়েই এক গড়ান দিয়ে চিৎ হয়েছে গাড়ি। সারা দেহ ক্ষত-বিক্ষত, মুখটা ব্যথায় বিকৃত, কপাল কাটা।

মোড়ের ওপর একটা প্রকাণ্ড শিরীষ গাছ আলোকিত হয়ে উঠেছে। তারমানে একটা গাড়ি আসছে সেইলরস্ ক্লাবের দিক থেকে। সেই চারজন লোক আসছে না তো?

দু'পাশের দরজা খুলবার চেষ্টা করল রানা। বন্ধ। কাঁচের ভাঙা জায়গাটা দিয়ে গলে ড্রাইভারের পাশের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল রানা বাইরে। প্যাচপ্যাচে কাদা। জুতো বসে যেতে চাইছে। মোড় নিয়েছে সেই গাড়িটা। এই গাড়ির হেড লাইট কি দেখে ফেলেছে ওরা? লাথি দিয়ে হেড লাইট নিভিয়ে দিল রানা। দ্রুত পালাতে হবে এখন। যদি ওরা এই আলো দেখে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই খোঁজ করবে। ধরা পড়লে চারজনের সাথে পারবে না সে একা।

নর্দমার উঁচু পাড়ের কাছাকাছি এসেই চট্ করে মাথা নিচু করল রানা। ঝটাং করে গাড়ির দরজা বন্ধ করবার শব্দ পাওয়া গেল। গাড়ি থেকে যে তিনজন লোক নেমে আসছে তাদের প্রত্যেকের হাতেই পিস্তল।

আর দেরি করল না রানা। মাথা নিচু রেখে ছুটল কাদার মধ্যে দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব। বিশ গজ দৌড়ে এসে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরল রানা। টর্চের আলোয় ড্রাইভারের রক্তাক্ত মুখটা দেখতে পেল সে। দুটো ছায়ামূর্তি এগিয়ে গেল গাড়িটার দিকে সতর্ক পদক্ষেপে। রানার পায়ের ছাপের ওপর টর্চের আলো ফেলল ওরা গাড়ি খালি দেখে। নর্দমার ভিতর লম্বালম্বিভাবে আলো ফেলল এবার। ঝোপের ওপর এসে স্থির হলো আলোটা। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে ওরা এই ঝোপটার আড়ালেই রয়েছে রানা।

আবার দৌড় দিল রানা। পিছনে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এ-বাড়ি ও-

বাড়ির আড়ালে লুকিয়ে এগোতে থাকল রানা। সামনে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। দেখতে পেলেই গুলি করবে ওরা। দ্রুত এগিয়ে আসছে পিছনের দু'জন। আর দাঁড়িয়ে থাকাও যায় না। একটা ডাস্টবিনের মধ্যে ঢুকে বসে পড়ল রানা। দুর্গন্ধ। বমি ঠেলে আসতে চাইছে। দম বন্ধ করে বসে রইল সে। পাশ দিয়ে মাটি কাঁপিয়ে চলে গেল দু'জন লোক। আরও পনেরো সেকেন্ড শ্বাস বন্ধ করে থাকতে পারল সে, তারপরই হুস্ করে বেরিয়ে গেল চেপে রাখা নিঃশ্বাস। ওয়াক্ করে বমি হয়ে যাচ্ছিল, কোনও মতে সামলে নিল সে। মাথা উঁচু করে দেখল বাম ধারের একটা বাড়ির ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল মূর্তি দুটো। একলাফে বেরিয়ে এল রানা ডাস্টবিনের মধ্যে থেকে। হঠাৎ চিনতে পারল সামনের প্রকাণ্ড বাড়িটা। গোলাম চেম্বার।

সুইপারস্ প্যাসেজ দিয়ে ঢুকে পড়ল রানা। পিছনের দরজাটা খোলা। ঢুকেই ডান-পাশে সারি সারি ল্যাট্রিন। লিফটের কাছে এসেই দারোয়ানের কথা মনে পড়ল রানার। গেটে বসে আছে দারোয়ান; ওদিক দিয়ে সুবিধে হবে না। অন্ধকার মত একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চাইল সে। সুইপারস্ প্যাসেজের কাছে পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। আর চিন্তা করবার সময় নেই—লিফটে উঠেই বোতাম টিপল সে টপ ফ্লোরের।

ঠিক তেমনি ভঙ্গিতে বসে আছে আইভরি গিলবার্ট। চমকে উঠল সে রানাকে দেখে। মুখে মেকাপ নেই, তবু চিনে ফেলল। সোজা হয়ে গেল শিরদাঁড়া। কোন কথা না বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

'খুবই দুঃখিত, আইভরি, আমি…'

'চলো, ঘরে চলো।' রানার একটা হাত চেপে ধরল আইভরি। টেনে নিয়ে চলল একটা সুইং-ডোর দিয়ে ঢুকে। দুটো অ্যাপার্টমেন্টের বন্ধ দরজা পেরিয়ে ডাইনে গেলেই শেষ ঘরটা আইভরির। ঘরে ঢুকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল সে দরজায়, তারপর ফিরল রানার দিকে।

'আমাদের জাহাজ ছেড়ে যাচ্ছে তিনদিনের মধ্যেই…' বলতে যাচ্ছিল রানা, বাধা দিয়ে ভ্রূ কুঁচকাল আইভরি।

'থাক্। আর গুল মারতে হবে না। সেদিন সব দেখেছি আমি।' জানালা দিয়ে নিচের রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করল আইভরি। 'এবং পরে সব শুনেছি। কিন্তু একি হাল তোমার বলো তো! সারা গায়ে কাটা দাগ, জামা-কাপড় কাদা মাখা, ছেঁড়া! কি হয়েছে?'

জানালা দিয়ে নিচে চেয়ে দেখল রানা গোলাম চেম্বারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সেই সাদা গাড়িটা। ঠোঁট-কাটা লোকটা নেমে দাঁড়িয়েছে আগেই, এবার পিছনের দরজা খুলে বেরোল লোবাক, সেই সঙ্গে আরও একজন। টর্চ হাতে চতুর্থ একজন লোকও এসে দাঁড়াল ওদের পাশে। দারোয়ানটাও এগিয়ে এসেছে। কি যেন কথা হচ্ছে ওদের মধ্যে।

রানা বুঝল সামনে গিয়ে রানাকে দেখতে না পেয়ে ওরা ধরে নিয়েছে যে রানা এই বাড়িতেই ঢুকেছে। এক্ষুণি তন্ন তন্ন করে এ-বাড়ির প্রত্যেকটা ঘর

খোঁজা শুরু হবে। দ্রুত কোনও উপায় বের করতে না পারলে আবার ধরা পড়বে সে ওদের হাতে। তার মানে অবধারিত মৃত্যু।

'বুঝলাম। লোকগুলো তাড়া করেছিল তোমাকে, এবং অল্পক্ষণেই উঠে আসবে এখানেই খোঁজ করতে। কি বুদ্ধি বের করলে উদ্ধার পাওয়ার?' জিজ্ঞেস করল আইভরি।

'আমার উদ্ধারের কথা পরে ভাবব। আগে তোমার নিরাপত্তা দরকার। তোমার বোনকে পাঠিয়ে দাও রিসেপশনে। ওখানে কাউকে দেখতে না পেলেই ওরা নিঃসন্দেহে ধরে নেবে আমার সঙ্গে তোমার কোনও সাট আছে। সেটা তোমার জন্যে মঙ্গলজনক হবে না।'

মৃদু হাসল আইভরি। বলল, 'আমার বোনকে কক্সবাজার পাঠানো হয়েছে একটা মোটেল ক্রোজ করবার জন্যে। ওকে পাচ্ছি কোথায় যে রিসেপশনে পাঠাব? আমাকেই যেতে হবে। কিন্তু তোমাকে বিদায় না দিয়ে যাব না কিছুতেই। আমার যা হয় হোক। এসো আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'এসোই না। একটা ইমার্জেন্সী এক্জিট আছে। পাঁচ সেকেন্ডে রাস্তার পাশে নেমে যেতে পারবে। ওই দেখো, গাড়িটার চাবি ঝুলছে ইগনিশন্ সুইচ থেকে। কোনও অসুবিধে হবে না।'

অবাক হয়ে চাইল রানা মেয়েটির মুখের দিকে। অদ্ভুত, অস্বাভাবিক লাগল ওর এই অযাচিত সাহায্য। অস্বস্তিও বোধ করল একটু। কিন্তু এগোল সে ওর পিছু পিছু।

একটা বোতাম টিপতেই লম্বা চারকোনা একটা গর্ত সৃষ্টি হলো দেয়ালের গায়ে। একজনের ব্যবহারোপযোগী সরু একটা লিফটের দরজা খুলে গেছে। তেমন কোন বিপদ ঘটলে যেন প্রাণ নিয়ে পালাতে পারে সেজন্যে এই ব্যবস্থা করে রেখেছে গোলাম হায়দার। লোকটা গোড়া থেকেই ক্রিমিনাল মাইন্ডেড।

রানা লিফটের দিকে এক পা বাড়াতেই কোটের ছেঁড়া আস্তিন ধরে টান দিল আইভরি।

'বাহ্! কাজ হাসিল হয়ে গেছে, আর অমনি পালাচ্ছ! একটা ধন্যবাদও দেবে না?'

অদ্ভুত এক টুকরো হাসি আইভরির মুখে। হাসিটা চেনা চেনা লাগল রানার, কিন্তু মনে পড়ল না ঠিক কার হাসির মত। রানার অগোছাল একগুচ্ছ চুল কপাল থেকে সরিয়ে দিল আইভরি।

ওকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল রানা।

আধ মিনিটের মধ্যেই সাঁ করে বেরিয়ে গেল সাদা গাড়িটা হতভম্ব দারোয়ানের চোখের সামনে দিয়ে। ড্রাইভিং সীটে বসে হাসছে কর্দমচর্চিত মাসুদ রানা।

ছয়

গাড়িটা রাস্তার মোড়ে ছেড়ে দিয়ে হেঁটে চলে এল রানা বাংলোয় গার্ডদের অবাক করে দিয়ে। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে আচ্ছা করে ঘষে ঘষে গায়ের ময়লা তুলে ফেলল সে। লাক্সের বদৌলতে দুর্গন্ধ দূর হলো। চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য-সাবান যে কাজের জিনিস সে-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হলো স্পাই-তারকা।

আজকের এত ঘটনার পর মাত্র দুটো তথ্য জানতে পেরেছে রানা। কক্সবাজারে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে আইভরির বোনকে। এবং দূরে কোথাও নিয়ে যেতে চেয়েছিল রানাকে গোলাম হায়দার। কোথায়? কক্সবাজার? নাকি কক্সবাজার আর টেকনাফের মাঝামাঝি জঙ্গলের মধ্যে ওর গোপন আস্তানায়? ওটাই কি ওর আসল ঘাঁটি? কি হয় সেখানে? রানা জানে, শহর থেকে মাইল খানেক দূরে সমুদ্রের ধারে অনেক টাকা ব্যয় করে একটা প্রথম শ্রেণীর মোটেল তৈরি করিয়েছিল গোলাম হায়দার। সেটা হঠাৎ বন্ধ করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল কেন? এপ্রিলের সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ভয়ে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য পিয়াসীরা ভেগেছে নাকি সবাই?

দুত্তোর বলে মাথা ঝাড়া দিল রানা। বাথরুমে দাঁড়িয়ে আবোল-তাবোল চিন্তা করলে কোন প্রশ্নের মীমাংসা হবে না। চিটাগাং বসে থেকেও কোন লাভ হচ্ছে না। কক্সবাজার রওনা হবে সে কাল। যতদূর সম্ভব সমস্ত গোলমালের গোড়া রয়েছে ওখানেই। রানাকে ইয়টের মধ্যে নজরবন্দী রেখে গোলাম হায়দার গিয়েছিল কোথায়? এই কক্সবাজারে। কালই রওনা হবে রানা।

গা-হাত-পা মুছে নিয়ে বেরিয়ে এল রানা। বিছানায় শুয়ে রিডিং লাইটটা জ্বেলে দিয়ে আবদুল হাইয়ের অসমাপ্ত রিপোর্টের শেষ কয়েকটা পৃষ্ঠার ওপর আবার একবার চোখ বুলিয়ে নিল সে। তারপর বাতি নিভিয়ে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্ত মনে। ঘুমের মধ্যেও যে মানুষের মস্তিষ্ক কাজ করে, এবং অদ্ভুত সব জটিল সমস্যার সহজ সমাধান বের করতে পারে একথা বিশ্বাস করে রানা। বহুবার ফল পেয়েছে সে। তাই কঠিন কোন সমস্যা উপস্থিত হলেই অবচেতন মনের হাতে সমস্ত তথ্য তুলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

একটু দেরি করে ঘুম ভাঙল রানার পরদিন সকালে। জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরের ভেতর। চোখ খুলতেই দেখতে পেল আবদুল হাইয়ের হাসি-হাসি মুখটা। দেয়ালে ঝুলছে ওর ছবি। আর কোনদিন এমনি করে হাসবে না আবদুল হাই। হৈ-হৈ করে হাসি গল্পে মুখর করে তুলবে না আর জমজমাট আসর। বুকের ভেতর তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা খেলো রানা। মৃত্যু সে অনেক দেখেছে। এত প্রাণবন্ত সজীব ছিল বলেই বোধহয় ওর মৃত্যুটা এত বেশি করে

বাজছে রানার বুকে। প্রতিশোধ নিতেই হবে। ব্যক্তিগত আক্রোশে পরিণত হয়েছে এখন ব্যাপারটা। উঠে পড়ল রানা বিছানা ছেড়ে।

নাস্তা শেষ করে গরম চায়ের কাপে এক চুমুক দিতেই ঘরে ঢুকল গিলটি মিঞা। পিছনে মিলিটারি সার্জেন্ট। মাথা নাড়তেই অ্যাবাউট টার্ন হয়ে চলে গেল সার্জেন্ট।

'খাকি ডেরেস্ দেকলেই প্রাণটা কেমন আঁইটাই আরাম্ভ করে দেয়, স্যার। ঝাড়া দুটো ঘন্টা এটকে রেকে দিলে—বলে সাহেব ওটেননি একনও। তা বাবা, এটকেচিস ভাল করেচিস, একটা-দুটো কতা বল্। না। বোবা বনে গেল সব। এসব লোক আমি পচোন্দ করি না, স্যার।'

'তোমাকে যে কাজ দিয়েছিলাম হয়েছে?'

'হবেনি কেন, স্যার? আজ পোয্যন্ত যে-কাজ হাতে লিয়েচি, কোন্ কাজটা হোইনি বলুন? এস. পি. সাহেবের ফ্যাশঙের চমশাটা পচোন্দ হয়েছিল—লিয়ে আসিনি সেটা তেতালার ওপর থেকে? কিচ্ছু পরোয়া করি নে, স্যার, আমি—খালি এই শালারাই একটু ঘোল খাইয়ে দিলে। সেদিনকে...'

'তোমার গল্প কে শুনতে চেয়েছে, গিলটি মিঞা? কাজের কথা বলো।'

আহত হলো গিলটি মিঞা। ভেবেছিল ঝাড়া দু'ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকার শোধটা তুলে নেবে রানার ওপর দিয়ে—এ-ও দেখা যাচ্ছে ওদেরই মত। এদের কাছে একটু মন খুলে গপ্পো করবার উপায় নেই—কাজের কথা ছাড়া কিছুই বোঝে না।

'অপসেট মেশিন, স্যার। জার্মানীর হাইডেলবার্গ কোম্পানির টাকা ছাপার মেশিনের যন্তোর। কস্টার সায়েব তো তাজ্জব বনে গেল ও মাল আমার হাতে দেকে। চার বচ্ছোর ওদেশে থেকে পাশ দিয়ে এসেচে কিনা—সব জানে শালা। বলল...'

'আশ্চর্য! তুমি বলছ ঘর ভর্তি টাকা দেখেছ, এই জিনিসটাও দেখা যাচ্ছে টাকা ছাপার মেশিনের পার্ট। তাহলে....'

'ঠিক ধরেচেন, স্যার। কতায় বলে না—বুদ্ধিমান লোকেদের চিন্তেধারা একই রকম। আমার মনেও ঠিক এই কতাই সন্দো হয়েচে। আপনারই মতন...' রানার ভ্রূ সামান্য কোঁচকাতেই হঠাৎ ব্রেক করল গিলটি মিঞা। পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে ধরল রানার চোখের সামনে। 'দেকুন দিকি। আমার সেই স্যাঙাতের কাচ থেকে এই পঞ্চাশটা টাকা চেয়ে লিয়ে এলুম। জাল টাকা।'

থাবা দিয়ে প্রায় ছিনিয়ে নিল রানা সেটা গিলটি মিঞার হাত থেকে। কিন্তু ভাল মত পরীক্ষা করেও কোন খুঁত ধরতে পারল না সে। পকেট থেকে একটা গোল ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে এগিয়ে ধরল গিলটি মিঞা। একগাল হেসে বলল, 'খালি চোকে কিচুই বুজবেন না, স্যার। এইটে দিয়ে দেকুন।'

টেবিলের ওপর নোটটা বিছিয়ে নিয়ে টেবল্ ল্যাম্প জ্বেলে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করেও কিছু বুঝতে পারল না রানা।

'তবেই বুজুন, স্যার! এইতেই প্রমাণ হচ্চে কত পাকা জালিয়াৎ! আপনার মানিব্যাগের তিন নম্বর পরতে যে পঞ্চাশ টাকার লোটটা আচে, সেটা বের করুন, স্যার—আমি বুজিয়ে দিচ্চি···।'

এক মিনিট পর জাল নোট হাতে উদ্‌ভ্রান্ত ভঙ্গিতে পায়চারি ভঙ্গিতে বেড়াতে থাকল রানা ঘরময়। এত টাকা দিয়ে কি করবে গোলাম হায়দার? টাকার অভাব নিশ্চয়ই নেই ওর। তাহলে? কোটি কোটি টাকা বানাচ্ছে কেন ও? রানার সাথে সাথে গিলটি মিঞার দৃষ্টিটা ঘরের এক ধার থেকে আরেক ধার পর্যন্ত ঘোরাফেরা করছিল, হঠাৎ রানা থমকে দাঁড়াতেই চমকে উঠল সে।

'আর চাবিটা?'

'এই যে, স্যার।' পকেট থেকে একটা চাবি বের করল গিলটি মিঞা। 'চাবিটাও ইস্‌পিশাল। এই যে খাঁজটা দেকতে পাচ্চেন, শুদু এইটের পিচনেই পাঁচটি মিলিট নষ্ট হয়েচে।'

হাত বাড়িয়ে চাবিটা নিল রানা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে পকেটে ফেলল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে ধরে প্রথমে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল ওরা, গিলটি মিঞা?'

'গোলাম চেম্বারে। ওখেন থেকে আন্দরকিল্লার সেই বাড়িটায়। তারপর মেরে ফেলবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিল গোলাম ভিলায়।'

'গোলাম হায়দারকে দেখেছ কখনও?'

'ওই যে চোক লষ্ট হয়ে যাওয়া লোকটা তো?'

'হ্যাঁ।'

'দেকেচি। শুদু পয়লা দিন দেকেচি। হঠাৎ দিনদুপুরে রাস্তার ওপর থেকে আমাকে ধরে লিয়ে গিয়ে পয়লা কয়েকজন মিলে খুব ধোলাই করলে। ও মার কত খেয়েচি, ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে ফেললুম, স্যার। ধরে লিয়ে গেল সর্দারের কাচে। অনেক প্রশ্ন করলে সে। অনেক ভয় দেকালে। শেষে পিন দিয়ে নোকের ভেতর ফুটাতেই দু'লাকের কতা স্বীকার গেলুম। আমাকে খুব করে বানাবার হুকুম দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উটে যাচ্ছিল এক চোখো হারামীটা—হটাৎ ধাঁই করে ওর পোঁদে এক লাত্ মেরে দিলুম। তারপর, স্যার, কি বলব, তিনজনে মিলে এমন মার মারলে যে একেবারে মুতে দিলুম।' করুণ মুখ করে চাইল গিলটি মিঞা রানার মুখের দিকে।

'বিয়ে করেছ?' হাসি চেপে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, স্যার, মনের মতন ইস্তিরিলোকই পেলুম না আজ পোযযন্ত। তেমন মেয়ে কই? এই ধরুন গিয়ে একটু ধম্মো-কম্মো করবে, রোজা-নামাজটা ঠিক রাখবে, গায়ের রং আর বয়েস যাই হোক, ভদ্রবংশের অল্পস্বল্প শিক্ষিতা মেয়ে হবে—কোতায়? যা-তা একটা মেয়ের সঙ্গে ঘর করা তো আমার কম্মো লয়। আরটিসের মতন মেজাজ আমার···'

রানা কয়েকটা জিনিস গুছিয়ে তৈরি হয়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ কথার মাঝখানে

থেমে প্রশ্ন করল গিলটি মিঞা, 'কোতাউ চললেন নাকি, স্যার?'

'হ্যাঁ।'

'ঢাকায়?'

'না।'

'তবে কোতায়?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা ওকে বলা ঠিক হবে কিনা। তারপর বলল, 'কক্সবাজার।'

'একা?'

'হাঁ।'

'আমাকে নেবেন?'

আবার এক সেকেন্ড চিন্তা করে রানা বলল, 'না।'

আর কোন প্রশ্ন করল না গিলটি মিঞা। আনমনে কি যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর মুচকে হাসল একটু। বলল, 'আর কোন কাজ আচে, স্যার?'

'না। অনেক ধন্যবাদ, গিলটি মিঞা। অনেক উপকার করেছ তুমি।'

'ওসব বলে লজ্জা দেবেন না, স্যার। আমি তবে আসি একোন, স্যার?'

'এসো।'

কয়েকটা জরুরী টেলিফোন সেরে নিল রানা। গিলটি মিঞা বেরিয়ে যেতেই। তারপর বসল এই ক'দিনের কাজের একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট লিখতে। সেইলারস ক্লাবের সামনে থেকে নিয়ে আসা হয়েছে ওপেলটা। পাঁচটায় বেরিয়ে গেল লাল ওপেল রেকর্ড আব্দুল হাইয়ের বাংলো থেকে। ছ'টায় পার হয়ে গেল দোহাজারী। উড়ে চলেছে সেটা কক্সবাজারের দিকে।

সাত

'...নয় নম্বর মহাবিপদ সংকেত উত্তোলনের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। আবার বলছি। বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ এখন প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আকারে কক্সবাজারের পঁচাত্তর মাইল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় আশি মাইল বেগে উপকূলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আজ রাত সাড়ে আটটার সময় এই ঝড় চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ভোলার উপকূলে প্রবলভাবে আঘাত হানতে পারে। এই ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসেরও আশঙ্কা আছে। উপকূল এলাকার জনসাধারণকে অতি সত্বর নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ভোলার উপকূলে নয় নম্বর মহাবিপদ সংকেত উত্তোলনের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। ঘোষণাটি এখানেই শেষ হলো।'

শিরদাঁড়া সোজা করে বসল অনীতা গিলবার্ট। ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে

গেল ওর। আটটা বাজে। কোন কাজ ছিল না দুপুর থেকে, তাই ঘুমিয়ে পড়েছিল দরজা লাগিয়ে দিয়ে। ঘুম ভেঙেছে সাতটায়। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে সেই দুপুর থেকেই—আরও যেন একটু বেশি মনে হলো। ঘুমের রেশ লেগেই ছিল চোখে। আবার পাশ ফিরে ঘুমাতে গিয়ে হঠাৎ সজাগ হয়ে ঘড়ির দিকে চাইল। বিছানা থেকে উঠে বাথরুমে ঢুকল সে। হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিয়ে অফিস কামরায় বসে মাত্র রেডিওটা খুলেছে—অমনি এই সংবাদ।

কে না ভয় পাবে? আধঘন্টার মধ্যে এসে পৌঁছুচ্ছে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় আর সেই সঙ্গে তার চেয়েও মারাত্মক সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। নিশ্চয়ই দুপুর থেকে এই খবর বারবার করে প্রচার করা হচ্ছে। সবাই সরে গেছে নিরাপদ আশ্রয়ে। ঘুমিয়ে ছিল সে। শহর থেকে এক মাইল দূরে গোলাম হায়দারের বিরাট মোটেলে পড়ে রয়েছে সে একা। মাইল খানেকের মধ্যে একটি জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। এখন যদি এখান থেকে বেরিয়ে দৌড়ও দেয়—আধঘন্টার মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারবে না কোন নিরাপদ জায়গায়। অসহায় একা সে—কয়েকদিনের মধ্যে কেউ জানতে পারবে না যে এই নির্জন মোটেলের মধ্যে মারা গেছে সে। যখন পাওয়া যাবে ওর লাশটা তখন পচে ফুলে দুর্গন্ধ ছুটছে ওর মৃতদেহ থেকে!

হু-হু করে দমকা হাওয়া এসে বন্ধ দরজা-জানালাগুলো একবার ঝাঁকি দিয়ে দেখে গেল কতখানি শক্ত। চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল অনীতা গিলবার্টের।

সমুদ্রের ধারের একটা ঘন শাল মহুয়ার জঙ্গলের মাঝখানে তিন একর জমি পরিষ্কার করে তৈরি করেছিল গোলাম হায়দার এই মোটেল ড্রীম বছর দু'য়েক হলো। কিন্তু জমাতে পারেনি। যে পরিমাণ ব্যয় সেই পরিমাণ আয় হয়নি এতে। সবাই স্বীকার করেছে ওর শিল্পী-সুলভ সৌন্দর্যবোধকে। অর্ধচন্দ্রাকার মোটেলে চল্লিশটা কামরার প্রত্যেকটি কামরা থেকে শাল গাছের ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখা যায়। এক ফার্লং ছায়ায় ছায়ায় হাঁটলেই পৌঁছে যাওয়া যায় সমুদ্রের ধারে। ইচ্ছে হয় বসে থাকো, কাব্যি করো—ইচ্ছে হয় সাঁতার কাটো, স্কিন ডাইভিং করো। সী-বীচের সৌন্দর্য পিপাসু জনসমুদ্র নেই। চমৎকার নিরিবিলি, শান্ত, গম্ভীর পরিবেশ। কিন্তু তবু জমেনি এই মোটেল। প্রাণের ভয় বড় [illegible]। এপ্রিল আর সেপ্টেম্বর এলেই সবাই পালায় এখান থেকে। বছরের মধ্যে চার-পাঁচ মাস একেবারে বন্ধ হয়ে যায় মোটেল।

এবারও মার্চের শেষাশেষি ভেগেছে সবাই। দেড় মাসের জন্যে বন্ধ করে দেবার চার্জ নিয়ে এসেছে এখানে অনীতা গিলবার্ট, সাত দিনের মধ্যে কাজ শেষ করে ফিরে যাবে চিটাগাং। কাজও শেষ হয়ে গেছে প্রায়। সবাইকে টাকা পয়সা দিয়ে বিদায় করে দিয়েছে সে, জিনিসপত্র সব কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিয়েছে। পাঁচটা তিন টনের ট্রাক তিন-চার ট্রিপ দিচ্ছে গত তিনদিন ধরে, সব জিনিসপত্র সরিয়ে নেয়া হচ্ছে এখান থেকে। বেশির ভাগ মাল চলে গেছে,

বিরাট মোটেলটা ফাঁকা হয়ে গেছে একেবারে। আজ দুপুরেই শেষ ট্রাকটা চলে গেছে, আগামীকাল সকালে আসবে। কাল পাঁচটা গাড়ির এক ট্রিপেই সব জিনিস খতম হয়ে যাবে। তালা মেরে দিয়ে চলে যাবে অনীতা মাইক্রোবাসে করে চিটাগাং।

হঠাৎ চমকে উঠল অনীতা। আজই তো এক ট্রিপ দিলে শেষ হয়ে যেত সব জিনিসপত্র—তবে তা করা হলো না কেন? তাছাড়া দুপুরে ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটা অমন ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসছিল কেন? ওরা কি রেডিওর ঘোষণা শুনেছিল আগেই? তাহলে ওকে এখানে একা ফেলে চলে যাওয়ার মানে কি?

কড়াৎ করে ডাল ভেঙে পড়ল কোন গাছের। কেঁপে উঠল অনীতা। সাইক্লোনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে পরিষ্কার। বুকে ক্রস চিহ্ন আঁকল সে। আর রক্ষে নেই। এতদিন করাচিতে বসে খবরের কাগজে দেখেছে সে এই ঘূর্ণিঝড়ের খবর। হাজার হাজার লোকের প্রাণহানি হয় পূর্ব পাকিস্তানের এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে। এবার স্বচক্ষে দেখবে সেটা। কিন্তু এ গল্প কাউকে বলবার আর সুযোগ হবে না কোনদিন।

কেঁপে উঠল সমস্ত বাড়িটা—টিনের ছাত, কার্ড বোর্ডের সিলিং। বাতাসের এক হ্যাঁচকা টানে মড় মড় করে উঠল ছাতটা। মট মট করে শাল গাছের ডাল ভেঙে পড়ছে পাটখড়ির মত। ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা যাচ্ছে সাইক্লোনের। দ্বিতীয় ধাক্কাতেই অফিস ঘরের টিনের ছাত উড়ে চলে গেল। রইল শুধু কার্ড বোর্ডের সিলিংটা।

হঠাৎ দিশেহারার মত ছুটে গিয়ে লাল নিয়নে বড় বড় করে লেখা রুম অ্যাভেইলেবল্ আর নো রুম অ্যাভেইলেবল্-এর কন্ট্রোল সুইচটা নিচের দিকে টেনে দিল অনীতা। 'নো' কথাটা অদৃশ্য হয়ে গেল বিরাট সাইন বোর্ডের উপর থেকে। অনীতা ভেবেছিল ঘর পাওয়া যাবে দেখলে কোন পথিক হয়তো এসে উঠতে পারে। পরমুহূর্তেই নিজের বোকামি বুঝতে পারল সে। সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় আর জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে পথিক আসবে কোত্থেকে?

কাছেই বাজ পড়ল। ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে পড়ল কয়েকটা জানালার কাঁচ। তারপর শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। মুষলধারে পানি নামতে আরম্ভ করল ঘরের মেঝেতে চারপাশের দেয়াল বেয়ে। একটা কাঠের চেয়ারে পা তুলে উঠে বসল অনীতা। মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে সে দুই হাতে কান চেপে ধরে।

কতক্ষণ এইভাবে বসে ছিল খেয়াল নেই অনীতার। আধঘণ্টা পার হয়ে গেছে—তবু আসেনি জলোচ্ছ্বাস। রেডিও বেজেই চলেছে। একটি কথাও ঢুকছে না ওর কানে। হঠাৎ একটা কথায় কান খাড়া হয়ে গেল ওর। এইমাত্র আবহাওয়া অফিস থেকে খবর পাওয়া গেছে, ঘূর্ণিঝড়টা আকস্মিক ভাবে দিক পরিবর্তন করে কক্সবাজারের কয়েক মাইল দূরে থাকতেই পুবে সরে গেছে।

তড়াক করে নামল অনীতা চেয়ার থেকে। এতক্ষণ বসে থাকতে থাকতে

ঝিঁঝি ধরে গেছে পায়ে। কানে চিমটি কাটল সে, কিন্তু ফল হলো না কিছুই। ভাবল, এখানে বসে থেকে লাভ নেই, যে কোন মুহূর্তে ইলেকট্রিসিটি বন্ধ হয়ে গেলে ঘরে ফেরাই মুশকিল হয়ে যাবে। তার চাইতে বিছানায় শুয়ে গায়ের ওপর একটা চাদর টেনে দিয়ে গল্পের বই পড়লে সময়টা কাটবে ভাল। গোটা কয়েক স্যান্ডউইচ নিয়ে গেলেই হবে। ওই খেয়েই রাতটুকু কাটিয়ে দেয়া যাবে। কাফেটেরিয়ার দিকে এগোচ্ছে অনীতা, ঠিক এমনি সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

আঁতকে উঠল অনীতা। কে এল এই দুর্যোগের রাতে? ওহ্-হো! রুম অ্যাভেইলেবল্ তো জ্বালা আছে বাইরে। তাই দেখেই হয়তো কোন পথিক উপস্থিত হয়েছে এসে। হয়তো রাস্তায় গাড়িতে ছিল বলে সাইক্লোনের খবর পায়নি, বাতাসের দুই-একটা ঝাপটা খেয়ে ভেবেছে বেশ চমৎকার হাওয়া ছেড়েছে আজ। যাই হোক, বিনয়ের সঙ্গে মাফটাফ চেয়ে নিতে হবে। দরজা খুলে একটু ফাঁক করল অনীতা। একজন নয়, দু'জন। রেইন কোট গায়ে। টুপিগুলো সামনের দিকে টেনে দেয়ায় অর্ধেক মুখ দেখা যাচ্ছে না। যথেষ্ট ভদ্রতার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বেঁটে লোকটা বলল, 'মিস্ অনীতা গিলবার্ট?'

'জি।' একটু অবাক হলো অনীতা অপরিচিত আগন্তুকের মুখে নিজের নাম শুনে। 'কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখিত, হোটেল ড্রীম এক হপ্তা আগেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।'

'তা জানি। গোলাম হায়দার সাহেবের অনুমতি নিয়েই এসেছি আমরা। আমরা ইনশিওরেন্সের লোক। কাগজ-পত্র সব আছে আমাদের সাথে। কিন্তু এই বিষ্টির মধ্যে বের করলেই ভিজে যাবে। ভেতরে আসতে পারি। জিনিস-পত্র কি আছে না আছে টুকে নিতে এসেছি আমরা।'

একটু ভয় পেল অনীতা। লোক দুটোর মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু কথায় তো মনে হচ্ছে রীতিমত অনুমতি পেয়েছে ওরা কর্তৃপক্ষের। আমতা আমতা করে বলল, 'এই দুর্যোগের রাতে আপনারা হঠাৎ কোত্থেকে এলেন? তার চেয়ে কাল সকালে আসুন না। তাছাড়া আপনাদের আসবার কথা তো আমার জানা নেই। কেউ বলেনি আমাকে যে আপনারা আসছেন।'

'কেউ বলেনি, না?' হো-হো করে হাসল লোকটা। 'এইবার ব্যাটাকে বাগে পেয়েছি। হাসান ড্রাইভারের কাছে রীতিমত চিঠি দিয়ে দিয়েছেন জনাব গোলাম হায়দার আমার সামনে। কালই রিপোর্ট করব আমি—চাকরি যাবে ওর। যাক, ভেতরে ঢুকেই আমাদের পরিচয়-পত্র দেখাচ্ছি। শুধু শুধুই বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে কষ্ট দিচ্ছেন। দরজাটা খুলুন।'

কিন্তু কাউকে ঢুকতে দিতে বারণ করে দিয়েছিলেন মিস্টার গোলাম হায়দার। উনিই যখন পাঠিয়েছেন, তখন…' শিকল নামিয়ে দরজা খুলে দিল অনীতা। দিয়েই বুঝল কতবড় ভুল করেছে সে।

ঠেলা দিয়ে দরজা খুলে অনীতার গায়ের সঙ্গে গা ঘষে ঢুকে এল লোক দু'জন। খুলে ফেলল মাথার টুপি। নাক উঁচু করে বাতাসে দু'তিনবার শ্বাস নিল

লম্বা লোকটা। তারপর কঠিন দৃষ্টিতে চাইল অনীতার দিকে।. সিগারেট খাও তুমি?'

'হ্যাঁ, একটু-আধটু। কেন?' ভয়ে ভয়ে বলল অনীতা।

'ভাবছিলাম সঙ্গে লোক আছে বুঝি।' দড়াম করে দরজা লাগিয়ে শিকল তুলে দিল লোকটা। বল্টুও লাগিয়ে দিল। তারপর রেইন কোট খুলে রাখল দু'জনই একটা চেয়ারের ওপর।

এবার একনজর দু'জনকে দেখেই বিপদ টের পেল অনীতা। পরিষ্কার পেশাদারি গুণ্ডার চেহারা। অল্পদিন হলো বেরিয়েছে জেল থেকে। চেহারায় স্পষ্ট ছাপ পড়েছে কু-চরিত্রের। হেন হীন কর্ম নেই যা এদের দ্বারা সম্ভব নয়। বিশেষ করে বেঁটে মোটা লোকটার চওড়া নাক, ছোট ছোট চোখ আর দেড় ইঞ্চি পুরু বিচ্ছিরি ঠোঁট দেখে প্রথম দর্শনেই ঘৃণা না জন্মে পারে না। অপেক্ষাকৃত লম্বা লোকটার মাথাটা ছোবড়া ছাড়ানো একটা নারকেলের সমান। তাও আবার ওপর দিকটা চোখা। চোখ দুটো ভাসা ভাসা—ভাবলেশহীন। চিবুকটা বেঢপ সাইজের—দুই তিন ভাঁজ হয়ে মাংস ঝুলছে চিবুক থেকে। দুটো দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

শিউরে উঠল অনীতা। বুকের রক্ত পানি হয়ে গেছে ওর।

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল লম্বা লোকটা অনীতার দিকে চেয়ে। এগিয়ে এসে ওর চারপাশে এক পাক ঘুরে পরীক্ষা করল। হঠাৎ মুখের মধ্যে দুই আঙুল পুরে সিটি দিল সে। বেঁটে লোকটাকে চোখ টিপে বলল, 'দেখেছিস, দাগু। আহ-হা! যেমন সামনে তেমনি পেছনে। উহ্! মেরে ফেলেছে, দোস্ত! একদম মার্ঠার (মার্ডার) কেস্। আমি কিন্তু আগে…'

'আহা, থাম্ তো, পিচ্চি। ওসব পরে হবে। আগে যা, কেবিনগুলো সব চেক করে আয় চট্ করে।'

কিন্তু পুলকিত পিচ্চি আনন্দের আতিশয্যে নাচতে আরম্ভ করে দিয়েছে ততক্ষণে। বিচিত্র স্টেপ ফেলে কোমর বাঁকিয়ে টুইস্ট নাচল সে পাঁচ সেকেন্ড, তারপর হঠাৎ বক্সিং-এর স্টেপিং করে 'হুঁঃ হুঁঃ' শব্দ করে মক্ ফাইট্ আরম্ভ করল অনীতার সঙ্গে। দমাদম ঘুসি মারার অভিনয় করছে সে, আর পয়েন্ট গুণছে। যতখানি ভয় পেল তারচেয়ে অনেক বেশি ভয় পাওয়ার অভিনয় করল অনীতা। পায়ে পায়ে পিছিয়ে যাচ্ছে সে। হঠাৎ চটাশ করে এক চড় লাগিয়ে দিল সে পিচ্চির গালে নাগালের মধ্যে আসতেই, তারপর ওদের বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠবার আগেই একটা হালকা চেয়ার মাথার ওপুর তুলে নিয়ে রুখে দাঁড়াল।

খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে উঠল বেঁটে মোটা দাগু।

'হয়েছে, পিস্তল বের করতে হবে না, বুদ্ধু কাহিঁকে! বলেছিলাম না, আমোদ-ফূর্তি পরে হবে! সারা রাতই পড়ে রয়েছে সামনে। যা, তোকে যা বলেছি তাই করে আয় আগে।'

'যাচ্ছি। কিন্তু তোর আল্লার কসম লাগে, দাগু, আগে আগেই গায়ে হাত

দিয়ে বসিস না, দোস্ত। আমার শোধ আমিই নেব। হাগিয়ে ছেড়ে দেবো আজ হারামজাদিকে।'

ভিতর ভিতর হৃৎকম্পন আরম্ভ হয়ে গেল অনীতার। কোন মতে নিজেকে সংযত করে বলল। 'কে তোমরা? এ কোন্ ধরনের অভদ্রতা আরম্ভ করেছ? দেশে কি আইন-শৃঙ্খলা উঠে গেছে নাকি? জানো আমার ওপর কোনও রকম অত্যাচার করলে কাল তোমাদের কি অবস্থা হবে?'

হাসল পিচ্চি। 'কালকের কথা কালকে। আজ রাতের কথা ভাবো, সুন্দরী। তুই মেয়েলোকটাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দে, দাগু, আমি আসছি এক্ষুণি।' চলে গেল সে অনীতার দিকে একবার চোখ টিপে। পিচ্চি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই কথা বলল দাগু।

'ঠিকই বলেছে পিচ্চি। তোমাকে পাহারা দেবার জন্যে পাঠিয়েছে আমাদের গোলাম হায়দার। এদিকে বাঘের ভয় আছে কিনা, তাই।'

'তোমরা তাহলে ইনশিওরেন্সের লোক না?'

'আরে ছোঃ! ওসব দালালীর মধ্যে নেই আমরা। সত্যি বলতে কি কারও চাকর না আমরা আসলে। গোলাম হায়দারেরও না। শুধু একরাতের লেগে ভাড়া করেছে সে আমাদের, তোমার সাথে রাত কাটাবার জন্যে!'

'সাইক্লোনের কথা জানতে না?' মাথার ওপর চেয়ারটা ধরাই রইল অনীতার।

'ওটা নামিয়ে রাখো। হ্যাঁ, সাইক্লোনের কথা জানব না কেন? এতক্ষণ তো সাইক্লোন শেলটারেই ছিলাম। তুফানটা সবে গেল বলেই না আসতে পারলাম। নগদ পাঁচটি হাজার টাকা মার যেত আমাদের আজ ডিউটি করতে না পারলে।'

'একরাত পাহারা দিলে পাঁচ হাজার টাকা?'

'রাতটা যদি ভালয় ভালয় কেটে যায় তো কাল সকালে পাওয়া যাবে আরও পাঁচ হাজার।'

'রাতে কি কোনও বিপদ আশা করছেন গোলাম হায়দার সাহেব?'

'বিপদ না, বাধা।' পুরু ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল দাগু। এর মানে বুঝতে পারল না অনীতা।

দ্রুত চিন্তা করছে অনীতা। এই দু'জনকে যে গোলাম হায়দার পাঠিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন? কালকের জন্যে পরোয়া নেই—আজ এই ঝড় বৃষ্টির রাতে কী বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে ওরা? কেনই বা এত টাকা দেয়া হবে ওদের? কি ঘটতে চলেছে আজ রাতে? এরা যে জেল-খাটা বদমাশ তাতে কোন সন্দেহ নেই, এদের সাথে গোলাম হায়দারের কি সম্পর্ক?

বিশ্রী সব আশঙ্কা উঁকি-ঝুঁকি মারতে আরম্ভ করল ওর মনের মধ্যে। ওকে কি করবে লোকগুলো? খুন? পালাবার চেষ্টা করবে ও? কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে এক মাইল পথ যাওয়ার অনেক আগেই ধরে ফেলবে ওরা ওকে। পুরানো

মডেলের একটা অস্টিন গাড়ি নিয়ে এসেছে ওরা। কাজেই শহরের দিকে গিয়ে লাভ নেই। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লে বাঁচা যাবে না? হয়তো বাঘে ধরবে, কিংবা পথ হারিয়ে না খেয়ে মারা যাবে, কিন্তু পালাতেই হবে ওকে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঝোপ-ঝাড় কাঁটা মাড়িয়ে সমস্ত গা-হাত-পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে ওর—তবু পালাবে সে।

কাউন্টারের পিছনে চলে এল অনীতা। হিটারে পানি চড়াবার ছলে একটা কাঁটা চামচ গুঁজে নিল সে কোমরের কালো বেল্টে। দরজার সামনে বসে আছে দাশু। পিচ্চির পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এই সুযোগ। একলাফে চলে গেল অনীতা পিছনের কাঁচ ভাঙা জানালাটার কাছে। খুট করে শব্দ হতেই চোখ পড়ল দাশুর কাউন্টারের দিকে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। এক লাফে বেরিয়ে গেল অনীতা জানালা গলে। বুম্ করে পিস্তলের গুলির শব্দ পাওয়া গেল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ধরা পড়ল অনীতা পিচ্চির হাতে। আধ মিনিটের মধ্যেই গাড়িটা নিয়ে এসেছে দাশু মোটেলের পিছন দিকে। হেড লাইটের তীব্র আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল কোন্ দিকে ছুটছে অনীতা। থ্রী হানড্রেড মিটার স্প্রিন্ট দিল পিচ্চি তীরবেগে।

হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছল অনীতা জঙ্গলের ধারে। জামা কাপড় ভিজে সেঁটে গেছে গায়ের সঙ্গে। পিচ্ছিল ঘাসের ওপর দিয়ে এতক্ষণ তা-ও দৌড়ানো গিয়েছিল কিন্তু ভিজে আঠালু মাটির ওপর গিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ানোই দুষ্কর হয়ে পড়ল, দৌড়ানো তো দূরের কথা। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল সে। হাঁটু ছড়ে গেল চোখা ডাল আর কাঁটার খোঁচায়। বুঝল, আর বেশি দূর এগোনো যাবে না। পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে পিচ্চির। টাশ্শ্ করে গর্জে উঠল পিস্তল। কানের পাশে ঠক করে শব্দ হলো। গাছের গায়ে ঢুকেছে গুলিটা।

'চলে এসো, সুন্দরী। এর পরের গুলিটা সিধে গিয়ে পাছায় ঢুকবে।'

পিছন ফিরে দেখল অনীতা পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে পিচ্চি। চক্-চক্ করছে হাতের পিস্তল। নীরবে উঠে দাঁড়াল অনীতা। এমন ভাব করল যেন পা পিছলে পড়ে যাচ্ছে। ছুটে এসে ধরতে গেল পিচ্চি ওকে। টাইমিংটা একটু গোলমাল হয়ে গেল অনীতার। হেড লাইটের আলোয় ঝিক্ করে উঠল ওর হাতের কাঁটা চামচ। হাতটা ধরে ফেলে খনখনে গলায় হেসে উঠল পিচ্চি।

'এ যে জাত গোক্ষুর দেখছি, বাবা! আর আমি হচ্ছি, শালা, এক নম্বর হারামী ওঝা।' পড়ে গিয়েছিল অনীতা পা পিছলে। চুলের মুঠি ধরে টেনে খাড়া করে দিল পিচ্চি। 'হাওয়া হয়ে যেতে চেয়েছিলে, সুন্দরী, কিন্তু তোমার সঙ্গে সঙ্গে যে আমাদের দশটি হাজার হাওয়া হয়ে যাচ্ছিল, তার কি? চলো সুন্দরী, স্বপ্নের নীড়ে ফিরে যাই—কোনও কায়দা করবার চেষ্টা করলেই ভেঙে দেব কব্জিটা।'

নিজের ওপর করুণা হলো অনীতার। চোখ ফেটে বেরিয়ে এল কয়েক ফোঁটা গরম পানি। রুদ্ধ কণ্ঠে ফুঁপিয়ে উঠল অনীতা গিলবার্ট।

জানালা দিয়ে ঠেলে ঘরের ভিতর ঢুকানো হলো অনীতাকে। ক্ষুধার্ত শার্দুলের মত পিছু পিছু ঢুকল পিচ্চি। গাড়িটা ঘুরিয়ে রেখে দরজা দিয়ে ফিরবে দাও। ঘরে ঢুকেই অনীতার জামা-কাপড় টানাটানি শুরু করল পিচ্চি। বলল, 'এক মিনিট। দাও শালা এসে পড়বার আগেই···খোদার কসম···'

কাঁচের গ্লাসটা ভেঙে গেল পিচ্চির কপালে লেগে। ফিনকি দিয়ে সরু একটা রক্তের ধারা নামল গাল বেয়ে। লাল হয়ে গিয়েছে পিচ্চির ঘোলাটে দুই চোখ। এমনি সময়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বল্টু ও শিকল তুলে দিল দাও।

মারল ওরা অনীতাকে। অত্যন্ত দক্ষ হাতে যত্নের সঙ্গে মারল, যাতে দেহের কোথাও কোনও কাটা-চেরা দাগ না থাকে। যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখল অনীতা নিজের ঘরের বাথরুমে পড়ে আছে সে কলের তলায়: মাথায় ঠাণ্ডা পানি পড়ছে কল থেকে। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে পিচ্চি, জ্বলজ্বল করছে ওর চোখ দুটো। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসল অনীতা। শরীরটা ভয়ঙ্কর রকম দুর্বল লাগছে। গলগল করে বমি করল সে।

'হ্যাঁ। বমি করে ফেলো, সুন্দরী। তাহলে একটু ভাল বোধ করবে। চানটান করে ভাল কাপড় পরে একেবারে তৈরি হয়ে এসো অফিস কামরায়। আমাদের আগে দু'কাপ কফি খাইয়ে মারধোর করার পেরেশানিটা দূর করো, তারপর টস্ করে দেখা যাবে কার কপালে ঝুলছ তুমি। দাও শালা একটা জানোয়ার। ও চান্স পেলে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। নাও আর তর সইছে না ম্যাডাম, জলদি করো।'

পিচ্চিই জিতল বাজিতে। একগাল হাসি নিয়ে এগিয়ে আসছে সে অনীতার দিকে। পিঠের যিপ ধরে টান দিল নিচে। ঠিক সেই সময় করাঘাতের শব্দ শোনা গেল দরজায়। পাথরের মূর্তির মত জমে গেল সবাই।

আট

'ইয়া আল্লা! কে এল আবার?' পিছিয়ে গেল পিচ্চি। পকেটে হাত চলে গেছে দু'জনেরই।

দাওই সামলে নিল প্রথম। বলল, 'পিচ্চি, তুই পিস্তল নিয়ে তৈরি থাক। আর তুমি এসো এদিকে। কাপড় ঠিক করে নাও আগে। হ্যাঁ, আমাদের যেমন বিদায় করবার চেষ্টা করেছিলে ঠিক তেমনি শিকল তোলা অবস্থায় দরজা একটু ফাঁক করে বিদায় করে দাও ওদের। একটু এদিক-ওদিক হয়েছে কি খুন হয়ে যাবে। একটা ফস্কা কথা যদি বলে বসো তাহলে তুমিও শেষ, আর ওই লোকগুলোও শেষ। মনে রেখো। আমি আছি পেছনে।'

আবার কড়া নাড়ার শব্দ হলো। এবার আরেকটু জোরে। বল্টুটা নামিয়ে

দিল দাও। ঝট্ করে শিকলটাও খুলে ফেলল অনীতা। পিঠের ওপর পিস্তলের নল দিয়ে চাপ দিল দাও। কিন্তু ততক্ষণে দু'পাট খুলে ফেলেছে সে দরজাটা। অনীতা জানে এই অবস্থায় হঠাৎ গুলি করবে না ওরা—কারণ বাইরের লোকটা এমনি অতিথি, না পুলিসের লোক জানা নেই ওদের। সত্যিই, গুলি ছুঁড়ল না কেউ। কিন্তু সবকিছু নির্ভর করছে এখন অজানা অচেনা এই দীর্ঘদেহী আগন্তুকটার ওপর।

প্রথম দর্শনেই চমকে উঠল অনীতা। জেসাস্! এ দেখছি ওদেরই আরেকজন! নিষ্ঠুর একটা মুখ, তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ, ব্যাকব্রাশ করা চুল। চেহারায় একটা কাঠিন্যের ছাপ। ভীত সন্ত্রস্ত অনীতার মুখের দিকে চেয়ে অদ্ভুত সুন্দর করে হাসল লোকটা। মুহূর্তে চিনতে পারল অনীতা।

'রানা! তুমি?' নিজের অজান্তেই বেরিয়ে গেল শব্দ দুটো অনীতার মুখ থেকে।

রানাও কম অবাক হয়নি, কিন্তু সামলে নিয়েছে আগেই। 'কেন? আশা করোনি বুঝি?'

'তুমি হঠাৎ কোত্থেকে?' চোখ টিপল অনীতা।

'চিটাগাং থেকে আসছিলাম। ঝড়ে পড়ে দেরি হয়ে গেল। কোনও হোটেল, মোটেল, কটেজ খোলা নেই। দূর থেকে রুম অ্যাভেইলেবল্ দেখে চলে এলাম।'

'কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আমাদের মোটেল বন্ধ হয়ে গেছে এক সপ্তাহ আগেই। এখানে কোন রুম দেয়া সম্ভব নয়।' তর্জনী দিয়ে ভিতরে ঢুকবার ইঙ্গিত করে আবার চোখ টিপল অনীতা। একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল রানা। ব্যাপার কি!

'কিন্তু আমার গাড়ির একটা চাকা পাংচার হয়ে গেছে। একটা রুম না দিলে তো খুব অসুবিধায় পড়ে যাব।'

'আচ্ছা দাঁড়াও, ইনশিওরেন্স কোম্পানির দু'জন লোক আছে ঘরের মধ্যে, ওদের অনুমতি না নিয়ে কিছুই বলতে পারছি না।' ঘুরে দাঁড়াল অনীতা। এবার রানা দেখতে পেল অনীতার জামার যিপ অর্ধেক নামানো। অনেকখানি বুঝে ফেলল সে। ঢুকে পড়ল সে ঘরের মধ্যে। পিচ্চি এবং দাওর দিকে চেয়েই চোখ দুটো একটু ছোট হয়ে গেল ওর।

'আশা করি সবই শুনেছেন আপনারা। এখানে আমার রাতটা কাটানোয় কোন আপত্তি আছে আপনাদের?'

'আছে,' জবাব দিল দাও। 'আপনিও ভদ্রমহিলার সব কথাই শুনেছেন। মোটেল বন্ধ। অন্য কোথাও জায়গা খুঁজে নিন গিয়ে, এখানে হবে না। চলুন, আপনার চাকা চেঞ্জ করে দিচ্ছি।'

ততক্ষণে ঘরের চারদিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে চেয়ার টেবিলের এলোমেলো ভাব, গ্লাসের ভাঙা টুকরো আর মেঝেতে কাদার দাগ দেখে নিয়েছে রানা। আরও দু'পা ঢুকে এল সে ঘরের ভিতর। বলল, 'আমি ক্লান্ত,

আর কোনও জায়গা খুঁজে নেবার উপায় থাকলে আপনাদের আর কষ্ট দিতাম না। রাতটা আমি এখানেই কাটাচ্ছি। খুব বেশি অসুবিধে হবে তোমার, অনীতা?'

'মোটেও না। আমার কোনও অসুবিধে নেই। রুমও সব খালি পড়ে আছে। ওঁরা এখন রাজি হলেই আমি একটা কামরা খুলে দিতে পারি।'

'জায়গা হবে না বলে দিয়েছি, সোনা মানিক, কেটে পড়ো। আমরা...' রানার জ্বলন্ত দুই চোখের দিকে চেয়ে থেমে গেল পিচ্চি; কথার খেই ধরল দাও।

'চোখ গরম করছেন কেন, সাহেব? হক্ কথাই বলেছে ও। জোর করে থাকবেন নাকি...'

'হ্যাঁ। জোর করেই থাকব। আইনের জোরে। রুম অ্যাভেইলেব্‌ল্ দেখেছি—আমি ক্লান্ত পথিক, আমাকে জায়গা দিতে আপনারা বাধ্য। নইলে মোটেলের লাইসেন্স ক্যান্সেল করিয়ে দিতে পারি আমি।'

'বাব্বা! আবার পাওয়ার দেখায়...'

'তুই থাম্, পিচ্চি। এদিকে এসে কথা শুনে যা একটা।' পিচ্চিকে নিয়ে কিছুক্ষণ গুজুর গুজুর করল দাও। তারপর বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। থাকবেন থাকুন। কিন্তু ওসব ক্যান্সেল ফ্যান্সেলের ভয় দেখাবেন না। গোলাম হায়দার সাহেবেরও অনেক ধরাধরির লোক আছে। আর সাইন বোর্ডে ওরকম ভুল হতেই পারে। তবু যখন এত করে বলছেন, থাকুন। কিন্তু আমাদের কোনও কাজে বেহুদা নাক গলাতে আসলে খামোকা বেইজ্জত হবেন। বোঝা গেছে?'

'খুব। অনেক ধন্যবাদ। আমার সুটকেসটা নিয়ে আসছি আমি এক্ষুণি।'

'আমি সাহায্য করতে পারি,' বলে অনীতাও বেরিয়ে এল বাইরে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে শালগাছগুলোর দুই হাত ওপরে। পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা-কালো মেঘ দ্রুতবেগে উড়ে যাচ্ছে পুবে। দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওদের লক্ষ করছে দাও।

'আমাকে মেরে ফেলছিল ওরা, রানা। ভাগ্যিস তুমি এসে পড়েছ। ভয়ানক কোন প্ল্যান আছে ওদের। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু সাবধান, পিস্তল আছে ওদের দু'জনের কাছেই।'

'টেলিফোন নেই?'

'না। কানেক্শন কেটে দেয়া হয়েছে সাতদিন আগে।'

'তোমার পাশের কেবিনটা দিয়ো আমাকে।'

'তা তো নিশ্চয়ই।'

অ্যাটাচি কেসটা অনীতার হাতে দিয়ে সুটকেসটা বয়ে নিয়ে এল রানা ঘরের মধ্যে। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল দাও। একটা চাবি ছুঁড়ে দিল পিচ্চি রানার দিকে। 'এই যে তোমার ঘরের চাবি—পঁয়ত্রিশ নম্বর।'

অনীতা কিছু বলতে যাচ্ছিল, চোখ টিপল রানা। তারপর বলল,

'ধন্যবাদ।'

'নাম কি তোমার?' জিজ্ঞেস করল পিচ্চি।

'মাসুদ রানা।'

'বানান?'

'খুব কঠিন বানান, তুমি পারবে না। রেজিস্টারটা নিয়ে এসো, আমি লিখে দিচ্ছি।'

'পণ্ডিত লোক মনে হচ্ছে? পেশা কি?'

'পুলিস।'

হাঁ হয়ে গেল পিচ্চির মুখ। জিভ দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চাটল সে একবার। ঢোক গিলে হাসি হাসি মুখ করে দাশুকে বলল, 'শুনলি, দাশু, পুলিসের লোক বলে।'

'তাতে কি হয়েছে? আমরা অন্যায় তো কিছু করি না।' দৃঢ় কণ্ঠে বলল দাশু।

ওদের প্রতি ঔৎসুক্য হারিয়ে ফেলল রানা। অনীতার দিকে চেয়ে বলল, 'কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে, অনীতা? খিদে লেগে গেছে।'

'গোটা কয়েক স্যান্ডউইচ আছে। খেয়ে নাও, কফি বানিয়ে দিচ্ছি।'

'তোমার ভাগটা দিয়ে দিচ্ছ বোধহয়?'

'না। মানে, হ্যাঁ। কাল সকালেই তালা মেরে চলে যাওয়ার কথা। তাই খাবারের কোন ব্যবস্থা নেই। কোনরকমে আধপেট খেয়ে কাটিয়ে দাও রাতটা।'

'এসো দু'জনে ভাগ করে খাই। একটু শক্তি অর্জন করে রাখা দরকার। প্রয়োজন হবে বলে মনে হচ্ছে। যাক, কতদিন পর দেখা, তাই না? আইভরি গিলবার্ট তোমার বোন?'

'হ্যাঁ। ওকে আবার চিনলে কি করে? কাযিন—চাচাত বোন। আচ্ছা! তুমিই সেই বিদেশী নাবিক নাকি, যে ওকে পাগল করে দিয়েছে?'

'কই পাগলামি তো দেখিনি, তবে আমিই সেই নাবিক। ওর মুখেই শুনেছিলাম ওর ছোট বোন আছে ওর সঙ্গে—তোমার কথাই বলেছিল তাহলে। পরে আবার শুনলাম কক্সবাজারে পাঠানো হয়েছে তাকে।'

'হ্যাঁ। গোলাম হায়দারের এই মোটেল ড্রীম বন্ধ করবার জন্যে পাঠানো হয়েছে আমাকে। কিন্তু তুমি হঠাৎ এখানে এসে উপস্থিত হলে কি করে?'

'সে অনেক কথা। শুনে আশ্চর্য হবে, তোমার এবারের এই প্রভুটিও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। বেছে বেছে ওয়ালী আহমেদ আর গোলাম হায়দারের মত প্রভু পছন্দ হয় নাকি তোমার?'

কাজ করতে করতে কথা বলছে অনীতা। একটা প্লেটে দেড় ডজন চিকেন স্যান্ডউইচ বের করল সে ফ্রিজ থেকে। রানার সামনে টেবিলের ওপর সেটা রেখে এক কেটলি পানি চড়িয়ে দিল হিটারে। তারপর ফিরে এসে বসল ... চেয়ারে। কোণের এক টেবিলে বসে নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে আলাপ

করছে পিচ্চি ও দাগু। খেতে খেতে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল অনীতা। সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেল রানার মুখ।

'কিন্তু সত্যি সত্যিই ওরা কি চায় বলতে পারবে, রানা?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে যা আঁচ করছি সেটা সত্যি হলে বড় শক্ত পাল্লায় পড়েছ তুমি এবার, অনীতা।'

'কি আঁচ করছ?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল অনীতা।

'সেটা পরে শুনো। খামোকা ভয় দেখিয়ে দিয়ে লাভ নেই। তাছাড়া আমার অনুমান সত্যি নাও হতে পারে।'

স্যাভউইচ শেষ করে কফির কাপ মুখে তুলতেই দাগু উঠে এল চেয়ার ছেড়ে।

'অনেক রাত হলো, এবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন। কারেন্ট অফ করে দেয়া হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। পঁয়ত্রিশ নম্বর ঘর আপনার।'

'উনি আমার পাশের ঘরে থাকবেন,' বলল অনীতা।

'আজ্ঞে না। আপনার ঘরের দু'পাশের দুটো রুমে থাকব আমি আর পিচ্চি। চিনি না শুনি না, একজন লোককে আপনার পাশের ঘরে আমরা থাকতে দিতে পারি না। ভদ্র মহিলার সম্মান রক্ষা করবার দায়িত্ব আমাদের ওপর। রাত-বিরাতে উঠে উনি গোলমাল আরম্ভ করবেন কিনা কে জানে? সম্পূর্ণ একজন অজানা অচেনা লোক...'

'তুমি না চিনতে পারো, কিন্তু আমি এঁকে বহুদিন ধরেই চিনি। আমার দু'পাশের কামরা যদি তোমরা দখল করে থাকো তাহলে ও আমার ঘরেই থাকবে আজ রাতে।'

'উহ্! ঢং দেখে মরে যাই!' বলে উঠল পিচ্চি দাগুর মাথার ওপর দিয়ে। 'আমি কি দোষ করেছিলাম, সুন্দরী? আমার চেয়ে কোন্ দিক দিয়ে এই লোকটা ভাল হলো?'

হঠাৎ কথা বলে উঠল রানা। 'বেশ, আপনারা দায়িত্বশীল লোক যখন অনীতার ভার নিতে রাজি হয়েছেন তখন আমি পঁয়ত্রিশ নম্বর রুমেই নিশ্চিন্তে ঘুমাব। এসব গোলমাল আমার ভাল লাগছে না। তাছাড়া ঘুমও পেয়েছে খুব।'

'এই তো লক্ষ্মী ছেলের মত কথা!' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল পিচ্চি, পেটের ওপর কনুইয়ের গুঁতো মেরে থামিয়ে দিল দাগু।

'আপনারা কোন্ ইনশিওরেন্স কোম্পানির লোক?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ঈস্টার ফেডারেশান,' বলল দাগু।

হেসে ফেলল রানা। কোম্পানির নামটাও ভাল করে বলতে পারে না—এমনি ইনশিওরেন্স অ্যাসেসার! স্রেফ গুণ্ডা-বদমাইশ ছাড়া আর কোন পরিচয় থাকতে পারে না শুদ্দের।

'কয় লাখের ইনশিওর করা হয়েছে?' আবার প্রশ্ন করল রানা।

এবার উত্তর দিল পিচ্চি। 'তোমার এত খবরের কি দরকার, বাপু? এই সাতদিন আগে ছত্রিশ লাখ টাকার ইনশিওরেন্স করা হয়েছে। হলো? এবার

উঠে পড়ো। আমি লাইট নিভিয়ে দিচ্ছি গিয়ে। শুধু শুধু কারেন্ট পোড়াবার কোন দরকার নেই।'

প্রথমে অনীতার কেবিনে ঢুকল রানা। দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'ব্যাটাদের মতলব কিছু বোঝা যাচ্ছে না। স্থানীয় লোক। গোলাম হায়দারই যে ওদের ভাড়া করে পাঠিয়েছে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। আগে ঘরটা পরীক্ষা করে নিই।' সারাটা ঘর, জানালা-দরজা, ভেন্টিলেটার সমস্ত ভাল করে পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলো সে। 'একমাত্র দরজা ছাড়া ঢুকবার কোন রাস্তা নেই। মাস্টার-কী ওদের হাতে। ল্যাভেটরি পেপার ভিজিয়ে গোঁজ বানিয়ে দিচ্ছি। ওগুলো দরজার নিচে গুঁজে দিলে সহজে খুলবে না দরজা।' বাথরূম থেকে আধ রিল ল্যাভেটরি পেপার ছিঁড়ে নিয়ে পানিতে ভিজিয়ে শক্ত দুটো গোঁজ তৈরি করল সে। লাগাবার কৌশলও শিখিয়ে দিল অনীতাকে। তারপর পকেট থেকে একটা ফোর ফাইভ ক্যালিবারের কোল্ট অটোমেটিক বের করে দিল অনীতার হাতে। 'এটা ব্যবহার করতে জানো?'

'ছোটকালে টয়-পিস্তল ছুঁড়ছি।'

'ব্যস, ব্যস। ওতেই হবে। একটু নিচু করে ধরো গুলি করবার সময়। কোন ভয় নেই তোমার। খুব সম্ভব এটা ব্যবহারের প্রয়োজনই পড়বে না। কিন্তু যদি প্রয়োজন হয় একবার শুধু ট্রিগার টিপলেই দশ সেকেন্ডের মধ্যে পৌঁছে যাব আমি এখানে। বেজেড্রিন ট্যাবলেট খেয়ে নেব আমি ঘরে গিয়ে। ঘুমিয়ে পড়বার ভয় নেই। সর্বক্ষণ সতর্ক থাকব, যে কোন বিপদের জন্যে প্রস্তুত থাকব। তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নাও। তার আগে কয়েকটা কথা মন দিয়ে শোনো। দরজার নিচে গোঁজ তো লাগাবেই, এই টেবিলটা টেনে লাগিয়ে দেবে দরজার গায়ে। টেবিলের-কিনারে দুটো গ্লাস এমন ভাবে রাখবে যেন একটু ধাক্কা লাগলেই মেঝেতে পড়ে ভেঙে যায়। যদি দেখো দরজা ধাক্কাধাক্কি করছে কেউ, তাহলে হ্যান্ডেলটার কাছাকাছি তাক করে গুলি করবে দরজার দিকে।' চলে যাচ্ছিল—হঠাৎ আরেকটা কথা মনে হতেই ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'আজ রাতে খাটের ওপর শুয়ো না। তোষকটা নামিয়ে এনে এইপাশে বিছানা করে তার ওপর ঘুমিয়ো. পিস্তলটা বালিশের তলায় রেখো।' হাসল রানা। মস্ত আশ্বাস খুঁজে পেল অনীতা রানার এই হাসিতে। সমস্ত ভয় দূর হয়ে গেল ওর।

'তোমাকে অনেক···অনেক ধন্যবাদ, রানা। ভাগ্যিস তুমি এসে পড়েছিলে! আমাকে রক্ষা করবার জন্যেই বোধহয় সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাকে। এই নিয়ে দু'বার হলো। ভাবছি, তিনবারের বার সত্যি সত্যিই প্রেমে পড়ে যাব তোমার।' দুই পা এগিয়ে এসে গলা জড়িয়ে ধরে চুমো খেলো অনীতা রানার গালে। বেরিয়ে গেল রানা ঘর থেকে।

রানার কথামত প্রত্যেকটি কাজ করে শুয়ে পড়ল অনীতা মেঝের উপর বিছানা পেতে। এই অদ্ভুত লোকটার কথা শুয়ে শুয়ে ভাবল সে অনেকক্ষণ। জীবনে এমন আশ্চর্য গম্ভীর অথচ প্রাণবন্ত মানুষ আর দেখেনি সে কখনও।

হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত শ্রদ্ধা এর পায়ে অর্ঘ্য দিলেও প্রাণটা কেন যেন ভরতে চায় না। আশ্চর্য এক তীক্ষ্ণতা আছে এর মধ্যে, যেজন্যে ভয়ে ভয়ে দূরত্ব বজায় রেখেছে অনীতা। ও জানে এ লোক আপন হবার নয়। চিরকাল এর জন্যে চাতকীর মত তৃষ্ণার্ত হয়ে বসে থাকলেও বুক ভরে পাওয়া যাবে না একে কোন দিন। যখন আসবে, বন্যার মত দু'কূল ছাপিয়ে আসবে—ভাসিয়ে ডুবিয়ে একাকার করে দিয়ে চলে যাবে। কেউ রাখতে পারবে না ধরে। অনীতাও পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুমিয়ে পড়ল অনীতা। যখন ঘুম ভাঙল তখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে চারদিকে। যেমন তাপ তেমনি ধোঁয়া। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দরজার দিকে এগোল সে হামাগুড়ি দিয়ে। কিন্তু দাউ দাউ করে জ্বলছে টেবিলটা। আর এগোনো যাচ্ছে না। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না সে চোখে। ভয়ানক কাশতে আরম্ভ করল সে। দম বন্ধ হয়ে আসছে জমাট ধোঁয়ায়। মড় মড় করে কড়িকাঠ ভেঙে পড়ল একটা। ঠিক এমনি সময় কে যেন চেপে ধরল ওকে। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সে মেঝের ওপর।

নয়

'নীতা! নীতা!' কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে ডাকল রানা। কেঁপে উঠল অনীতার চোখের পাতা। রানা বুঝল জ্ঞান ফিরছে।

'কথা বোলো না। চুপচাপ শুয়ে থাকো। কোন ভয় নেই, আমি রানা।'

চোখ খুলল অনীতা। চেয়ে দেখল ভেজা ঘাসের ওপর শুয়ে আছে সে খোলা আকাশের নিচে। কানের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলছে মাসুদ রানা। উঠে বসল অনীতা। বিকট শব্দ হচ্ছে। মড়মড় করে ধসে পড়ছে ঘরের চাল। আগুনের লেলিহান শিখা সগর্জনে বিস্তার করছে নিজেকে। জ্বলছে মোটেল ড্রীম। হাসল রানা।

'এই হচ্ছে আসল ব্যাপার। এবার বুঝেছ?' বুড়ো আঙুল দিয়ে জ্বলন্ত মোটেলটার দিকে দেখাল সে। 'এটাকে জ্বালিয়ে দিয়ে ছত্রিশ লাখ টাকা আদায় করতে চেয়েছিল গোলাম হায়দার ইনশিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে। ওই বদমাইশ দুটো থারমাইটের গুঁড়ো ছড়াচ্ছে এখন। আগুনটাকে অফিস-কামরা আর কাফেটেরিয়ার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। এখুনি ঘায়েল করতে পারতাম ব্যাটাদের, কিন্তু তাতে ওই কামরাগুলো বেঁচে যেত হায়দারের। গোলাম হায়দারের সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিনি। সবই গেছে, ও ক'টা গেলে এমন কিছুই ক্ষতি হবে না। বিশেষ করে সে নিজেই যখন এ সম্পত্তি নষ্ট করার জন্যে ভাড়া করা লোক পাঠিয়েছে। তুমি-আমি সাক্ষ্য দিলে একটি পয়সাও পাবে না সে ইনশিওরেন্সের কাছ থেকে।

জেল হয়ে যাবে এই প্রমাণের ভিত্তিতে।'

'কিন্তু এত ভয়ঙ্কর আগুন ধরাল কি করে ওরা এত কম সময়ের মধ্যে?' প্রশ্ন করল অনীতা।

'প্রত্যেকটা কেবিনে থারমাইট বম্ব ব্যবহার করছে ওরা। পেট্রলের চাইতে অনেক সহজে অনেক ভাল কাজ হয় এই বোমা দিয়ে। কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে না থারমাইটের।'

'তোমাকে-আমাকে দু'জনকেই পুড়িয়ে মারবার প্ল্যান ছিল ওদের।'

'না। পুড়িয়ে মেরেছে ওরা কেবল তোমাকে। আমাকে আগেই গুলি করে মেরেছে।'

কি ব্যাপার! মেরেছে মানে? মরার পর আলাপ করছে নাকি ওরা? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল অনীতা। 'তার মানে?'

'মানে, এখন পর্যন্ত ওদের ধারণা পিচ্চির পিস্তলের গুলিতে মারা গেছি আমি, আর তুমি মারা গেছো দাগুর আগুনে।'

'ধারণা। তাই বলো। আসলে তবে মরিনি আমরা?' হেসে ফেলে বলল অনীতা। 'আমি তো ভেবেছিলাম মরার পর গল্প করছি বুঝি তোমার সঙ্গে!'

হাসল রানা।

'আরেকটু হলে তাই করতে হত। কিন্তু ওরা জানত না, আগেই আঁচ করেছিলাম আমি ব্যাপারটা। এবং এ-ও আঁচ করেছিলাম, তোমাকে মারার আগে আমাকে শেষ করতে চাইবে ওরা। তাই তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকেই বিছানার ওপর তোষক, বালিশ আর কম্বল দিয়ে মাসুদ রানা তৈরি করলাম একটা। কলম দিয়ে বালিশের ওপর চুল আঁকলাম, তারপর কান পর্যন্ত চাদর ঢেকে দিয়ে একটা শার্ট বিছানার কাছে চেয়ারের মাথায় এমন ভাবে টাঙিয়ে রাখলাম যেন একনজর দেখলেই যে কেউ মনে করে শার্টের মালিকটি নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে চাদর মুড়ি দিয়ে। কেরোসিনের ল্যাম্পটা জ্বেলে খুব কমিয়ে দিলাম আলোটা। ঠিক এমনি সময় নিভে গেল মোটেলের সমস্ত বাতি। আমিও নিশ্চিন্ত মনে সুটকেস হাতে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে। দরজায় চাবি লাগিয়ে জঙ্গলের ভেতর চলে এসে সুটকেসের ওপর বসে বসে মশার কামড় খেয়েছি এতক্ষণ।'

'তারপর?'

'ঘণ্টা খানেক পরই টর্চ হাতে একজনকে এগোতে দেখলাম আমার ঘরের দিকে। দরজা খুলেই গুলি করল লোকটা বিছানার ওপর পর পর তিনবার। পরমুহূর্তেই দপ করে জ্বলে উঠল আগুন। ছুটলাম তোমার ঘরের দিকে। পৌঁছবার আগেই তোমার কেবিনেও আগুন লাগিয়ে দিল ব্যাটারা। একটার পর একটা দরজা খুলছে আর থারমাইট বম্ব ফেলে আবার বন্ধ করে দিচ্ছে। সামনে দিয়ে গেলে ধরা পড়ে যাব—কাজেই জানালা ভেঙে ঢুকতেই হলো তোমার ঘরে চোরের মত। ঢুকে দেখি দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন, আর হাপুস-হুপুস করছ তুমি। আমি ধরতেই নিশ্চিন্তে জ্ঞানটি হারিয়ে পড়ে গেলে।

বহু কসরত করে বের করতে হয়েছে তোমাকে।'

'আমাদের দু'জনকে মেরে ওরা তো কালই ধরা পড়ত পুলিসের হাতে। পড়ত না?'

'না : নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যেত ওরা। গোলাম হায়দার তোমার ওপরই দোষ চাপাত। বলত ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে দিয়ে খরচ বাঁচাবার জন্যে কেরোসিনের বাতি ব্যবহার করছিলে তুমি। কোনভাবে উল্টে গিয়ে আগুন ধরে যাওয়ায় সেই আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে তোমার। সমস্ত মোটেল আসবাব-পত্র সহ ভস্ম হয়ে গেছে, কাজেই টাকা দিতে বাধ্য হত ইনশিওরেন্স কোম্পানি। ভিতর ভিতর সন্দেহ হলেও এতবড় একজন দেশবরেণ্য গণ্যমান্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে সাহস পেত না পুলিস বা ইনশিওরেন্স কোম্পানি।'

'আর তোমার মৃতদেহ যখন আবিষ্কার হত, তখন?'

'কিছুই হত না। সবাই জানত তোমার দোষে আরেকজন লোকও প্রাণ হারিয়েছে। বেচারা সেই রাতেই এসেছিল কক্সবাজারে—গাড়ির চাকা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কোনোমতে তোমাকে রাজি করিয়ে শেষ কামরায় আশ্রয় নিয়েছিল রাত্রিটার জন্যে। মানুষকে মউতে টানলে কার সাধ্য ঠেকায়? এইভাবেই মৃত্যু লেখা ছিল ওর কপালে।'

কথা বলতে বলতে বারবার আগুনের লেলিহান শিখার দিকে চাইছে রানা। এবার হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'একটু উচিত শিক্ষা দিতে হবে ওদের। আমি যতক্ষণ না আসি, বসে থাকো এইখানে।'

'কিন্তু রানা, যথেষ্ট প্রমাণ তো আছে তোমার হাতে। ওদের পেছনে না লাগলেই কি নয়? যাক না ওরা পালিয়ে, কাল ধরা পড়বে। কেন শুধু শুধু বিপদের মধ্যে···'

'না, অনীতা। এরা খুনী। বিনা দ্বিধায় খুন করতে পারে এরা মানুষকে। তুমি, আমি কি অন্যায় করেছিলাম ওদের কাছে? কালকেই যে ওরা আর কাউকে খুন করবে না তার কোন নিশ্চয়তা আছে? আমার কর্তব্য আমাকে করতেই হবে।'

'আমিও যাব তাহলে,' জেদ ধরল অনীতা।

'খামোকা আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করবে তুমি। তুমি এখানেই থাকবে। আর ধরো,' ওর বালিশের তলা থেকে কুড়িয়ে আনা পিস্তলটা গুঁজে দিল রানা আবার অনীতার হাতে। 'এটা হাতে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘুরে সামনের দিকে চলে যাও। যতটা সম্ভব আমার গাড়িটার কাছাকাছি থাকবে—দরকার হলে তোমাকে খুঁজে নিতে অসবিধা হবে না আমার। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তোমার অবস্থান যেন টের না পায় ওরা। টুঁ শব্দ করবে না। যদি আমার কিছু ঘটে, তাহলে ধীরে ধীরে পিছিয়ে চলে যাবে সাগর তীরে। তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবে শহরে। সোজা থানায় গিয়ে সমস্ত ঘটনা এবং আমার পরিচয় বলবে। নাম তো জানোই, তার আগে একটা মেজর যোগ করে

নিয়ো—দেখবে অনেক তাড়াতাড়ি কাজ হবে। আমি ইন্টেলিজেন্সের কাছে বেতার মারফত আমার খবরটা জানাতে বলবে আজই রাতে। বুঝলে?'

মাথা ঝাঁকাল অনীতা গিলবার্ট।

দশ

দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। অতি সন্তর্পণে এগোল রানা জঙ্গলের ধার দিয়ে। দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস বইছে। এদিকের তিন চারটে কেবিনে আগুন ধরেনি এখনও। অফিস কামরাটায়ও আগুন আনতে পারেনি ওরা। কাফেটেরিয়াটা শুধু পুড়ছে একা একা। মট্‌মট্‌ আওয়াজ হচ্ছে, ফুলকি উঠছে উপরে।

কিন্তু এতক্ষণেও দমকল আসছে না কেন? গাছ-টাছ পড়েছে নাকি পথের ওপর? নাকি আসন্ন ঘূর্ণিঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে, কারও চোখেই পড়েনি এই আগুন? উত্তরে জঙ্গলের কয়েকটা গাছ আগুনের তাপে শুকিয়ে গিয়ে জ্বলে উঠেছে। দাবানল সৃষ্টি হবে নাকি? বৃষ্টিতে না ভিজলে বোধহয় তাই হত।

হঠাৎ চোখে পড়ল রানার, অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে আসছে পিচ্চি আর দাণ্ড। গাড়ির দিকে এগোচ্ছে ওরা। দু'জনের হাতে দুটো প্রকাণ্ড রেডিও সেট। কমপক্ষে পাঁচশো টাকায় বিক্রি হবে একেকটা। বোধহয় পছন্দ হয়ে গিয়েছিল, তাই কেবিন থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে ওরা ও দুটো—কিছু এক্সট্রা প্রফিট হবে। সোজা হেঁটে এগিয়ে গেল রানা ওদের দিকে।

নিশ্চিন্তে গল্প করতে করতে আসছিল ওরা দু'জন। সোজা সামনে থেকে যে কেউ আসতে পারে এটা ওদের কল্পনারও বাইরে ছিল, তাই দশ হাতের মধ্যে চলে আসার পরেও দেখতে পেল না ওরা রানাকে। মনে মনে হাসল রানা। একেই বলে সারপ্রাইজ ফ্যাক্টর। ওর লাইনে এ ব্যাপারটার গুরুত্ব অপরিসীম। এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারবে সে এখন।

হঠাৎ জোরে হাঁচি দিয়ে উঠল রানা। থমকে দাঁড়াল দু'জন। সামনে জলজ্যান্ত মাসুদ রানাকে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাঁ হয়ে গেল ওদের মুখ। জিভ দিয়ে পুরু ঠোঁট চাটল দাণ্ড একবার। কিছু বলার চেষ্টা করল, কিন্তু ঠোঁট নড়ল কেবল, আওয়াজ বেরোল না গলা দিয়ে। মড় মড় করে কড়িকাঠ ভেঙে পড়ল পিছনের কোন একটা কেবিনের। স্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়ল অনেকগুলো। চক্ চক্ করে উঠল রানার হাতে ধরা ওয়ালথার পি. পি. কে.।

'ব্যাপারটা বুঝতেই পারছ। কাজেই ভদ্রলোকের মত ঘুরে দাঁড়াও। যার হাত থেকে রেডিও সেট মাটিতে পড়বে সে-ই প্রথম গুলিটা খাবে।'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল পিচ্চি আর দাণ্ড। রেডিও সুদ্ধ দুই হাত মাথার

ওপরে তুলে রাখল দাগু। পিচ্চি ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানাকে। প্রথমে ওদের পকেট থেকে অস্ত্রগুলো বের করে নেয়া দরকার। কিন্তু একা দু'জনকে সামলানো মুশকিল। ডাক দিল রানা, 'নীতা! এ দিকে এসো।'

বেরিয়ে এল অনীতা জঙ্গলের মধ্যে থেকে। ওকে দেখে আরও আশ্চর্য হয়ে গেল পিচ্চি আর দাগু। বুঝল, এবার শক্ত পাল্লায় পড়েছে ওরা—চরম পরাজয় ঘটতে চলেছে ওদের। প্রস্তুত হলো ওরা ভিতর ভিতর প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মরক্ষার জন্যে। কেবল আত্মরক্ষা করলে চলবে না। এই দু'জনকে শেষ করতে না পারলে নিজেরাই শেষ হয়ে যাবে ওরা।

'থামো।' দশ ফুট থাকতেই থামবার আদেশ দিল রানা অনীতাকে। থেমে দাঁড়াল অনীতা। অশ্লীল কয়েকটা গাল দিল পিচ্চি অনীতার উদ্দেশে।

'খবরদার! একদম চুপ! নইলে এক গুলিতে তোমার ওই ঝুনো নারকেলের মত খুলি ফুটো করে দেব। শোনো, অনীতা। তুমি এক এক করে দু'জনেরই পকেট থেকে পিস্তল বের করে নেবে। প্রথমে তোমার পিস্তলটা ঠেসে ধরবে পিঠের ওপর তারপর পকেটে হাত দেবে। একটু নড়াচড়া করলেই টিপে দেবে ট্রিগার। আমি পেছনে প্রস্তুত থাকলাম। তাড়াহুড়ো করো না—ধীরে সুস্থে কাজ করবে। ওই কুৎসিত বেঁটে লোকটাকে দিয়ে শুরু করো।'

অপটু হাতে পরীক্ষা করল অনীতা। বলল কিছুই নেই দাগুর পকেটে। শোলডার হোলস্টারে আছে কিনা খুঁজে দেখবার জন্যে বলতে যাচ্ছিল রানা, হঠাৎ অনীতার মাথার ওপর রেডিওটা ছেড়েই পাঁই করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর পিস্তল ধরা হাতটায় জোরে আঘাত করল দাগু। ছিটকে পড়ে গেল পিস্তল মাটিতে। চেপে ধরল দাগু অনীতাকে রানার পিস্তল থেকে নিজেকে আড়ালে রাখবার জন্যে।

গর্জে উঠল রানার ওয়ালথার। দাগুর ডানগালটা সামান্য চিরে দিয়ে বেরিয়ে গেল পয়েন্ট থ্রী-টু বুলেট। উঁচু পর্দায় 'আউ' বলে উঠেই আরও চেপে ধরল সে অনীতাকে। প্রাণের জন্যে লড়ছে সে এখন। লাথি দিয়ে, আঁচড়ে, কামড়ে ওর হাত থেকে ছুটবার চেষ্টা করল অনীতা কিন্তু পারল না, আরও জোরে চেপে ধরল দাগু ওকে নিজ দেহের সঙ্গে। বলল, 'এইবার? এইবার কেমন হলো, শালা পুলিসের বাচ্চা? গুলি ছুঁড়লে খুন করে ফেলব এই শালীকে।' অনীতা টের পেল একটা হাত ঢিল দিচ্ছে দাগু পিস্তল বের করবার জন্যে। আবার ধস্তাধস্তি আরম্ভ করল যাতে সে সুযোগ না পায়।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল রানা, 'অনীতা! লাফিয়ে উঠে পা ফাঁক করো!'

কথাটা শেষ হবার সাথে সাথেই লাফ দিল অনীতা। আবার গর্জে উঠল রানার পিস্তল। ব্যথায় ককিয়ে উঠল দাগু—একরাশ অশ্লীল গালি বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। ছেড়ে দিল সে অনীতাকে। পিছনে খুট করে একটা শব্দ হতে ঘুরে দাঁড়াল অনীতা। দেখল, পিচ্চির হাতে ধরা রেডিওটা পড়ে আছে এখন রানার পায়ের কাছে। বসে পড়েছে রানা; কপাল কেটে রক্ত গড়াচ্ছে। যে

মুহূর্তে দাগুর পায়ে গুলি করেছে রানা ঠিক সেই মুহূর্তে রেডিওটা ছুঁড়ে মেরেছে পিচ্চি রানার মাথা লক্ষ্য করে।

'দৌড় দে, দাগু!' পিচ্চির গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়েই তুলে নিল অনীতা ওর পিস্তলটা। পর পর দুটো গুলি করল অনীতা, কিন্তু একটা গুলিও লাগল না কারও গায়ে। প্রাণপণে ছুটছে ওরা অফিস কামরার দিকে। পিচ্চি পৌঁছে গেল আগেই, খোঁড়াতে খোঁড়াতে পিছন পিছন অদৃশ্য হয়ে গেল দাগুও। উঠে এল অনীতা। জিজ্ঞেস করল, 'খুব বেশি কেটেছে?'

'না।' কপালের ওপর থেকে হাত সরিয়ে দেখল রানা নিজের রক্ত। 'তেমন কিছুই নয়। মাথাটা ঘুরে না উঠলে পালাতে পারত না ব্যাটারা।'

'কিন্তু আগেই গুলি করলে না কেন তুমি? দু'জনেরই দুই হাতে ধরা ছিল রেডিও। সহজেই তো ঘায়েল করতে পারতে তুমি দু'জনকেই।'

'ঠাণ্ডা মাথায় এই কাজটা কখনোই হয় না আমাকে দিয়ে। কিন্তু দাগুর পা-টা অন্তত খতম করে দেয়া উচিত ছিল। এতদূর দৌড়ে যেতে পেরেছে যখন, তখন নিশ্চয়ই সামান্য ছড়ে গেছে পা—ভেতরে ঢোকেনি গুলি। তার মানে দুটো পিস্তলই রয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে, কমাতে পারিনি একটাও।'

'পালাবে কেন ওরা? তোমাকে ঘায়েল করেই গুলি করে মেরে ফেলল না কেন পিচ্চি?'

'কে জানে? হয়তো পিস্তল রেখে গিয়েছিল সে অফিসরুমে। জ্যান্ত বুলেট আগুনের ধারে নিতে সাহস পায়নি। যাই হোক, যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেছে। গাড়িটার দিকে নজর রাখতে হবে আমাদের। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাবার চেষ্টা করবে ওরা এখান থেকে। কিন্তু তার আগে শেষ বারের মতো চেষ্টা করবে একবার আমাদের খুন করতে। কাজেই আর গল্প নয়।' ঝন্‌ঝন্‌ করে অফিসরুমের একটা জানালার কাঁচ ভেঙে গেল। লাফিয়ে উঠে হাত ধরে টান দিল রানা অনীতাকে।' 'ছোটো!'

গুলি আরম্ভ হওয়ার আগেই ছুটল ওরা ডান দিকে। একেকবারে সাতটা করে গুলি ছুঁড়ছে ওরা। প্রচুর গুলি সঙ্গে আছে বোঝা গেল পরিষ্কার। যেখানটায় পড়ে গিয়েছিল রানা সেইদিকে গুলি ছুঁড়ছে ওরা আন্দাজের ওপর।

'এইবার শোনো,' দশ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিয়ে বলল রানা, 'তুমি ওই পাশ দিয়ে রাস্তার ওপর চলে যাও। ওখান থেকে গাছের আড়ালে আড়ালে ওদের গাড়িটার কাছে চলে আসবে যতটা সম্ভব। দেখো, ধরা পড়ে যেয়ো না আবার। তোমার ধরা পড়া মানে আমাদের পরাজয়। আমার আদেশ ছাড়া গুলি কোরো না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে যাবে কেবল। ওরা যদি গাড়িতে উঠেও পড়ে তাও চুপ করে থাকবে। বুঝলে?'

'বুঝলাম। আর তুমি?'

'আমি এইখানেই থাকব। তুমি সরে গেলেই গুলি করে নিজের অবস্থান জানাব আমি ওদেরকে। আক্রমণ ওরাই করবে। গরজ ওদের। আমাদের

খতম করে দ্রুত কেটে পড়তে হবে ওদের, কাজেই দ্রুতই আসবে ওরা এখানে। চলে যাও যেখানটায় যেতে বলছি—ওখান থেকে সবই দেখতে পাবে তুমি।'

অনীতা রওনা হয়ে যেতেই দ্রুত পদক্ষেপে এক নম্বর কেবিনের আড়ালে চলে গেল রানা। দুটো গুলি করল সে অফিসরুমের জানালা লক্ষ্য করে। ঠুস্ করে কাঁচ ভেঙে ঢুকে গেল গুলি দুটো। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল দুটো পিস্তল এক নম্বর কেবিনের দিকে লক্ষ্য করে।

রাস্তার ওপর চলে এসেছে অনীতা। গাছের আড়ালে আড়ালে চলে এল গাড়ি থেকে বিশ গজ দূরে। আর এগোনো ঠিক হবে না। আগুন কমে এসেছে অনেকখানি কিন্তু তবুও যথেষ্ট আলো আছে। অফিসরুমের ছায়া পড়ায় খানিকটা জায়গা কেবল অন্ধকার, তাছাড়া পুরো যুদ্ধক্ষেত্রটা এক নজরে দেখতে পাচ্ছে অনীতা। সমানে গুলি চলছে দুই পক্ষ থেকেই। রানার দিক থেকে বন্ধ হয়ে গেল গুলি।

হঠাৎ দেখতে পেল অনীতা, ঘাসের ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে এগোচ্ছে দাগু। এতক্ষণ অফিসরুমের ছায়ায় ছিল বলে দেখা যায়নি। পিস্তল হাতে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে সে এক নম্বর কেবিনের দিকে। চিৎকার করতে গিয়েও সামলে নিল অনীতা। রানাকে ব্যস্ত রাখার জন্যে সমানে গুলি চালাচ্ছে পিচ্চি। দুটো পিস্তলের অভিনয় করবার চেষ্টা করছে। রানার পিস্তল থেমে গেল কেন? আহত হয়েছে, না টের পেয়ে গেছে ওদের প্ল্যান?

এবার এক পলকের জন্যে দেখতে পেল অনীতা রানাকে। শরীরটা বাঁকিয়ে মাথা নিচু করে দৌড়ে চলে যাচ্ছে ও আগুন নিস্তেজ হয়ে আসা পোড়া কেবিনগুলোর দিকে। খুব সম্ভব ঘুরে এসে ঢুকবার চেষ্টা করবে সে অফিসরুমের পিছনের জানালা দিয়ে। অদৃশ্য হয়ে গেছে রানা।

দাগু চলে এসেছে এক নম্বর কেবিনের পিছন দিকটায়। উঠে দাঁড়িয়েছে সে। সন্তর্পণে দেয়াল ঘেঁষে এগোল। যেখানটায় রানা দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ, সেদিকে পুরো ম্যাগাজিন গুলি শেষ করল দাগু। কোন উত্তর নেই। খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসে হাত নেড়ে ইশারা করল সে পিচ্চিকে যে পালিয়েছে ওখান থেকে রানা এবং অনীতা। তারপর এগিয়ে এল গাড়িটার দিকে।

ঠিক এমনি সময় পর পর দুটো গুলির শব্দ শুনতে পাওয়া গেল অফিসরুমের মধ্যে থেকে। পরমুহূর্তে ভয়ঙ্কর এক আর্তনাদে ভরে গেল আকাশ বাতাস। ছুটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল পিচ্চি চিৎকার করতে করতে। বাম হাতে পিস্তল ধরা—ডান হাত ঝুলছে কাঁধ থেকে আলগা ভাবে। দৌড়াতে দৌড়াতে পিছন ফিরে গুলি করছে সে খোলা দরজা লক্ষ্য করে।

কিন্তু রানার পিস্তল গর্জন করে উঠল কাফেটেরিয়ার ওই মাথা থেকে। বসে পড়ল পিচ্চি। পায়ে লেগেছে গুলি। মাটির ওপর গড়াতে গড়াতে এগোবার চেষ্টা করছে সে গাড়ির দিকে। মাঝে মাঝে থেমে গুলি করছে। কিন্তু রানা তখন চলে এসেছে আবার এক নম্বর কেবিনের বারান্দায়।

গর্জন ছেড়ে স্টার্ট হয়ে গেল এঞ্জিন। ড্রাইভিং সীটে উঠে বসেছে দাগু। সাঁ করে এসে দাঁড়াল গাড়িটা পিচ্চির পাশে। দরজা খুলে দিতেই আছড়ে-পাছড়ে উঠে পড়ল পিচ্চি গাড়ির ভিতর। সোজা এগোল গাড়ি রাস্তার দিকে। পালিয়ে যাচ্ছে ওরা।

রানার জন্যে আর অপেক্ষা করল না অনীতা। এক লাফে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে গুলি আরম্ভ করল গাড়ির চাকা লক্ষ্য করে। ঠন্ ঠন্ করে দুটো গুলি লাগল গাড়ির গায়ে। বাকিগুলো কোথায় গেল বোঝা গেল না। কিন্তু ম্যাগাজিন শেষ না করে থামল না সে।

আবার গর্জে উঠল রানার পিস্তল। এবার অনেকখানি সামনে থেকে। জানালা দিয়ে পিচ্চিও গুলি চালাচ্ছে। কিন্তু সে বাঁয়ে বসেছে, আর রানা গুলি করছে ডান দিক থেকে, কাজেই রানার ধারে কাছেও ঘেঁষল না ওর কোনও গুলি। আবার গুলি করল রানা। হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেল গাড়িটার। সোজা এগোল সেটা রানার দিকে। চাপা দেবার চেষ্টা করছে নাকি? ছুটতে আরম্ভ করল অনীতা রানার দিকে। হেড লাইটের আলো পড়েছে রানার ওপর। ডান পা-টা সামনে রেখে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে গুলি করছে সে সামনে হাত বাড়িয়ে। রানার দিকে এগোতে গিয়েও ঘুরে গেল গাড়িটা আবার। ফার্স্ট গিয়ারে চলছে গাড়ি। পুকুরের মধ্যে পড়বে না তো আবার? সৌখিন অতিথিরা ইচ্ছা করলে যেন মাছ ধরতে পারে সেজন্যে কাটিয়েছিল পুকুরটা গোলাম হায়দার। সাগরে নামতে যারা ভয় পায় তারা এরই মধ্যে সমুদ্র-স্নান সেরে নেয়। কিন্তু উঁচু জায়গায় কাটা হয়েছে বলে প্রায় ত্রিশ ফুট নিচে রয়েছে পানি। ওই দিকটায় প্রায় খাড়া হয়ে নেমে গেছে পাড়টা। গাড়িটা চলেছে সোজা পুকুরের দিকে। গাড়ির পিছন পিছন ছুটল অনীতা। পুকুরের ধারে বসানো সিমেন্টের বেঞ্চে লেগে এবার থেমে যাবে বোধহয় গাড়িটা। না। ভেঙে এগিয়ে গেল সেটা বীরদর্পে। ঝপাং করে ভারি একটা শব্দ হলো পানিতে। চোখে মুখে পানির ছিটে এসে লাগল। ডুবে গেল গাড়িটা ধীরে ধীরে—শুধু ছাদের সামান্য কিছুটা অংশ চিক্ চিক্ করছে চাঁদের আলো পড়ে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রানা। অনীতা গিয়ে দাঁড়াল পাশে। কেটে গেল পাঁচ মিনিট।

'ভাগ্যিশ বিগড়ে গেছিল গাড়িটা! তোমার লেগেছে কোথাও, রানা?'

'না। দাগু চালাচ্ছিল গাড়িটা। আমার একটা গুলিতে মারা গিয়েছিল ব্যাটা। পড়ে গিয়ে অ্যাক্সিলারেটার চেপে রেখেছিল ওর মৃতদেহ।' একটু হাসল রানা। একটা হাত রাখল অনীতার কাঁধে। 'দুঃখ হচ্ছে না আমার। দুটো প্রাণ নষ্ট হলো ঠিকই, কিন্তু এর ফলে অনেক প্রাণ রক্ষা পেল।' পিস্তলটা শোলডার হোলস্টারে ভরে ঘুরে দাঁড়াল রানা। ধীরে ধীরে এগোল ওরা অফিসরুমের দিকে।

নিভু-নিভু হয়ে এসেছে আগুন। সাড়ে তিনটে বাজে। ম্লান লালচে আভা বেরোচ্ছে পোড়া কেবিনগুলো থেকে। আকাশে চাঁদ।

'বড় ক্লান্তি লাগছে, অনীতা। একটু ঘুমিয়ে নিলে হয় না? তিন চারটে কেবিন এখনও আস্ত আছে। এক নম্বর আর দুই নম্বরটা ব্যবহার করতে পারি আমরা।'

লাল হয়ে গেল অনীতার গাল। 'যা-ই ভাবো না কেন, তোমাকে কাছ-ছাড়া করতে পারব না আমি আজ রাতে। আমি না হয় মেঝেতে ঘুমাব—আপত্তি আছে তোমার?'

হেসে ফেলল রানা। বলল, 'হ্যাঁ, আপত্তি আছে। তুমি মেঝেতে ঘুমালে আমাকেও মেঝেতেই ঘুমাতে হবে। অত সুন্দর ডাবল্‌-বেডটা খুব দুঃখ পাবে তাহলে। তার চাইতে দু'জন মিলে ওটাকেই সদ্ব্যবহার করা যাক। দু'জনের মাঝে একটা বালিশ থাকবে পার্টিশন। চলবে না তাতে?'

এগারো

এক নম্বর কেবিনে ঢুকল অনীতা রানাকে নিয়ে। রানা গেল জঙ্গলের মধ্যে থেকে সুটকেসটা নিয়ে আসতে। ঘরটা ড্যাপসা গরম হয়ে রয়েছে, জানালাগুলো খুলে দিল অনীতা। চাঁদের আলো এসে পড়ল ঘরের মধ্যে। শেষ রাতের মিষ্টি মধুর ঠাণ্ডা বাতাস আসছে সাগর থেকে। প্রাণটা জুড়িয়ে গেল অনীতার।

ঘুমাচ্ছে রানা। ডান হাতটা বালিশের তলায় পিস্তলের বাঁটের ওপর। ওর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনছে অনীতা শুয়ে শুয়ে, আর আকাশ-পাতাল ভাবছে। কিছুতেই ঘুম আসছে না চোখে।

সেই কবে পরিচয়! সাতদিন পেয়েছিল সে এই লোকটার সঙ্গ করাচিতে। তারপর কোথায় হারিয়ে গেল। দুঃখ হয়েছে—কিন্তু অনুশোচনা হয়নি। অনীতা জানত একে বেঁধে রাখবার ক্ষমতা ওর নেই। আজও বুঝল, দৈবক্রমে এসে উপস্থিত হয়েছে রানা ঠিক ওর বিপদের সময়। রক্ষা করেছে ওকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। গাড়ির চাকা বদলে কেটে পড়তে পারত মানুষটা বিপদ দেখে, কিংবা আক্রমণের প্রচণ্ডতা দেখে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু যায়নি। কাল নিজের কাজে চলে যাবে সে হয়তো অন্য কোথাও। রানা না বাঁচালে এতক্ষণে পুড়ে কয়লা হয়ে যেত ওর দেহটা—কিন্তু তবু কেন যেন বড় নিষ্ঠুর মনে হয় অনীতার রানাকে। কখনও কিছু দাবি করেনি রানা। ঠিক আছে, এভাবেই খুশি থাকবে অনীতা। ওর কাছে কোনদিন কিছু চাইবে না সে। যদি কখনও দেয়—গ্রহণ করবে অঞ্জলি ভরে। প্রত্যাখ্যান করবে না। একেই বোধহয় বন্ধুত্ব বলে। বন্ধু হিসেবেই গ্রহণ করবে সে রানাকে।

বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় এবং তার ওপর এই বিতিকিচ্ছিরী আগুন দেখে ব্যাঙগুলোর উৎসাহে ভাটা পড়েছে। তাদের জায়গা দখল করেছে অসংখ্য ঝিঁঝি পোকা। ঠাণ্ডা হাওয়াটা বড় মিষ্টি লাগছে। চাঁদটা পশ্চিমের শালগাছগুলোর মাথা ছুঁই ছুঁই করছে। এবার একটু ঘুমিয়ে নেয়া দরকার।

একটা জানালার লাল পর্দা কেঁপে উঠল, আধবোজা চোখে দেখল অনীতা। বাতাসের বেগ বোধহয় বেড়েছে। কিন্তু ওদিকটায় বাতাস লাগবে কি করে? বাতাস তো আসছে মাথার দিক থেকে। মাথা উঁচু করে দেখল অনীতা এপাশের জানালার দিকে। কই, না! ভারি পর্দাটা তেমনি ঝুলছে। কাঁপছে না তো! যাই হোক, এখন ঘুমিয়ে পড়া দরকার।

এমনি সময় দেখতে পেল অনীতা মুখটা। পিচ্চি! পর্দা সরিয়ে ঘরের ভিতর চেয়ে রয়েছে সে। চাঁদের আলো পড়ে আরও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে মুখটা। ধক্ ধক্ করে জ্বলছে ওর নিষ্প্রভ দুই চোখ।

বালিশের ওপর খস্ খস্ শব্দ তুলে খাড়া হয়ে গেল অনীতার মাথার পিছনের চুলগুলো। ভয় পেয়েছে অনীতা। হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর সর্বাঙ্গ। চিৎকার করবার চেষ্টা করল কিন্তু আওয়াজ বেরোল না গলা দিয়ে। পাশেই ঘুমাচ্ছে রানা—ধাক্কা দিয়ে ওকে জাগিয়ে দেবার শক্তিও নেই ওর দেহে। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল সে বিকট মূর্তিটার দিকে। দাঁত বেরিয়ে আছে পিচ্চির। ক্রুদ্ধ হিংস্র জানোয়ারের মতো লাগছে ওকে দেখতে। হয়তো হাসছে সে শিকার দেখতে পেয়ে।

সারা ঘরে দৃষ্টি বুলাল সে ধীরে ধীরে, তারপর দৃষ্টিটা স্থির হলো ধবধবে সাদা বিছানার ওপর। চাঁদের আলো পড়ে ভৌতিক লাগছে দেখতে মুখটা। ধীরে ধীরে, যেন অতি কষ্টে, বাম হাতটা উঠে এল মাথার পাশে। কালো একটা চকচকে জিনিস ধরা সে হাতে। ক্লিক্ করে সেফটি ক্যাচ নামানোর শব্দ পাওয়া গেল।

এই সামান্য শব্দটুকুতেই সংবিৎ ফিরে পেল অনীতা। হঠাৎ ধাক্কা দিল সে রানার গায়ে। তড়াক করে উঠে বসল রানা বিছানার ওপর। পরমুহূর্তেই প্রায় একসাথে গর্জে উঠল দুটো পিস্তল। ঠক্ করে একটা গুলি লাগল অনীতার মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে দেয়ালের গায়ে। ভয়ঙ্কর মুখটা অদৃশ্য হয়ে গেছে জানালার ওপাশ থেকে।

বিছানাটা দুলে উঠল। একরাশ চাঁদের আলো এসে পড়ল ঘরের ভিতর দরজাটা খুলে যেতেই। বেরিয়ে গেছে রানা ঘর থেকে। আতঙ্কিত অনীতা চুপচাপ শুয়ে থাকল বিছানার ওপর। এক মিনিটেই ফিরে এল রানা আবার। প্রথমেই এক গ্লাস পানি ঢেলে খাওয়াল অনীতাকে, তারপর জানালাটা বন্ধ করে টেনে দিল লাল ভারি পর্দা। অনীতা বুঝল ওই ভয়ঙ্কর মুখটা আর দেখতে হবে না ওকে কোনদিন।

বিছানার পাশে এসে বসল রানা। দ্রুত পরীক্ষা করল একবার পিস্তলটা। চারটে গুলি ছিল, স্লাইড টানতেই টপাটপ অনীতার পাশে বিছানায় পড়ল

সেগুলো। শিউরে উঠল অনীতা। শীতল একটা ভয়ঙ্করত্ব আছে সীসার গায়ে। কুড়িয়ে নিল সেগুলো রানা। চেম্বারে একটা গুলি ভরে সেফটি ক্যাচ তুলে দিল রানা, তারপর ম্যাগাজিনে গুণে গুণে সাতটা গুলি ভরে ঢুকিয়ে দিল সেটা যথাস্থানে। আবার যন্ত্রটা বালিশের তলায় রাখল সে। তারপর বলল, 'আমারই ভুল হয়েছিল এদেরকে আন্ডার-এস্টিমেট করা। এরকম অসাবধান হলে বেশিদিন আর টিকতে হবে না।'

'কিন্তু লোকটা এল কি করে এখানে? ডুবে গেল না গাড়িসুদ্ধ সুইমিং পুলে?'

'ওইখানেই তো বোকামি হয়েছে আমার। খেয়াল আছে, গাড়ির ছাতের কিছুটা অংশ চাঁদের আলো পড়ে চক্ চক্ করছিল? নিশ্চয়ই যথেষ্ট বাতাস আটকে ছিল ওখানটায়। কাজেই ধীরে সুস্থে চিন্তা ভাবনা করে বেরিয়ে আসার সুযোগ পেয়েছে আহত পিচ্চি। কয়েকটা গুলি খেয়েছিল লোকটা। বহুকষ্টে গাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে উঠে এসেছে প্রতিশোধ নিতে। যাক, এসো ঘুমিয়ে পড়ি। আর ভয় নেই কোন।'

প্যাচা ডেকে উঠল জঙ্গলের মধ্যে। দুটো ঝিঁঝি পোকা পাল্লা দিয়ে ডাকছিল—হঠাৎ থেমে গেল এক সাথে। আশ্চর্য একটা স্তব্ধতা বিরাজ করল কয়েক সেকেন্ড। তারপর আবার তান ধরল দু'জনে মিলে।

আওয়াজটা কিসের? ঝিঁঝির ডাকের কয়েক সেকেন্ড বিরতির মধ্যে বহুদূর থেকে একটা স্পীড বোটের ধুক-ধুক শব্দ কানে এল না? কান খাড়া করে শুনবার চেষ্টা করল রানা শব্দটা। কিন্তু ঝিঁঝি দুটো মেতে উঠেছে আপন তানে। কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না ওদের জ্বালায়। মৃদু হেসে ঘুমিয়ে পড়ল সে পাশ ফিরে।

ঘুম ভাঙল ওর গোলাম হায়দারের ইয়টে।

বারো

মাথাটা ঝিমঝিম করছে। সর্বাঙ্গে অসহ্য ব্যথা। চোখ না খুলেই হাই তুলল রানা। হঠাৎ ক্লোরোফরমের একটা মিষ্টি গন্ধ এল ওর নাকে খুবই আবছা অস্পষ্টভাবে। পূর্ণ সজাগ হয়ে চোখ মেলল সে। মেলেই অবাক হয়ে গেল। এ কোথায় শুয়ে আছে সে? অনীতা কোথায়?

উঠে বসতে গিয়েই টের পেল রানা, শক্ত ভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আছে সে কোনও কিছুর সঙ্গে সম্পূর্ণ অচেনা কোন আধো-অন্ধকার জায়গায়। ক্লোরোফরম দিয়ে অজ্ঞান করে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে হোটেল ড্রীম থেকে। অজ্ঞান অবস্থায় মারধোরও করা হয়েছে প্রচুর। ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে কাউকে দেখতে পেল না রানা। মৃদু মৃদু দুলছে ঘরটা।

বেশ বড়সড় একটা ঘর, চারপাশটা সাদা পেইন্ট করা। ম্লান আলো আসছে দু'পাশের দুটো স্কাইলাইট দিয়ে। কয়টা বাজে? রিস্টওয়াচটার দিকে চেয়ে দেখল চুর চুর হয়ে আছে কাঁচ। কিন্তু সেকেন্ডের কাঁটা তেমনি চলছে ব্যস্তসমস্ত হয়ে। যদি কাঁটা নড়ে না গিয়ে থাকে তাহলে এখন বাজে বেলা চারটে। শুধু জাঙ্গিয়া পরা অবস্থায় বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে একটা কাঠের তক্তার ওপর। তক্তাটা মাথা এবং পায়ের দিকে বেশ খানিকটা লম্বা। মাথার দিকটা একটা চেয়ারের হাতলের ওপর রাখা, পায়ের দিকটা মেঝেতে। হঠাৎ খানিকটা দূরে দেখতে পেল রানা অনীতাকে। ঠিক একই ভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে ওকেও। কয়েকটা স্টীলের চেয়ার আর একটা টেবিল রয়েছে ঘরের এক পাশে।

'নীতা!' ডাকল রানা। কর্কশ একটা আওয়াজ বেরোল ওর গলা থেকে।

ঘাড় ফিরিয়ে চাইল অনীতা। ফিসফিস করে বলল, 'চুপ! কথা বোলো না। এক্ষুণি আবার আসবে!'

'কোথায় ওরা?'

ইঙ্গিতে পাশের ঘরের দিকে দেখাল অনীতা। ভারি পর্দা ঝুলছে একটা দরজায়। দরজাটা খোলা। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে পাশের ঘরে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে রানা বলল, 'তোমাকেও মেরেছে?'

উত্তর দিল না অনীতা। রানা বুঝে নিয়ে চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। ভয়ঙ্কর একটা ক্রোধ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল ওর বুকের ভিতর।

'কি করে বন্দী করল আমাদের?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রানা একটু পর।

'ভোর রাতে স্পীড বোটে করে এসেছিল ওরা সমুদ্রের দিক থেকে। আমি বাথরুমে ছিলাম। পিস্তল দেখিয়ে বন্দী করেছে আমাকে, তোমাকে ক্লোরোফরম দিয়ে। নিয়ে এসেছে ইয়টে। চারজন লোক রয়ে গেছে মৃতদেহ আর গাড়ির ব্যবস্থা করবার জন্যে। আমাদের...'

দপ্ করে উজ্জ্বল বাতি জ্বলে উঠল ঘরের ভিতর। চুপ হয়ে গেল অনীতা। আলোটা চোখে সহ্য হয়ে যেতেই রানা দেখতে পেল সর্বাঙ্গে ডোরা কাটা দাগ অনীতার। নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে ওরা অনীতাকে। নিজের দেহটা দেখতে পাচ্ছে না রানা, অনীতাকে দেখেই নিজের অবস্থা বুঝতে পারল।

পর্দাটা সরিয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করল লোবাক। বার্মিজ শার্ট আর লুঙ্গি ওর পরনে। দু'জনকেই জাগ্রত অবস্থায় পেয়ে ভয়ঙ্কর একটা নিঃশব্দ হাসি হাসল লোবাক। প্রকাণ্ড হাত দুটো ঝুলছে কাঁধ থেকে। স্পষ্ট আতঙ্ক ফুটে উঠল অনীতার চোখে-মুখে।

প্রকাণ্ড পায়ের পাতায় থপ থপ আওয়াজ তুলে রানার পাশে এসে দাঁড়াল লোবাক। এক লাথি দিয়ে চেয়ারটা সরিয়ে দিল সে। দড়াম করে মাটিতে পড়ল রানা তক্তাসহ। আঙুলগুলো তক্তার নিচে পড়ায় ককিয়ে উঠল রানা। ব্যথার স্রোত বয়ে গেল ওর সর্বশরীরে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে

লোবাকের চোখের দিকে। অন্তরের সমস্ত ক্রোধ, ঘৃণা আর জিঘাংসা ফুটে উঠল সে দৃষ্টিতে।

বাঁকা হয়ে অনায়াসে তুলে নিল লোবাক তক্তাটা। নির্বিকারভাবে আবার আগের মত রাখল সেটা চেয়ারের হাতলের ওপর, কিন্তু এবার রানা ঝুলছে নিচের দিকে। মেঝেটা দেখেই বুঝল রানা ইয়র্টেই আছে সে। কিন্তু চলছে না কেন ইয়র্টটা?

দড়াম করে লাথি পড়ল চেয়ারের পায়ায়। আবার পড়ল তক্তাটা মেঝের ওপর। নাকে আর কপালে প্রচণ্ড জোরে আঘাত লাগল রানার। মনে হলো মাথাটা দু'ফাঁক হয়ে গেছে। অনীতার তীক্ষ্ণ চিৎকার অস্পষ্ট ভাবে পৌঁছল রানার কানে। ঘোলা হয়ে এল সবকিছু—বহুকষ্টে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে নিল রানা। আবার তুলল লোবাক তক্তাটা। চোখ মিট মিট করে পানি সরাবার চেষ্টা করল রানা। স্পষ্ট অনুভব করল রক্ত গড়িয়ে নামছে ওর নাক থেকে। জ্বল জ্বল করছে লোবাকের ছোট ছোট চোখ দুটো নিষ্ঠুর আনন্দে। তৃতীয় পতনের জন্যে প্রস্তুত হলো রানা।

ঠিক এমনি সময় পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করল গোলাম হায়দার। চমৎকার ছাঁটের কড়া ইস্তিরি দেয়া নীল সুট পরেছে সে। ধবধবে সাদা কটনের শার্ট। লাল সিল্কের টাই ড্রাগন আঁকা সোনার টাই পিন দিয়ে আঁটা। কালো জুতো আয়নার মত ঝক্‌ঝক্ করছে। বাম হাতের অনামিকায় ঝিক্ করে উঠল ইয়েলো ডায়মন্ড। প্রকাণ্ড একটা চুরুট দাঁতে চেপে রেখেছে সে তেরছা করে। রানার পাশে এসে দাঁড়াল গোলাম হায়দার। মুখে মৃদু হাসি। পাপড়িহীন নষ্ট চোখটা আরও বড় দেখাচ্ছে। গোলাম হায়দারের পিছন পিছন ঘরে এসে ঢুকেছে ইন্ডিয়ান নেভির পোশাক পরা লম্বা হাড্ডি-সর্বস্ব সেদিনকার সেই সিরিঞ্জ-হাতে লোকটা। মারা যায়নি তাহলে সে!

আবার চেয়ারের হাতলের ওপর রাখল লোবাক তক্তাটা। কিন্তু লাথি মারবার আগেই আঙুলের ইশারায় থামতে বলল ওকে গোলাম হায়দার।

'কেমন আছেন, মিস্টার মাসুদ রানা? টিবেটান অভ্যর্থনা কেমন লাগছে? লোবাক আপনাকে বেশ আনন্দের মধ্যেই রেখেছে দেখতে পাচ্ছি। এরপর চীনা সমাদর করা হবে। আমার বিশ্বাস, এতে আরও আনন্দ লাভ করবেন আপনি। হাজার হোক, বন্ধু দেশের সমাদর তো!' অনীতার দিকে ফিরল গোলাম হায়দার। 'এই যে, অনীতা গিলবার্ট। তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার। বোনের আমন্ত্রণে দু'দিন বেড়াতে এসে কি বিচ্ছিরি দুর্বিপাকে পড়ে গেছ, তাই না? তোমার সাথে যে আবার এইসব মহারথীদের যোগসাজশ থাকতে পারে এ-কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি আমি। যাক, সবকিছু এখন আমার আয়ত্তে চলে এসেছে। চিন্তা কোরো না, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রিয়তমের হাত ধরে হাওয়ায় ভেসে চলে যেতে পারবে স্বর্গের দিকে। তখন আর এই পাষণ্ড গোলাম হায়দার বাধা দিতে পারবে না তোমাদের বিমল আনন্দে।' আবার ফিরল সে রানার দিকে। 'আহা-হা! ঠোঁটের রক্ত চাটছেন

রুেন, বললেই হয় তৃষ্ণা পেয়েছে। ডাক্তার, এক গ্লাস জল খাওয়াও দেখি মিস্টার মাসুদ রানাকে।'

সত্যিই ভয়ঙ্কর তেষ্টা পেয়েছিল রানার। লম্বা লোকটা পাশের ঘর থেকে এক গ্লাস পানি নিয়ে এল। রানার একটা হাত খুলে দিল লোবাক। হাতটা চোখের সামনে তুলে দেখল রানা সারা হাতে কালশিরা পড়ে গেছে প্রচণ্ড মারে। কড়ে আঙুলটার নখ ফেটে রক্ত জমে আছে খানিকটা। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে গ্লাসটা নিল সে। কিন্তু অল্প খানিকটা পানি মুখে নিয়েই কালো হয়ে গেল ওর মুখ। সমুদ্রের লবণ পানি।

হাসছে লোবাক। পানি ভরা গ্লাসটা ছুঁড়ে মারল রানা ওর মুখের ওপর। চট্ করে একটা হাত তুলে মুখ আড়াল করল লোবাক। হাতে লেগে মেঝের ওপর পড়ে ভেঙে গেল গ্লাসটা। একরাশ পানি ছিটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর। হাত সরাতেই দেখা গেল তেমনি নিঃশব্দ হাসি লোবাকের মুখে—এক ফোঁটা পানি লাগেনি মুখের কোথাও।

এই অভদ্র আচরণে গম্ভীর হয়ে গেল গোলাম হায়দারের মুখ। ইঙ্গিত করল সে লোবাককে। আবার হাতটা বেঁধে দিল লোবাক। এবার খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে একটা স্টীলের চেয়ারের ওপর এক পা তুলে দিয়ে কিছুক্ষণ আনমনে চুরুট টানল গোলাম হায়দার। তারপর বলল, 'আপনাকে আগেই সাবধান করেছিলাম আমি, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনি ফায়ার ট্রিপলিসিটির মানুষ, আমি ওয়াটার। পানির সঙ্গে দ্বন্দ্বে চিরকাল হেরেছে আগুন। সময় থাকতে সাবধান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না হয়ে উত্তরোত্তর বেড়ে গেলেন আপনি—উঠে-পড়ে লাগলেন আমাকে ধ্বংস করবার চেষ্টায়। উপায় থাকল না আমার। আর এক ঘণ্টার মধ্যে আপনার চিহ্নও থাকবে না পৃথিবীর বুকে। আবদুল হাইয়ের কিছুটা অংশ পাওয়া গিয়েছিল, আপনার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু এই একটি ঘণ্টায় আপনাকে আমরা নরক দেখিয়ে আনব। এই ব্যাপারে আমার চাইতে ডক্টর নিয়োগীর উৎসাহই বেশি। আর্টিস্টিক টেম্পারামেন্টের মানুষ—এসব সাদামাঠা ব্যাপারের মধ্যে আমি থাকব না। আমি এসেছি আপনাকে গোটা কয়েক ইন্টেলেকচুয়াল শক্ দেয়ার জন্যে।'

রানা বুঝল, মৃত্যু ঘটবে ওর। অকথ্য নিষ্ঠুর নির্যাতন করা হবে ওকে মেরে ফেলার আগে। এই ব্যাপারে কোন আশা বা সান্ত্বনা দিল না সে নিজের মনকে। হাত পায়ের বাঁধন ইতিমধ্যেই পরীক্ষা করে দেখেছে সে—পাকা হাতের কাজ, খোলা অসম্ভব। যা অবশ্যম্ভাবী সেটাকে মেনে নেবার চেষ্টা করল সে। সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেলেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে, তখন আর টের পাবে না সে কিছুই—এই যা একটু ভরসার কথা। কিন্তু জ্ঞান হারাবার আগে পর্যন্ত? থাক্, আগে থেকে ভেবে কষ্টের তীব্রতা বাড়িয়ে লাভ নেই।

'আবদুল হাইয়ের মৃত্যু কিভাবে ঘটেছিল জানেন?' জিজ্ঞেস করল গোলাম হায়দার।

'জানি।'

'হাঙ্গরের মুখে, এটুকু তো সবাই জানে। কিন্তু চিটাগাং-এর সাগর-সঙ্গমে হাঙ্গর এল কোথা থেকে সেটা নিশ্চয়ই জানেন না?'

'জানি। খুলনার দক্ষিণের বঙ্গোপসাগর থেকে।'

ভুরু কুঁচকে গেল গোলাম হায়দারের। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল রানার চোখের দিকে। এই লোক কতটা জানে বের করতেই হবে ওকে। সব কথা বের না করে হত্যা করা যাবে না একে।

'কি করে এল?'

'রক্তের ঘ্রাণে।' গোলাম হায়দারকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইতে দেখে মৃদু হেসে যোগ করল, 'বিস্মিত করতে চেয়েছিলে, কিন্তু প্রথম শক্টা তোমার ওপর দিয়েই গেল, গোলাম হায়দার। এবার দ্বিতীয় শক্ দেয়ার চেষ্টা করে দেখো।'

'বাহ্! খেলা খেলা গোছের মজা পাওয়া যাচ্ছে, তাই না? বলুন দেখি, মোটেল ড্রীম পুড়ল কেন?'

'মাত্র ছত্রিশ লাখ টাকার জন্যে। একটি পয়সাও যার পাবে না তুমি।'

'আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমার প্ল্যানের মধ্যে আপনি হঠাৎ উপস্থিত হয়ে যেটুকু গোলমাল পাকিয়ে তুলেছিলেন তা ঠিকঠাক করে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেকটা পাই পয়সা গুণে গুণে দিতে হবে ইনশিওরেন্স কোম্পানিকে। বেতারে খবর গেছে চিটাগাং-এ। ইতিমধ্যেই উকিল ক্লেইম স্যুট করে দিয়েছে। চেকও বোধহয় রেডি হয়ে গেছে এতক্ষণে।' অত্যন্ত আনন্দিত মনে হলো গোলাম হায়দারকে।

'এতক্ষণে চেক নয়, হাতকড়া রেডি হয়ে গেছে তোমার জন্যে, শয়তান। আমার গাড়ি আর পিচ্চির মৃতদেহটা লুকিয়ে ফেলেই মনে করেছ সব কূল রক্ষা হয়েছে? দাগু কোথায়?'

'ও নিশ্চয়ই কাজ সেরে গাড়ি নিয়ে সরে গেছে ঘটনাস্থল থেকে।'

'পিচ্চির মৃতদেহ আর আমার গাড়িটা ফেলেই পালাল কেন?'

'কেন?' আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চাইল গোলাম হায়দার রানার দিকে।

'কারণ পিচ্চির আগেই মৃত্যু হয়েছিল দাগুর। গাড়িসুদ্ধ পড়ে আছে সে সুইমিং পুলের মধ্যে। এতক্ষণে পুলিসের লোক আর দমকল বাহিনী তুলে ফেলেছে লাশ। পুরো ব্যাপারটা যুক্তির ভিত্তিতে দাঁড় করাতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না ওদের। কেমন লাগল দ্বিতীয় শক্টা?'

গম্ভীর হয়ে গেল গোলাম হায়দার। বিপদ টের পেয়েছে সে।

'বলুন দেখি সেই বাঁদরের মত দেখতে চোরটাকে কেন ধরেছিলাম?'

'তোমার টাকা জালের ব্যাপারে জেনে ফেলেছিল লোকটা অনেকখানি, তাই।'

দু'পা এগিয়ে এল গোলাম হায়দার। নষ্ট চোখটা আরেকটু বিস্ফারিত দেখাল। ভদ্রতার মুখোশ খসে পড়ল ওর। উদ্বিগ্ন দেখাল ওকে।

'তুমি জানলে কি করে? পার্টটা তাহলে তোমাদের হাতে পড়েছে?'

'হ্যাঁ। এখন ঢাকার হেড অফিসে। এই ব্যাপারে আমার মতামতও জানানো হয়েছে মেজর জেনারেল রাহাত খানকে। কোথায় টাকা ছাপা হচ্ছে সে ঠিকানাটাও।'

বোকা হয়ে গেল গোলাম হায়দার। বুঝল, যতখানি সহজ মনে করেছিল, আসলে ব্যাপারটা তা নয়। অনেক প্যাঁচ খেয়ে জটিল হয়ে গেছে সমস্ত কিছু। বিচলিত হয়ে পড়ল সে। এর কাছ থেকে সমস্ত তথ্য জেনে নিয়ে সেইমত ব্যবস্থা করতে হবে। চেহারায় একটা দৃঢ় সঙ্কল্প ফুটে উঠল ওর। যে-কোনও উপায়ে সব কথা বের করতেই হবে। চেয়ে দেখল মুচকে মুচকে হাসছে রানা। ওর অবস্থা সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল সে।

'কেমন লাগল তৃতীয় ধাক্কাটা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সমস্ত ব্যাপার জেনে ফেলেছ, তাই বলতে চাও তুমি?'

'সবকিছু। ইয়টের নিচে সরু করিডর দিয়ে গিয়ে ডান ধারে যে গোপন কী-বোর্ড আছে, তার আটনম্বর চাবিটা কোন্ দোজখে প্রবেশের চাবিকাঠি তা-ও জানা আছে আমার।' এবার সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বলল রানা।

'কি বললে?' ফ্যাকাসে হয়ে গেল গোলাম হায়দারের চেহারা। 'সাবমেরিনের কথাও জেনে ফেলেছ!'

ভিতর ভিতর হোঁচট খেলো রানা। বলে কি! সাবমেরিন! ইয়টের তলায় করে পাকিস্তানী রাডার এড়িয়ে সাবমেরিন আসছে ইন্ডিয়া থেকে! রুমানার কথার সঙ্গে ঠিক মিলে যাচ্ছে। রাইমঙ্গলের মোহনায় পৌঁছে শিকারের ভান করে গোলাম হায়দার। সাবমেরিন তখন ঘুরে আসে ডায়মন্ড হারবার থেকে। ইয়টের নিচে ফাঁপা জায়গা আছে সাবমেরিনের জন্যে। আবার সেটা ইয়টের ছায়ায় ছায়ায় চলে আসে চিটাগাং-এর সাগর-সঙ্গমে। সেখান থেকে যায় কক্সবাজার আর টেকনাফের মাঝামাঝি এক দুর্গম জঙ্গলে—যেখানে কয়েক স্কয়ার মাইল জায়গা কিনে নিয়ে কাঠের কারবার আরম্ভ করেছে গোলাম হায়দার। এরই জন্যে পঁচিশ নটের বেশি স্পীড দিতে দেখেনি কেউ এই ইয়টকে। কিন্তু কি এদের উদ্দেশ্য? গত ছ'মাস ধরেই লক্ষ করেছে পি. সি. আই, যে কোন ভারতীয় স্পাইকে সন্দেহ করা হয়েছে টের পেলেই বর্ডারের দিকে না গিয়ে সোজা চিটাগাং পালিয়ে যাচ্ছে ওরা আজকাল—এবং বেমালুম গায়েব হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শুধু এইটুকুর জন্যে এতবড় একটা ব্যবস্থা করবে না ভারত, তাহলে কি ভয়ঙ্কর প্যাঁচ কষছে সে এবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে? নিশ্চয়ই কোন মহা পরিকল্পনা আছে ওদের। কি সেটা?

রানার ভিতরে এতগুলো চিন্তা খেলে গেল ঠিক তিন সেকেন্ডের মধ্যে। একটুও পরিবর্তন হলো না মুখের চেহারায়।

'কে বলেছে!' সাপের মত হিস্ হিস্ করে উঠল গোলাম হায়দারের কণ্ঠস্বর। চুরুটটা ধরল সে রানার দিকে পিস্তলের মত করে। 'বলো, কে বলেছে! বলতেই হবে তোমাকে, কে বিশ্বাসঘাতকতা করল।' ধীরে ধীরে

এগিয়ে নিয়ে আসছে সে জ্বলন্ত চুরুটটা রানার চোখের দিকে।

মৃদু হাসল রানা। বলল, 'খুব ভয় পেয়েছ, গোলাম হায়দার। কল্পনাও করতে পারোনি ইন্টেলেকচুয়াল শক দিতে এসে ট্যাকটিকাল কিক খেতে হবে। আমি জানি, আর অল্পক্ষণেই মৃত্যু ঘটবে আমার। কাজেই তোমার চুরুটের আগুন আমি ভয় পাই না—মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত করেছি আমি আমার মনকে। কেবল দুঃখ, তোমার মত একটা তৃতীয় শ্রেণীর ছ্যাঁচড়ার হাতে প্রাণটা যাচ্ছে। তেমন জাঁদরেল কোন ভিলেনের হাতে মরেও সুখ আছে। সেই সুখ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি আমি। তবে মনে রেখো বিষ-কামড় আমি দিয়ে দিয়েছি। নিস্তার নেই তোমার।'

'কিছুই হবে না আমার। তেমন বিপদ দেখলে আজই পালিয়ে যাব আমি সাবমেরিনে করে। এখুনি ইয়ট ছেড়ে দিলে কে ঠেকায় আমাকে? জঙ্গলের মধ্যে যদি হারিয়ে যাই কে খুঁজে পাবে আমাকে?' যেন নিজেকেই নিজে আশ্বাস দিল গোলাম হায়দার।

'চেষ্টা করেই দেখো না! আকাশে-পাতালে, জলে-ডাঙায় কোথাও তোমার আর জায়গা নেই, গোলাম হায়দার। সব কথা বলিনি। বললে এখুনি আত্মহত্যা করতে চাইবে তুমি। বলি আর না-বলি, ধরা তুমি পড়বেই, আর আমি মারা যাবই। কাজেই যদি আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কৌতূহল নিবৃত্ত করো তাহলে তোমার বিরুদ্ধে কি কি কাজ করেছি এবং কি কি প্রমাণ সংগ্রহ করেছি সব হয়তো বলতে পারি।'

'তোমার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই। নির্যাতনের মাধ্যমে সব কথা বের করে নেব আমি।'

'চেষ্টা করে দেখো। আমি প্রস্তুত। একটি কথাও বের করতে পারবে না আমার কাছ থেকে। ওই তো চুরুট রয়েছে হাতে—ঠেসে ধরো না আগুনটা আমার চোখের মধ্যে। পরীক্ষা করে দেখো। একটি কথাও বলব না। নির্যাতনে দেরিই হবে কেবল। মনে রেখো সময় ফুরিয়ে আসছে তোমার।' রহস্যময় হাসি হাসল রানা।

লাল হয়ে উঠল গোলাম হায়দারের ফর্সা মুখ। থর থর করে কাঁপছে সে। গলায় আরও সাদা হয়ে ফুটে উঠল ফাঁসের দাগটা। টকটকে লাল হয়ে গেল নষ্ট চোখ। দাঁতগুলো বেরিয়ে আসায় বীভৎস লাগছে ওকে দেখতে। আধ মিনিটের মধ্যেই সামলে নিল সে। আবার একবার আশ্চর্য হয়ে গেল রানা ওর দুর্দান্ত ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে। কিন্তু প্যাঁচের মধ্যে পড়ে গেছে সে এখন। পরাজয় স্বীকার করতেই হলো ওকে।

'কি প্রশ্ন আছে তোমার?' শান্ত স্বাভাবিক কণ্ঠ গোলাম হায়দারের।

'টাকার তো তোমার অভাব ছিল না, জাল করতে নামলে কেন?'

'সে অনেক কথা, সংক্ষেপে বলছি। কিছুরই অভাব ছিল না আমার—প্রচুর পরিমাণে টাকা ও সব রকম বিলাসিতা উপভোগ করেছি আমি। যখন প্রয়োজন বোধ করলাম, যথেষ্ট পরিমাণে যশ উপার্জন করলাম। কিন্তু অর্থ আর যশ

ছাড়াও মানুষের জীবনে আর একটি জিনিসের দরকার—ক্ষমতা। উপলব্ধি করলাম, ক্ষমতার অভাব আছে আমার মধ্যে। এ যুগে এ দেশের আমি শ্রেষ্ঠ মানব। যা চেয়েছি তাই পেয়েছি আমি আমার অসাধারণ বুদ্ধিবলে। অনায়াসে শ্রেষ্ঠ আসনে উঠে গেছি। তাহলে ক্ষমতারই বা শ্রেষ্ঠ আসনে বসতে পারব না কেন? প্রত্যেকটি ব্যাপারেই আমি শর্টকাট রাস্তা বের করে নিয়েছি মগজ খাটিয়ে। এ-ব্যাপারেও অতি অল্প সময়ে সাফল্য অর্জন করবার কৌশল আবিষ্কার করে নিলাম। সেটা হচ্ছে টাকা জাল।'

'ক্ষমতা মানে ঠিক বুঝলাম না। তোমার ধারণা, টাকা হলেই ক্ষমতা হবে?'

'তুমি একটি গর্দভ। টাকা আমার যথেষ্ট ছিল—কিন্তু ক্ষমতা বলতে আমি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কথা বুঝি। পাকিস্তানের সম্রাট হতে চাই আমি। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে রেখে যেতে চাই আমার নাম। কিন্তু তা করতে হলে দেশের বর্তমান স্থিতিশীল অবস্থার ওপর আঘাত হানতে হবে আমাকে সবার আগে। অর্থনৈতিক আক্রমণটাই সবচেয়ে সুবিধাজনক আর দ্রুততম বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। তাই এক সঙ্গে সমস্ত দেশে আমি অসংখ্য টাকা ছাড়ব। কোটি-কোটি-কোটি-কোটি টাকা। সমগ্র পাকিস্তানের টোটাল মানি-সাপ্লাই হচ্ছে ১০৮৫ কোটি টাকা। বাজারে চালু আছে মোট ৬৩৫ কোটি টাকা। আমি ছাড়ছি দশ হাজার কোটি টাকা। দরকার হলে আরও ছাড়ব। কল্পনা করতে পারো ব্যাপারটা? বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাড়া হবে টাকাগুলো। ভয়ঙ্কর রকমের মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে এর ফলে। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কি সাংঘাতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। চল্লিশ টাকা মণ চাল বিক্রি হবে চারশো টাকায়। পনেরো দিনে ধসে পড়বে পাকিস্তানের এতদিনকার গড়ে তোলা অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। হাহাকার পড়ে যাবে চারদিকে। দুর্ভিক্ষ লেগে যাবে…'

'টাকাগুলো ছাড়বে কি করে?'

'আমার নিযুক্ত হাজার কয়েক লোক বাজার থেকে সমস্ত জিনিস কিনতে আরম্ভ করবে। চোখ বুজে। অসংখ্য জিনিস কিনে ফেলে দেয়া হবে নদীতে। বিশ দিনের মধ্যেই গদিচ্যুত হবে ক্ষমতাসীন সরকার। সমস্ত কিছু ছক কেটে রেখেছি। ঠিক দুইমাস পর নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষণা করব আমি।'

'পাগলামিরও একটা সীমা আছে—সেটাও ছাড়িয়ে গেছ তুমি। যাক, এর মধ্যে ইন্ডিয়া ঢুকল কি করে?'

'ওরা সাহায্য করল আমাকে। আমিও সাহায্য করলাম ওদের। টাকা ছাপার অফসেট মেশিন ওরাই ইমপোর্ট করে দিয়েছিল আমাকে জার্মানী থেকে। এক্সপার্ট সব ওদের। কাগজ সমস্তই দিচ্ছে ওরা। পুরোদমে চলছিল দশ, পঞ্চাশ আর একশো টাকার নোট ছাপার কাজ। আমাদের কাজ প্রায় শেষের দিকে এসে পড়েছিল, এমনি সময় নষ্ট হয়ে গেল মেশিনের একটা পার্ট। স্যাম্পল্ পাঠিয়ে দিলাম কলকাতায়। কারণ পাকিস্তান থেকে ওই পার্ট

ইমপোর্ট করতে গেলে বিপদ ঘটতে পারে। বন্ধুরা যোগাড় করে পাঠিয়ে দিল পার্টটা বিশেষ লোক মারফত। সেইটাই চুরি করেছিল সেই ছিঁচকে চোর গিলটি।'

এইবার গোটা ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। ভয়ঙ্কর এক খেলায় মেতেছে গোলাম হায়দার। একে ঠেকানোর কি কোনই উপায় নেই? টাকা ছাপার মেশিনের পার্ট সম্পর্কে ওর রিপোর্টে উল্লেখ ছিল, কিন্তু তার বেশি কিছুই নয়। আরও তথ্য সংগ্রহ করে তারপর ওর সন্দেহের কথা প্রকাশ করবে ভেবেছিল রানা। ভাগ্যক্রমে ওর মিথ্যে কথাগুলো গোলাম হায়দারের দুর্বল জায়গায় লেগে যাওয়ায় এত কথা জানতে পারল সে। কিন্তু জেনে লাভ কি হলো? খবরটা ঢাকায় জানানোর কোন উপায় নেই। অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যু ঘটবে ওর। ওর মৃত্যুর সঙ্গেই নষ্ট হয়ে যাবে সমস্ত প্রমাণ এবং তথ্য। গোলাম হায়দারের এই ধ্বংসাত্মক লীলায় বাধা দেবার থাকবে না কেউ। সত্যি সত্যিই যদি সে অসংখ্য কোটি টাকা বাজারে চালু করে তাহলে কি সাংঘাতিক অবস্থা যে সৃষ্টি হবে তা ভাবতেও শিউরে উঠল রানার সর্বাঙ্গ। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক মারা যাবে না খেয়ে। গোটা পাকিস্তানে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা আর উন্মত্ততার রাজত্ব কায়েম হবে।

'আর কোন প্রশ্ন আছে তোমার?'

'একটা অনুরোধ আছে।'

'কি?'

'এই সব পাগলামি ছেড়ে হেমায়েতপুর মেন্টাল হসপিটালে ভর্তি হয়ে যাও। সীটও খালি আছে ওখানে। দু'দিনেই ভূত ছাড়িয়ে দেবে ওরা।'

'অর্থাৎ আর কোন প্রশ্ন নেই তোমার। এবার বলো আমার বিরুদ্ধে কি কি প্রমাণ সংগ্রহ করেছ তোমরা।' নিজের প্ল্যানটা বলতে বলতে আবার হৃত আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে গোলাম হায়দারের। কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝতে পারল সেটা রানা। আচমকা গোটা কয়েক বোম্বাস্টিক কথা শুনে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল সে, চিন্তা করবার কিছুটা সময় পেয়ে রানার চাতুরী ধরে ফেলেছে। রানাকে চুপ করে থাকতে দেখে আরও নিশ্চিত হলো সে। বলল, 'কি? বলবার কিছুই পাচ্ছ না বোধহয়?'

'তুমি কি করে ভাবতে পারলে যে কোনও কথা বলব আমি তোমাকে? খেপেছ নাকি, হে? বসে দেখ, আর অবস্থা বুঝে একটা ব্যবস্থা বের করে ফেলো তুমি—এতখানি বুদ্ধু ঠাওরালে কেন আমাকে?'

ঠাস ঠাস করে দুটো চড় কষাল গোলাম হায়দার রানার গালে। ঝন্ঝন্ করে উঠল মাথাটা। দাঁতে দাঁতে চেপে রাখল রানা।

'তোর একটা কথাও বিশ্বাস করি না আমি, মিথ্যুক শয়তান!' বলল গোলাম হায়দার। 'কোন খবর পৌঁছায়নি ঢাকায়। টাকশাল আর সাবমেরিনের খবর পৌঁছলে এতক্ষণে ঝাঁকে ঝাঁকে বম্বার প্লেন আর হেলিকপ্টার এসে হাজির হয়ে যেত। চিটাগাং পোর্টে নোঙর করা দু'দুটো ডেস্ট্রয়ার ছুটে আসত হাঁ হাঁ

করে। ওয়্যারলেসে খবর পেয়ে যেতাম আমি আরও অনেক আগেই। কাজেই কোন খবরই জানে না কেউ। এবং তুইও এখবর জেনেছিস অনেক পরে—যখন কাউকে কিছু জানাবার আর সুযোগ ছিল না। তার মানে কি? মানে বিশ্বাসঘাতক, নেমকহারাম আছে কেউ এই ইয়টে। কে সে? কার এতবড় আস্পর্ধা? চাবির নম্বর পর্যন্ত যখন মিলে যাচ্ছে, তখন ভুল নেই এতে। বল্, হারামজাদা, কার কাছ থেকে শুনেছিস তুই সাবমেরিনের কথা?' আবার দুটো চড় মাল গোলাম হায়দার রানার গালে। এবারও নীরবে হজম করল রানা সে আঘাত। কিন্তু আবার মারবার জন্যে হাত তুলতেই থুক করে থুথু ছিটিয়ে দিল সে ওর মুখের ওপর।

আবার একবার লাল হয়ে উঠল গোলাম হায়দারের মুখ। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে ফেলে দিল সে রুমালটা মাটিতে। তারপর বলল, 'ডক্টর নিয়োগী!'

একটা স্টীলের চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর হাত ভাঁজ করে তার ওপর মাথা রেখে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল নিয়োগী, চমকে উঠে চোখ মেলে চাইল। এদের বকবকানির চোটে ঘুম এসে গিয়েছিল তার। চোখ ঘষতে ঘষতে সোজা হয়ে বসল সে।

'তোমার চাইনিজ ট্রিটমেন্ট তৈরি করো, ডাক্তার।' কথাটা বলেই লোবাককে ইঙ্গিত করল গোলাম হায়দার। তক্তাটা আলগোছে তুলে নিয়ে টেবিলের কাছে চলে এল লোবাক। হেলান দিয়ে রাখল সেটা টেবিলের ধারে একটা চেয়ারের হাতলে। একটা সুইচ অন করবার শব্দ পাওয়া গেল—সাথে সাথেই মৃদু গুঞ্জন তুলে চালু হয়ে গেল কিসের যেন একটা যন্ত্র।

ততক্ষণে সামলে নিয়েছে গোলাম হায়দার। নষ্ট চোখটা তেমনি লাল, কিন্তু কণ্ঠস্বরে বিদ্বেষ বা রাগের আভাসমাত্র নেই। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমি খুব ঝোঁকের বশে চলি—এটাই আমার একমাত্র দোষ, মিস্টার মাসুদ রানা। একবার মাথায় রাগ চাপলে সমস্ত বুদ্ধি ঘোলা হয়ে যায় আমার। কিন্তু পর মুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝতে পারি। আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ফেলেছি—আমাকে মাফ করে দেবেন। মরা মানুষের সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই। আমার একটু ডাঙায় যেতে হবে। ফিরে এসে আপনাকে দেখতে পাব না। কাজেই যাবার আগে আপনার বদদোয়া কুড়িয়ে নিয়ে যেতে চাই না।'

রানাকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলল, 'মনে কোনও কষ্ট নেবেন না, মিস্টার মাসুদ রানা। স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করবার চেষ্টা করলে মৃত্যুটা সহজ হবে। আপনার সঙ্গে আমার বিরোধ হয়েছে—এর পরিণতি যে-কোনও একজনের মৃত্যু। আমার ক্ষমতা বেশি, তাই আপনাকেই বরণ করে নিতে হচ্ছে মৃত্যুটা—আপনার ক্ষমতা বেশি হলে আমারও এই একই অবস্থা হত। সারভাইভাল অভ দা ফিটেস্ট। আপনার মৃত্যুটা প্রয়োজন—আমার কয়েকজন লোকের মৃত্যু হয়েছে আপনার হাতে, কাজেই উপযুক্ত নির্যাতন করা হবে আপনাকে হত্যার আগে। ডাক্তারের হাতে যে যন্ত্রটা দেখছেন, ওটা একটা

ড্রিলিং মেশিন। অতি সূক্ষ্ম কাজ হয় ওতে। এ ব্যাপারে নিয়োগীর তুলনা হয় না।'

পেন্সিলের মত একটা যন্ত্র ধরে আছে নিয়োগী তিন আঙুল দিয়ে—ঠিক যেন তুলি ধরেছে কোন শিল্পী। ব্যাপারটার ভয়ঙ্করত্ব টের পেল রানা। অশ্লীল কয়েকটা গালাগালি বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে। পরিষ্কার বুঝতে পারল, এদের হাত থেকে নিস্তার নেই ওর। নিষ্ঠুরতম নির্যাতন করবার জন্যে তৈরি হয়েছে এরা।

'প্রথমে কোন্ চোখটা ড্রিল করতে দেবেন, মিস্টার মাসুদ রানা? ডান চোখ, না বাঁ চোখ?'

আবার কয়েকটা বুলি বেরোল রানার মুখ থেকে। মৃদু হাসল গোলাম হায়দার। 'এখন এসব কথা উচ্চারণ না করে আল্লার নাম করলেই পারতেন। অবশ্য যার যেমন খুশি সে তেমন করবে—অন্যের নাক গলানো উচিত নয়।'

'আমাকে মেরে ফেললেই তুমি নিস্তার পেয়ে যাবে মনে করেছ? তোমার বিরুদ্ধে এমন সব প্রমাণ…'

'এসব তো আর শুনতে চাইনি আমি, মিস্টার মাসুদ রানা। নির্যাতন করে কোন কথা বের করবার চেষ্টা করব না আমরা আপনার কাছ থেকে। কোন তথ্যের বিনিময়েই আপনার মৃত্যুদণ্ড নাকচ করা হবে না, শাস্তির মাত্রাও কমবে না একবিন্দু। কাজেই এসব কথা বলে লাভ নেই কোনও। কোন্‌খান থেকে কাজ আরম্ভ করতে চাও, ডক্টর নিয়োগী? প্রথমেই চোখ নষ্ট করে দিলে দেখতে পাবে না ও কি ঘটছে। তার চেয়ে পা থেকে শুরু করো। চোখে এসে থামবে। এক ইঞ্চি পর পর এফোঁড় ওফোঁড় করে দাও পায়ের হাড়। কিংবা এক কাজ করো সবচেয়ে কম ব্যথা লাগবে যেখানটায় সেখান থেকে আরম্ভ করো।'

'তাহলে কানের লতি থেকেই শুরু করতে হয়,' বলল নিয়োগী একগাল হেসে।

'আচ্ছা, যা ভাল বোঝো করো। আমার কাজ আছে, যেতে হবে এক্ষুণি। এতক্ষণে অস্থির হয়ে উঠেছে নাজনীন। গুড বাই, মিস্টার মাসুদ রানা। দেখা হবে।' আঙুল তুলে উপর দিকে ইশারা করে স্বর্গ না নরক কি বোঝাতে চাইল গোলাম হায়দার ঠিক বোঝা গেল না। বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

রানাকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের কব্জার মধ্যে পেয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসল লোবাক ও নিয়োগী। তারপর এগিয়ে এল। জ্বালা করে উঠল রানার কানের লতি। রক্ত নামল গাল বেয়ে। কড়মড় করে দাঁত ঘষল রানা, পেশীগুলো টান করে রাখল—চিৎকার করে অনীতাকে ভয় পাইয়ে দিতে চায় না সে। রানাকে দেখতে পাচ্ছে না অনীতা—ও যত কম টের পায় ততই ভাল। কিন্তু সবচেয়ে কম ব্যথাই যদি এই ব্যথা হয়, তাহলে অন্য জায়গায় গর্ত করলে সহ্য করবে সে কি করে?

ফুটো হয়ে গেছে রানার কানের লতি। যন্ত্রটা সামনে-পিছনে করে

এপাশ-ওপাশ ঘুরিয়ে গর্তটা আরেকটু বড় করল নিয়োগী। ব্যথায় দু'ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল রানার চোখ থেকে। কানের কাছে ছোট্ট ড্রিলিং মেশিনের শব্দটা প্লেনের এঞ্জিনের শব্দের মত মনে হলো ওর কাছে। আগুন ধরে গেছে যেন রানার কানে। ড্রিলের নিড্‌লটা বের করে নিল নিয়োগী। পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল আবার লোবাক ও নিয়োগী।

যেন ক্লাসে লেকচার দিচ্ছে এইভাবে একটা আঙুল তুলে বোঝাবার ভঙ্গিতে বলল নিয়োগী, 'দেখুন, মিস্টার রানা, এই যে এখানে নার্ভটা—এটাকে বলে ট্রাইজেমিনাল' মুখের ওপর একটা আঙুল রেখে দেখাল সে নার্ভটা, 'আর এটাকে বলে সাইয়াটিক নার্ভ, এগুলোর ওপর মৃদু অত্যাচার করব আমরা এবার। অল্পতেই পাগল করে দেয়া যায় একটা মানুষকে। ক্যালকাটা সেন্ট্রাল জেলের দুটো পেশেন্টকে এই ট্রিটমেন্ট দিয়েছিলাম। কাটা মুরগীর মত ছট্‌ফট্ আরম্ভ করে দিয়েছিল তিন সেকেন্ডেই। কিন্তু তার জন্যে ঝোলানো দরকার আপনাকে মাথা নিচু দিকে করে। লোবাক, তোমার কর্ড কোথায়?'

মাথা ঝাঁকিয়ে দেরাজ থেকে একটা নাইলনের রিল বের করল লোবাক। বাধা দেবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না। সিলিং-এর একটা কড়ার মধ্যে দিয়ে কড়ে আঙুলের অর্ধেক মোটা নাইলনের রশিটা ঘুরিয়ে এনে বাঁধা হলো শক্ত করে ওর ডান পায়ের গোড়ালি থেকে কয়েক ইঞ্চি উপরে। তক্তার সঙ্গের বাঁধনগুলো কেটে দিয়ে টেনে তোলা হলো পা-টা উঁচুতে। কাঁধটা ছাড়া বাকি দেহ উঠে গেল মাটি ছেড়ে। গোটা দেহের ওজন পড়তেই মাংস কেটে বসে যেতে আরম্ভ করল রশিটা পায়ে। ব্যথায় কুঁচকে গেল রানার মুখ। একটা তীক্ষ্ণ ধ্বনি বেরোল অনীতার মুখ থেকে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে এখন রানাকে। ওর তক্তাটা ঘুরিয়ে এদিকে মুখ করে দিয়েছে লোবাক।

'চোখ বন্ধ করে রাখো, অনীতা!' কর্কশ কণ্ঠে বলল রানা। যতটা সম্ভব কাঁধের ওপর দেহের ভার ধারণ করবার চেষ্টা করল সে। স্পষ্ট দেখতে পেল সে রক্ত নেমে আসছে পা বেয়ে নিচের দিকে। কোনও কৌশলে মৃত্যুটাকে ত্বরান্বিত করা যায় কিনা ভাববার চেষ্টা করল সে। কিন্তু অসহ্য ব্যথার ফলে কিছুই ভাবতে পারছে না সে আর।

এতক্ষণ অভিব্যক্তিহীন দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল নিয়োগী রানার দিকে। এবার আবার ড্রিলিং মেশিনটা চালু করে এগিয়ে এল পায়ে পায়ে।

হঠাৎ একটা বেল বেজে উঠল ঘরের মধ্যে। দরজার মাথায় একটা লাল বাতি জ্বলল-নিভল সেই সাথে। বিরক্ত মুখে সেদিকে চাইল নিয়োগী, তারপর চাইল লোবাকের দিকে। লোবাকও বিরক্ত হয়েছে। টেবিলের পায়ার সাথে রিলটা পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলল সে।

'তাড়াতাড়ি এসো, লোবাক। নইলে তোমার জন্যে অবশিষ্ট থাকবে না আর কিছু। যাও, কুইক।'

বেরিয়ে গেল লোবাক অপ্রসন্ন মুখে। রানা ভাবল, বোধহয় ডেকে পাঠিয়েছে ওকে গোলাম হায়দার কোন জরুরী ব্যাপারে। গোলাম হায়দার

এতক্ষণে জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের ওপর ওর বাংলোতে চলে গেছে। সেখানেই গেল লোবাক? এর ফলে কি নির্যাতন পিছিয়ে যাবে? নিয়োগী কি লোবাককে ছাড়া নিজেই ওর ট্রিটমেন্ট আরম্ভ করবে? আর যে সহ্য করতে পারছে না সে। রগে টান পড়ায় পা থেকে একটা অসহ্য ব্যথা দমকে দমকে নেমে আসছে তলপেটের কাছে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে সে এক্ষুণি।

এগিয়ে এল নিয়োগী। সাদা প্যান্টটা দেখতে পাচ্ছে রানা, আর মড়মড় করে হাঁটু আর মাজার শুকনো হাড় ফোটার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। কাছে আসতেই হঠাৎ বাঁ পায়ে দড়াম করে লাথি মেরে বসল রানা ওর তলপেটে। পরমুহূর্তে নিজেই আর্তনাদ করে উঠল ব্যথায়। এই নড়াচড়ার ফলে তলপেটে ছুরির আঘাতের মত ব্যথা অনুভব করল সে।

লাথি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল ডক্টর নিয়োগী। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। মড়মড় করে ফুটল অনেকগুলো হাড়। এবার পিছন থেকে মাথার কাছে চলে এল সে। চক্ চক্ করে উঠল সরু ড্রিলিং মেশিনটা রানার চোখের সামনে।

ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকল রুমানা। খালি পা, কাপড়-চোপড়-চুল বিস্রস্ত, হাতে একটা রিভলভার। কপালে আর ঠোঁটের কোণে রক্ত, ডান গালে চোখের ঠিক নিচেই বড় একটা ফোস্কা পড়েছে। হাতের রিভলভারটা সোজা নিয়োগীর বুকের দিকে ধরা।

'রুমানা! তুমি···'

'চুপ!' রানাকে থামিয়ে দিল রুমানা অস্বাভাবিক কণ্ঠে। টেবিলের ওপর থেকে ছুরি তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করল সে নিয়োগীকে। উঠে দাঁড়াল নিয়োগী মড়মড় আওয়াজ তুলে। 'মাথার ওপর হাত তুলে ওইখানে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়াও।'

মাথার ওপর হাত তুলে ঘুরে দাঁড়াল নিয়োগী। চলতে থাকল ওর ডান হাতে ধরা ড্রিলিং মেশিন। কেটে দিল রুমানা নাইলনের রশিটা। দড়াম করে পড়ছিল পা-টা মাটিতে, বাম পা ব্যবহার করে কৌশলে নামিয়ে আনল রানা সেটা আস্তে করে।

'হাতের বাঁধন—রুমানা, জলদি!' বলল রানা।

রুমানার হাতের রিভলভার স্থির হয়ে রয়েছে নিয়োগীর দিকে। রানার কণ্ঠস্বর শুনে পিছন ফিরে দেখবার চেষ্টা করল নিয়োগী। সাথে সাথেই ধমক খেল রুমানার কাছে।

'খবরদার! ঘুরে দাঁড়াও!'

ঝট্ করে পিছন ফিরল নিয়োগী।

হাতের বাঁধন খুলে যেতেই ছুরিটা নিয়ে নিজেই নাইলনের রশি কেটে আলগা করে দিল রানা পা থেকে।

'রিভলভারটা আমাকে দাও, রুমানা। টলছ কেন তুমি এমন করে? কি হয়েছে? এমনভাবে মারল কে তোমাকে? আমি এখানে আছি জানলে কি করে?'

একসাথে এতগুলো প্রশ্ন শুনে মলিন হাসি হাসল রুমানা। রিভলভারটা রানার হাতে দিয়ে পট্ পট্ করে জামার বোতাম খুলে দেখাল সে রানাকে। বুকে-পিঠে পোড়া পোড়া দাগ। চুরুটের আগুন ঠেসে ধরেছে কেউ বারবার। চাবুকের দাগও দেখতে পেল রানা। খুন চেপে গেল ওর মাথায়।

'কে? গোলাম হায়দার?' জিজ্ঞেস করল রানা। কঠিন হয়ে গেছে ওর মুখটা।

মাথা ঝাঁকাল রুমানা। এতক্ষণে লক্ষ করল রানা—শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে রুমানার।

'রুমানা, অনীতা গিলবার্টের বাঁধনটা একটু কেটে দেবে? এক্ষুণি এসে পড়বে লোবাক, প্রস্তুত থাকতে হবে আমাকে।'

এতক্ষণ অনীতাকে লক্ষই করেনি রুমানা। ঝট্ করে ফিরল সে অনীতার দিকে। তাড়াতাড়ি জামার বোতাম লাগাতে গিয়ে দেখল রানারই মতো প্রায় উলঙ্গ অনীতা গিলবার্ট। টলতে টলতে এগিয়ে গেল রুমানা। রানা সাহায্য করল একটা হাত ধরে। বাঁধন কেটে দিয়ে অনীতার সাহায্যে একটা খাটের ওপর বসে পড়ল রুমানা। বিছানার চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে লজ্জা নিবারণ করল অনীতা। এগিয়ে গেল রানা।

'আমরা এখানে আছি জানলে কি করে তুমি?' আবার প্রশ্ন করল রানা।

'গোলাম হায়দারের কাছে। বিশ মিনিট আগে। ওর ধারণা সাবমেরিনের কথা আমিই বলেছি তোমাকে। আজ নাকি সময় নেই, কাল আবার আসবে সত্যি কথাটা বের করবার জন্যে।'

'কোথায় গেল গোলাম হায়দার?' নিয়োগী নড়ে উঠল। 'খবরদার নিয়োগী!' জমে গেল নিয়োগী বরফের মত। একটা তোয়ালে টেনে নিয়ে কোমরে জড়িয়ে গিঁঠ দিয়ে নিল রানা।

'ওই তো সামনে একটা টিলার মাথায় কাঠের বাংলো আছে ওর। ইয়ট আর সাবমেরিন যে-কোনও মুহূর্তে ছাড়ার জন্যে প্রস্তুত রাখার হুকুম দিয়ে চলে গেছে সে ওই বাংলোয়।'

'টাকা ছাপার মেশিনটাও কি ওইখানেই?'

'না। ওটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে মাটির নিচের একটা ঘরে। চারপাশে মেশিনগান নিয়ে গার্ড আছে প্রায় বিশ-পঁচিশ জন। ওর কাঠের আড়তের বেশ খানিকটা পুবে।'

'এখান থেকে রাস্তা আছে টেকনাফ রোডে পড়বার?'

'হ্যাঁ, রোড দিয়েই তো এসেছে গোলাম হায়দার। কিন্তু জানা না থাকলে কেউ আসতে পারবে না পথ চিনে। উহ্। মাথাটা ঘুরছে আমার। আমি বোধহয় মরে যাচ্ছি, রানা।'

পড়ে যাচ্ছিল, একহাতে জড়িয়ে ধরল রানা ওকে। বিদ্যুতের মত ঘুরেই লাফিয়ে চলে এল নিয়োগী রানার কাছে। চকচক করে উঠল ওর হাতে ধরা ছুরিটা। চট্ করে ঘুরে রিভলভারটা ওর দিকে তাক করতে করতে এসে পড়ল

নিয়োগী। ট্রিগার টিপল রানা। খালি চেম্বারের ওপর খট্ করে পড়ল হ্যামার, গুলি বেরোল না। লাফিয়ে সরে গেল রানা খানিকটা। বুড়ো আঙুলে হ্যামারটা টেনেই ট্রিগার টিপল আবার। বুকের কাছে চলে এসেছিল নিয়োগীর উদ্যত ছোরা, সরে গেল সেটা হাত খানেক। ফরটি ফাইভ ক্যালিবারের বুলেট জোর ধাক্কা মারল নিয়োগীর বুকে। হুড়মুড় করে পড়ে গেল হাড্ডিসার লম্বা দেহটা রানারই ওপর। ছিটকে চলে গেল ছোরাটা খাটের তলায় হাত থেকে খসে।

ঠিক সেই সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল লোবাক।

ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল রানা নিয়োগীর দেহটা গায়ের ওপর থেকে। কিন্তু রিভলভারটা তাক করবার আগেই একখানা স্টীলের চেয়ার তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল লোবাক। হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল রিভলভারটা। একটা ক্রুদ্ধ গর্জন করে প্রকাণ্ড হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে পিঠটা একটু কুঁজো করে এগোল লোবাক রানার দিকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। মুখে-চোখে ওর পৈশাচিক ভয়াবহতা পিছিয়ে যাচ্ছে রানা। একলাফে রিভলভারের কাছে চলে গেল রুমানা। নিচু হয়ে ঝুঁকে তুলে নিচ্ছে সে রিভলভারটা মাটি থেকে। মাথাটা নিচু হয়ে রয়েছে বলে দেখতে পেল না সে লোবাককে। ডানপাশে পা ফেলে সরে এসেছে লোবাক দ্রুত গতিতে।

'রুমানা! পালাও!'

চিৎকার করে উঠল রানা। কিন্তু সাবধান হবার আগেই পৌঁছে গেল লোবাক ওর পিছন দিকে। দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরল সে রুমানার। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে ওর, রানার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে রয়েছে।

শিউরে উঠল রানা। দেখল হাতের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠছে লোবাকের। চাপ দিচ্ছে সে রুমানার মাথায়। ব্যথায় কুঁচকে গেছে মুখ, কুঁকড়ে গেছে দেহ—কি যেন বলবার চেষ্টা করল রুমানা। ভয়াবহ একটা মড়মড় শব্দ কানে এল রানার। নিজের অজান্তেই দাঁতে দাঁত চেপে ধরল সে। দেখল হঠাৎ কেঁপে উঠল একবার রুমানার দেহটা, ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল কান দিয়ে, পরমুহূর্তে অসাড় হয়ে গেল।

এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে তীক্ষ্ণ একটা অমানুষিক চিৎকার করেই ঢলে পড়ল অনীতা বিছানার ওপর।

মাথায় রক্ত চড়ে গেল রানার। ছুটে যাচ্ছিল সে লোবাকের দিকে। কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝতে পারল সেটা আত্মহত্যারই নামান্তর হবে। তক্তাটা তুলে জোরে মারল সে লোবাকের মাথা লক্ষ্য করে। আস্তে করে রুমানার মাথাটা তুলে ধরল লোবাক—বাড়িটা পড়ল রুমানার মাথায়। পরমুহূর্তেই মাথা ছেড়ে দিয়ে এক হাতে ধরে ফেলল সে তক্তাটা। একটানে রানার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ফেলে দিল সেটা একপাশে। রুমানার প্রাণহীন দেহটা লুটিয়ে পড়েছে মেঝের ওপর।

আবার পিঠ কুঁজো করে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে এগোল লোবাক রানার দিকে। পালিয়ে বেড়াতে লাগল রানা। একবার মুঠোর মধ্যে চলে

গেলেই সব শেষ।

খাটের নিচে হাত বাড়াল অনীতা। ছুরিটা তুলবার চেষ্টা করছে সে মাটি থেকে।

'সাবধান, অনীতা! মেরে ফেলবে!' দেখতে পেয়েই চিৎকার করে বলল রানা।

চট্ করে পিছন ফিরে চাইল একবার লোবাক। এইটুকু সময়ই চেয়েছিল রানা। একলাফে মেঝেতে কাৎ হয়ে থাকা চেয়ারটার পাশে চলে এল সে—মাথার ওপর তুলেই প্রাণপণ শক্তিতে মারল ছুঁড়ে লোবাকের দিকে। একটা বিকট শব্দ বেরোল লোবাকের মুখ থেকে। একটা পায়া বুকের ওপর লেগেছে জোরে। টলে উঠল, কিন্তু পড়ে গেল না লোবাক। আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল ওর মুখের চেহারা। এবার একলাফে অনেকটা কাছে এগিয়ে এল লোবাক।

তাড়াতে তাড়াতে একটা কোণে নিয়ে এসেছে লোবাক রানাকে। ওখান থেকে ওর হাত এড়িয়ে পালাবার কোনও রাস্তা দেখতে পেল না রানা। হঠাৎ কোমর থেকে একটানে তোয়ালেটা খসিয়ে নিয়ে খোলা অবস্থায় ছুঁড়ে মারল সে লোবাকের মুখের ওপর। তোয়ালে দিয়ে ঢেকে গেল লোবাকের চোখ। মাত্র দুই সেকেন্ড সময় পেল রানা। এক লাফে ডান-পাশে সরে গিয়ে লোবাকের হাতের কাছে দেয়ালের একটা তাকের ওপর থেকে মার্টিনি ভর্তি এক লিটারের একটা বোতল তুলে নিল সে। তোয়ালেটা সরিয়ে ফেলতেই প্রচণ্ড জোরে ভাঙল বোতলটা লোবাকের মাথার ওপর। চোখ মুখ ভেসে গেল তরল পদার্থে। ভাঙা কাঁচের বোতলটা দিয়ে জোরে খোঁচা দিল রানা লোবাকের গলা লক্ষ্য করে। আর্তনাদ করে উঠল লোবাব, লাফিয়ে সরে এল রানা। প্রকাণ্ড হাত দুটো প্রায় ধরে ফেলেছিল ওকে। গভীর একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে লোবাকের গলায়। প্রথমে স্যাদা, পরে লাল হয়ে উঠল জায়গাটা। একটা আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করল লোবাক ক্ষতস্থানটা।

পিছিয়ে যাচ্ছিল রানা মেঝের ওপর পড়ে থাকা রিভলভারের দিকে। বুঝতে পারল লোবাক রানার মতলব। দ্রুত এগিয়ে আসছে সে। একটা চেয়ার তুলে নিল সে বাম হাতে।

ঠিক এমনি সময় গ্লাস ভাঙা একটুকরো কাঁচের ওপর পড়ল রানার পা। লবণ পানির গ্লাস। বাঁ পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে সরে যেতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু পিছলে গেল পা-টা। পড়ে গেল রানা। পড়েই চোখ পড়ল একটা ভীত সন্ত্রস্ত কচি মুখের ওপর। ছোট্ট একটা মুখ দেখা যাচ্ছে পর্দার ফাঁকে। সে মুখে গিজগিজে দাড়ি। নিষ্পাপ সরল দুটো চোখ। গিলটি মিঞা।

মাথার ওপর তুলে নিয়েছে লোবাক স্টীলের চেয়ার। এক বাড়িতেই ঘিলু বেরিয়ে যাবে রানার। পিছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেল লোবাক—রানার চোখের বিস্মিত দৃষ্টি আগেই লক্ষ করেছে সে—আওয়াজ শুনে পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল।

বানরের মত একলাফে ঘরের ভিতর এসে দাঁড়িয়েছে গিলটি মিঞা। হাতে একটা ল্যুগার পিস্তল। কিন্তু হলে কি হবে, সামনে দৈত্যের মত লোবাককে দেখে অসম্ভব ভয় পেয়েছে সে। থর থর করে কাঁপছে পিস্তল ধরা হাত। সেই সঙ্গে ঠকাঠক বাড়ি খাচ্ছে দুই হাঁটু।

গর্জে উঠল গিলটি মিঞার হাতের পিস্তল। ও-ই ছুঁড়ল, না গুলিটা আপনা-আপনি বেরিয়ে গেল ঠিক বুঝতে পারল না রানা; শুধু অনুভব করল ওর কানের এক ইঞ্চি দূর দিয়ে সাঁ করে চলে গেল বুলেটটা।

ছুঁড়ে মারল চেয়ারটা লোবাক গিলটি মিঞার মাথা লক্ষ্য করে। বাউলি কেটে সরে গেল গিলটি মিঞা। এবার এগোল লোবাক গিলটি মিঞার দিকে বিদ্যুৎ-গতিতে। রানা বুঝল, গিলটি মিঞাকে আরেকবার গুলি ছোঁড়ার সুযোগ দিলেই নির্ঘাৎ মারা পড়বে সে। লাফিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে রিভলভারটা তুলে নিল সে মেঝে থেকে। পরপর দু'বার অগ্নিবর্ষণ করল রিভলভার। পাশাপাশি দুটো গর্ত সৃষ্টি হলো লোবাকের মাথার পিছনে। প্রকাণ্ড হাত দুটো আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে ওপরে উঠল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে সামনের দিকে।

লাফিয়ে সরে গেল গিলটি মিঞা। সাথে সাথেই ওর হাতের পিস্তল থেকে 'বুম' করে গুলি ছুটে লাগল গিয়ে ঘরের ছাতে।

তেরো

'সব্বোনাশ! তিনশো দুইয়ে (মার্ডার কেস) ফেঁসে যাব না তো, স্যার? থ্রী সেবেনটি নাইন (চুরি) কি ফোর ইলেভেনকে (বমাল গেস্তার) কুছ পরোয়া করিনে, কিন্তুক মার্ডার কেসে জীবনে পড়িনি, স্যার। ওসবের মদ্যে আমাকে পাবেন না।' তিন তিনটে মৃতদেহ দেখে ঘাবড়ে গেল গিলটি মিঞা।

'তোমার কোন ভয় নেই,' বলল রানা। তোয়ালেটা কোমরে পেঁচিয়ে নিয়ে মৃতদেহ তিনটে সংক্ষিপ্ত ভাবে পরীক্ষা করেই উঠে দাঁড়াল সে। অনীতার পাশে গিয়ে বলল, 'পাশের ঘরে চলো অনীতা। তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের।'

পাশের ঘরটা সিক বে। ঘরগুলো সাউন্ড প্রুফ করা রানা বুঝল এজন্যেই গোলাগুলির শব্দ শুনে ছুটে আসেনি কোন লোক। দরজাটা ভিতর থেকে লাগিয়ে দিয়ে কাবার্ড খুলে এক বোতল ব্র্যান্ডি বের করল রানা। তিনটে গ্লাস নিচ্ছিল রানা, নিষেধ করল গিলটি মিঞা।

'আমি ওসব খাই নে, স্যার। খিদে লেগেছিল, ভরপেট পানি খেয়ে নিয়েচি টইটম্বুর করে। পেটের ভেতর ঢক্ ঢক্ করচে ভরা কলসীর মত। সেই কাল রাত্তির থেকে...'

'তুমি এখানে এলে কি করে, গিলটি মিঞা? এই পিস্তলই বা পেলে কোথায়?'

'এইচি গাড়ি চড়ে। পেস্তলটা পেইচি কানা হারামীটার সুটকেসের মদ্যে।'

'গাড়ি চড়ে এলে কি করে?'

'আর বলবেন না, স্যার, বড় কষ্ট পেইচি। কাল সোন্দের সময় দেকি তিন তিনটে গাড়ি তোয়ের হচ্চে। সবচেয়ে বড় গাড়িটার পিছনে উটে পড়লুম। মাল রাকবার জায়গায়। অন্দোকারে আমার ওপরই দুটো সুটকেস চাপিয়ে দিলে শালারা। তারপর গাড়ি ছেড়ে দিলে। একটা বাক্সের ভেতর থেকে সুগন্দো আসছিল—ওতে আর হাত দিলুম না, স্যার—বুজলুম ইস্তিরিলোকের। অন্য বাক্সোটার ভেতর পেলুম এই পেস্তল আর এইটা।' ইশারায় বুক পকেটে আঁটা পারকার সিক্সটি ওয়ানের দিকে দেখান গিলটি মিঞা।

'তারপর?'

'তারপর সেঁটে ঘুম দিলুম। অটুকুন জায়গায় কি ভাল ঘুম হয়? ঘাড় ব্যথা হয়ে গেচে আমার। ঘুম থেকে উটে দেকি বাক্স দুটো গায়েব। বেরিয়ে দেকি শেষ রাত্তির, গ্যারেজের দরজা চিচিং ফাঁক। কাঠের একটা বাংলো দেকা যাচ্চে চুনকাম করা। ঢুকে পড়লুম। ওখানেই এক ওয়াড্রোবের ভেতর ডেঁড়িয়ে আপনার সব খবর শুনলুম—তা ঘন্টা দু'য়েক আগে তো হবেই।'

'এখানে এলে কি করে? অমন কাঁপছিলেই বা কেন? আরেকটু হলে তো সাবড়ে দিয়েছিলে আমাকেই।'

'আর লজ্জা দেবেন না, স্যার। ভয় পেয়েছিলুম খুব, সব্বো শরীল আপনা আপনি কাঁপতে আরাম্ভ করে দিলে। সেই রায়েটের সময় ক্যালক্যাটায়···'

'ইয়টে কোন লোকজন দেখলে না? বাধা দিল না কেউ?' ওকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, স্যার। কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগল। তবে দু'একজন লোক যে একেবারেই চোকে পড়েনি, তা নয়। নুকিয়ে উটে পড়েচি। একেবারে ডাঙার সঙ্গে লাগানো রয়েচে তো ইস্টিমারটা। অনেক খুঁজে এই ঘর বের করতে হয়েচে।'

'ক্রু, ক্যাপ্টেন এরা সব গেল কোথায়! আশ্চর্য তো!'

ফোন বেজে উঠল সিক-বেয়। রেডিও-টেলিফোন। রিসিভার তুলে কানে লাগাল রানা।

'কে? নিয়োগী?'

'হ্যাঁ।' ডক্টর নিয়োগীর কণ্ঠস্বর নকল করবার চেষ্টা করল রানা।

'আমি সামন্ত। কাজ শেষ?'

'আমার কাজ শেষ। এখন বাকিটুকু লোবাকের হাতে ছেড়ে দিয়ে তামাশা দেখছি।'

'চলে এসো। জরুরী কনফারেন্স বসেছে। সবাই উপস্থিত। তুমিও চলে

এসো।'

'হঠাৎ? কি ব্যাপার?'

'আমাদের পালাতে হতে পারে। কিছুক্ষণ আগে দুটো সী-প্লেন মাথার ওপর দিয়ে পাক খেয়ে গেছে। খবর এসেছে দুটো পাকিস্তানী ডেস্ট্রয়ার রওনা হয়ে গেছে। এই দিকেই আসছে ওগুলো। মিলিটারি এরিয়াতেও নাকি অস্বাভাবিক তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। নিচে এসে সব শুনো। চাবিগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে—লোক থাকবে গেটের সামনে।'

'গোলাম হায়দার?'

'ও আছে বাঙলোতে। ওই ছুঁড়িটার সঙ্গে। দরকার হলে ওকে ফেলে রেখেই চলে যাব আমরা। কুইক!'

ছেড়ে দিল ওধারের রিসিভার। এক লাফে পাশের ঘরে গিয়ে নিয়োগীর ইউনিফরমটা খুলে পরে নিল রানা। একটু আঁটা হলো। কিন্তু জুতো জোড়া পায়ে লাগল না। ইয়টে লোক নেই কেন এতক্ষণে বুঝতে পারল রানা। সবাই আছে কনফারেন্সে। খুব সম্ভব প্রত্যেকটি লোকই ভারতীয়। যাই হোক, ঝুঁকিটা নিতে হবে রানাকে। অনীতাকে নিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকবার আদেশ দিল সে গিলটি মিঞাকে। রানা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পাঁচ মিনিট পর ইয়ট থেকে নেমে গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়বে ওরা।

সিক-বে থেকে বেরিয়ে খানিকদূর এগোতেই সমুদ্রের একাংশ চোখে পড়ল রানার। ডুবে যাচ্ছে সূর্যটা। পশ্চিমের আকাশ লালচে ছায়া ফেলেছে সাগরের বুকে। অল্পক্ষণেই আঁধার হয়ে যাবে চারদিক। তাড়াতাড়ি সারতে হবে সব কাজ।

সী-প্লেন যে কেন ইয়টটাকে খুঁজে পায়নি বুঝতে পারল রানা। সাগরতীরের খাড়া উঁচু দুটো জঙ্গলে ছাওয়া টিলার মাঝখান দিয়ে গভীর করে কেটে বেশ খানিকটা ভিতরে নিয়ে ইয়টটা নোঙর করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘন গাছপালায় ছেয়ে আছে জায়গাটা। আকাশ থেকে সহজে কারও চোখে পড়বে না। দ্রুত এগিয়ে চলল রানা গোলাম হায়দারের কেবিনের দিকে। জাহাজের নিচে নামবার অন্য কোন রাস্তা ওর জানা নেই—জানা থাকলেও সেদিক দিয়ে নামা ঠিক হত না হয়তো, কারও চোখে পড়ার সম্ভাবনা আছে।

ঠিকই বলেছিল গিলটি মিঞা। ফাঁকা ফাঁকা লাগছে ইয়টটা। দু'একজন এটা-ওটা নিয়ে ব্যস্ত আছে, ইন্ডিয়ান নেভির পোশাক দেখে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করল না কেউ রানাকে। তবে কি এই ইয়টের বেশির ভাগ লোকও সাপ্লাই দিয়েছে ইন্ডিয়া?

গোলাম হায়দারের কেবিনটা খোলা। ভিতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল রানা। গুপ্ত পথের দরজাটাও খোলা। পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে নিচে। গোলাম হায়দার? উঁকি দিয়ে দেখল রানা নিচের দিকে। অন্ধকারে বোঝা গেল না। দূরে চলে যাচ্ছে শব্দটা। পনেরো সেকেন্ড অপেক্ষা করে নেমে এল

রানা সিঁড়ি বেয়ে। দুটো মোড় ফিরতেই স্বল্পালোকিত সেই করিডরটা দেখতে পেল রানা। মাথা বাড়িয়ে এদিক-ওদিক চেয়েই দেখতে পেল সে লোকটিকে। গোলাম হায়দার নয়—স্টুয়ার্ড। একা।

লোকটা মোড় ঘুরতেই পা টিপে চলে এল রানা মোড়ের কাছে। সোজা গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল স্টুয়ার্ড। তেমনি বাল্‌ব জ্বলছে দরজার মাথায়। কী-বোর্ডের ঢাকনিটা তুলে একটু বিস্মিত হলো স্টুয়ার্ড। এবার জোরে তিনটে টোকা দিল সে দরজার উপর। দরজাটা ফাঁক হলো একটু। একটা সাবমেশিনগানের নল বেরিয়ে এল ফাঁক দিয়ে, পরীক্ষা করা হলো নিজেদের লোক কিনা, তারপর খুলে গেল দরজা। একরাশ ধোঁয়া বেরিয়ে এল। আবছা মত একজন লোক দেখতে পেল রানা। পরমুহূর্তেই ক্লিক করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল রানা। দ্রুত চিন্তা চলছে ওর মাথার মধ্যে। যতদূর সম্ভব শুধু একজন লোক আছে গেটে। কিন্তু ধোঁয়া কেন? ধোঁয়া না বাষ্প? এঞ্জিনরুমের কাছাকাছি কি এই দরজাটা? এই দরজা দিয়ে ঢুকলে সাবমেরিনের ঠিক কোন্ অংশে পৌঁছবে সে?

সাবমেরিনের মোটামুটি আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ে কিছুক্ষণ মাথা ঘামাল রানা। তারপর এগিয়ে গেল আর্মার্ড স্টীলের দরজাটার সামনে। গুণে গুণে টোকা দিল তিনটে। মাথাটা বাম ধারে কাত করে রেখে এমন ভাবে দাঁড়িয়েছে সে যাতে দরজা ফাঁক করেই ইন্ডিয়ান নেভির ইউনিফরমটা দেখতে পায় প্রহরীটা। রিভলভার ধরা ডান হাত আড়ালে রাখল রানা। দরজা ফাঁক হলো একটু। সোজা রানার পেটের দিকে ধরা সাব-মেশিনগানের মুখ। আর একটু ফাঁক হলো দরজা। আবছা একটা মুখ দেখতে পেল রানা আড়-চোখে। ব্যারেলের মুখটা সরে গেছে রানার পেটের ওপর থেকে। একপাশে সরে ঢুকবার জায়গা করে দিয়েছে প্রহরী ইউনিফরম দেখে।

দড়াম করে রিভলভারের নল পড়ল প্রহরীর নাকের উপর। পিছিয়ে গেল সে এক পা। রানা ঢুকে পড়েছে ভিতরে। আবার মারল সে প্রচণ্ড জোরে লোকটার কানের পাশে। লুটিয়ে পড়ল প্রহরী জ্ঞান হারিয়ে। শূন্যেই ধরে ফেলল রানা সাব-মেশিনগানটা।

দরজার চাবিটা খুলে পকেটে রাখল রানা, তারপর বল্টু লাগিয়ে দিল—যাতে পিছন থেকে এসে কেউ আক্রমণ করে বসতে না পারে। ঘুরে দেখল ছোট একটা প্ল্যাটফরম, তারপরেই সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে। ধোঁয়াটা আসছে একটা একজস্ট লিকেজ থেকে। এঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আশপাশে কাউকে দেখতে পেল না সে। ইন্ডিয়ান সাবমেরিনের মধ্যে চলে এসেছে সে এখন। রিভলভারটা পকেটে গুঁজে তর তর করে নেমে এল রানা সিঁড়ি বেয়ে।

বেশিক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতে হলো না। এঞ্জিনরুমের পাশ দিয়ে কিছুদূর যেতেই একটা খোলা দরজা দিয়ে অনেক লোক দেখতে পেল রানা। সারি

সারি চেয়ারে বসে কারও বক্তৃতা শুনছে ওরা। কেউ কেউ ফিরে চাইল ওর দিকে, তারপর আবার মন দিল বক্তৃতায়। দূর থেকে নিজেদেরই লোক মনে করেছে ওরা রানাকে। এগিয়ে গেল সে।

পিছন থেকে ঢুকল রানা কন্‌ফারেন্স-রুমে। ডায়াসের ব্যবস্থা নেই—তবে তিনটে চেয়ার শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে ফেরানো। একজন উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, আর দু'জন বসে আছে পায়ের উপর পা তুলে। রানা বুঝল এই তিনজনই সাবমেরিনের সবচেয়ে উচ্চপদস্থ অফিসার।

সবাইকে চমকে দিয়ে গর্জে উঠল রানার হাতের সাব-মেশিনগান। এক ঝাঁক গুলি উড়ে গেল বক্তার মাথার উপর দিয়ে। হাঁ করে কোন কথা বলতে যাচ্ছিল বক্তা—সেই রকমই রয়ে গেল মুখটা। বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল সে রানার দিকে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এদিকে মুখ করা অফিসার দু'জন।

'খবরদার! কেউ এক পা নড়লেই খুন হয়ে যাবে!' গর্জে উঠল রানা। 'ইয়ট আর সাবমেরিন আমরা দখল করে নিয়েছি। মাথার উপর হাত তোলো সবাই!'

ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে সবাই এ-ওর মুখের দিকে চাইল। বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করল ওরা রানার কথা। দখল করে যদি না-ই নেবে তাহলে একজনের পক্ষে এত বড় সাহস করা কি করে সম্ভব হয়? কারণ, ওই সামান্য অস্ত্র দিয়ে বড় জোর দশজন লোককে ঘায়েল করতে পারবে সে একা—কন্‌ফারেন্স-রুমেই কেবল ওরা আছে একশোরও বেশি লোক। কাজেই নিশ্চয়ই আরও বহু লোক আছে এর পিছনে।

'তোমরা তিনজন সোজা হেঁটে বেরিয়ে এসো বাইরে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমরা, সামনের তিনজন। কুইক মার্চ। বাকি সবাই যেমন বসে আছ তেমনি থাকো। বাধা দেয়ার চেষ্টা না করলে তোমাদের ভয়ের কিছুই নেই। তোমাদের কারও ওপরেই কোন রকম অত্যাচার করা হবে না। আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা বড় ক্ষমাশীল দয়ালু জাতি। কই, থেমে দাঁড়ালে কেন, সোজা বেরিয়ে এসো।'

সামনের লোকটা থেমে দাঁড়িয়ে একজনকে কিছু বলতে যাচ্ছিল নিচু গলায়, ধমক খেয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। এগোবার ইঙ্গিত করল রানা ওদের। মাথার ওপর হাত তুলে সামনে এগোল তিনজন অফিসার।

'ইয়টে যেতে হবে তোমাদের। কোনও রকম কৌশল করবার চেষ্টা করলে নির্ঘাত মারা পড়বে।'

সামনে-পিছনে তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে চলল রানা ওদের পিছন পিছন কন্‌ফারেন্স-রুমের দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে। দশ পা এগোতে না এগোতেই শুনতে পেল উচ্চকণ্ঠে কিছু বলছে একজন লোক কন্‌ফারেন্স-রুমের ভিতর। স্বরটা চিনতে পারল রানা—স্টুয়ার্ড। চিনে ফেলেছে সে রানাকে। এখন নিশ্চয়ই সবাইকে বলছে যে আসলে আর্মি বা নেভি দখল করে নেয়নি ইয়ট বা সাবমেরিন—ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়েছে মাসুদ রানা। ওকেই বন্দী

করে এনে নির্যাতন করা হচ্ছিল, কোন গতিকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে।

'জলদি হাঁটো! কুইক মার্চ!' ধমকে উঠল রানা পিছন থেকে।

বারবার পিছনে চাইতে হচ্ছে বলে দূরত্ব বজায় রাখতে হচ্ছে রানার সামনের তিনজনের কাছ থেকে। নইলে পিছনে চাইবার সুযোগে আক্রমণ করে বসতে পারে। রানার তাড়াহুড়োতে সন্দেহ করল ওরা। গতি কমিয়ে দিল আরও।

এমনি সময় কন্‌ফারেন্স-রুমের দরজা খুলে গেল দু'পাট। দুই সেকেন্ড অপেক্ষা করল রানা। তারপর এক ঝাঁক গুলি গিয়ে লাগল দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসা ছয়-সাতজন লোকের গায়ে। আর্তনাদ করে পড়ে গেল তিনজন তৎক্ষণাৎ। বাকি চারজন জখম হয়েছে কেবল—তারা আরও জোরে চেঁচাচ্ছে। এঞ্জিনরুমের কাছে মোড় ঘুরেই অন্যদিকে যাচ্ছিল সামনের তিনজন। এগিয়ে এসে মাঝের লোকটার পাঁজরের উপর গুঁতো মারল রানা সাব-মেশিনগানের নল দিয়ে।

'এরপর গুলি ঢুকবে ওই জায়গাটা দিয়ে। সোজা চলো, শয়তান!'

এবার পা চালাল ওরা। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই জ্ঞানহীন প্রহরীকে দেখে টের পেলে ওরা রানার ধোঁকাবাজি। কিন্তু এখন বুঝে তেমন লাভ নেই। ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে ওরা।

আরেক ঝাঁক গুলিবর্ষণ করল রানা। পিছন পিছন আসছিল অনেক লোক, কয়েকজনকে পড়ে যেতে দেখে থমকে দাঁড়াল আবার। সামনের লোকটা বল্টু খুলে ফেলেছে ইয়টে যাবার স্টীলের দরজার। হঠাৎ উঁচু গলায় তেলেগু ভাষায় কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করল সে। রানা তার এক বর্ণও বুঝল না।

'শাট আপ! আর একটা কথা বললে মুখ বন্ধ করে দেব চিরকালের মত। আগে বাড়ো!'

তিনজনই চলে গেল সাবমেরিন ছেড়ে ইয়টে। প্ল্যাটফরমের উপর পড়ে থাকা জ্ঞানহীন প্রহরীর বেল্ট থেকে একটানে বের করে নিল রানা বাঁকা একটা এক্সট্রা ম্যাগাজিন। দরকার হতে পারে।

আর্মার্ড স্টীলের দরজায় চাবি লাগিয়ে দিল রানা। চাবিটা বের না করে রেখে দিল গর্তের মধ্যে একটু বাঁকিয়ে, যাতে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ওপাশ থেকে কেউ দরজা খুলতে না পারে।

সোজা ইয়টের ব্রিজের দিকে এগোচ্ছিল রানা, হঠাৎ চোখে পড়ল ডান ধার থেকে মাথার ওপর হাত তুলে ওর দিকে এগিয়ে আসছে তিনজন ক্রু। ওদের পিছনে বালকসুলভ একটা চেহারার একাংশ দেখতে পেল সে চকিতে। অনীতাকে জঙ্গলে রেখে ফিরে এসেছে গিলটি মিঞা।

রানাকে দেখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গিলটি মিঞার মুখ।

'আপনাকেই খুঁজছিলুম, স্যার। এই তিন শালা মাহা গোলমাল শুরু করে দিলে। তাই এদের নিয়েই খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'তুমি আবার ফিরে এলে কেন, গিলটি মিঞা?'

'আর বলবেন না, স্যার। হঠাৎ একটা কতা মনে পড়ে গেল। বৌদিকে জঙ্গলের মধ্যে নুকিয়ে রেখে পেস্তল নিয়ে চলে এলুম।'

'বৌদি! বৌদিটা আবার কে?'

'ওই অনীতা বৌদি।'

অনীতাকে গিলটি মিঞা রানার স্ত্রী ভেবে বসেছে বোধহয়। যাই হোক, এসব নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার সময় নেই। ছয়জন লোককে সাব-মেশিনগানের মুখে নিয়ে ঢুকল সে ব্রিজে। পিছন পিছন রানার পায়ে পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে ঢুকল গিলটি মিঞা।

'কি কথা মনে পড়ে গেল, গিলটি মিঞা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তেমন কিচুই নয়, স্যার। এই ইস্টিমারে উটবার খানটেক আগে চারটে পেলেন দেকেছিলুম। মাতার ওপর চক্কোর মারচিল। গাচে উটে রুমাল নেড়ে দিইচি। শালারা নেবে পড়েচে পানিতে।'

'তুমি দেখেছ নামতে?' জিজ্ঞেস করল রানা আগ্রহের সঙ্গে।

'দেকেচি। উই উদিক নেবেচে।'

'তুমি এক কাজ করো, গিলটি মিঞা। এই মেশিনগানটা এদের দিকে ধরে বসে থাকো। বিশটা গুলি আছে এর মধ্যে। যদি একটা লোককে একটু নড়াচড়া করতে দেখো, সবগুলোকে শেষ করে দেবে। এই জায়গাটা টিপে ধরে খালি ওদের ওপর একবার এপাশ থেকে ওপাশ বুলাবে। একজনের দিকেই আবার ধরে রেখে দিয়ো না—সব গুলি শেষ হয়ে যাবে। তোমার গুলি তো আবার ছাতে গিয়ে লাগে—পেট বরাবর ধরবে। পারবে না?'

'নিশ্চয় পারব, স্যার।'

বানরের মত একলাফে একটা টেবিলের ওপর উঠে বসল গিলটি মিঞা। নতুন ম্যাগাজিনটা ভরে রেডি করে ওর হাতে দিল রানা। হুঙ্কার ছাড়ল গিলটি মিয়া, 'নড়েচ কি মরেচ! খবোদ্দার, পিচন ফিরে ডেঁড়িয়ে থাকো সবাই। একটা হাঁচি দিলেও গুলি খাবে!'

সোজা ওয়্যারলেস রুমে ঢুকল গিয়ে রানা। পি. সি. আই.-এর সিগন্যাল ট্যাপ করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল। সংক্ষেপে হেড অফিসে রিপোর্ট করল রানা। সাবমেরিনের খবরও জানাল। পজিশন দিল ২০·৫ নর্থ—৯২·১৫ ঈস্ট। তারপর বেরিয়ে এল রেডিও রুম থেকে।

মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখতে পেল সে ছানাবড়া হয়ে গেছে ওয়্যারলেস অপারেটারের চোখ। খপ করে তুলে নিয়েছে সে মেজর জেনারেলের পার্সোনাল টেলিফোন। মেসেঞ্জার পাঠাবার সময় নেই। খবর শুনেই চমকে উঠবে বুড়ো। কাঁচা-পাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে যাবে। হুলস্থূল পড়ে যাবে সারা অফিসে। পঁচিশ মিনিটের মধ্যে ফাইটার বম্বার এসে যাবে গোটা কতক। ল্যান্ড ফোর্স রওনা হয়ে যাবে বিরাট সব ট্রাক, হাফ-ট্রাক নিয়ে। ইন্ডিয়ান নেভি-ত্রাস পাকিস্তানী সাবমেরিন গাজী আসবে তেড়ে—রানা জানে কাছাকাছি কোথাও আছে ওটা। সেই সাথে তৎপর হয়ে উঠবে অনেকগুলো দেশ—কারণ

এই মেসেজ ইন্টারসেপ্ট করেছে আশপাশের পাঁচ ছয়টা রাষ্ট্র। ওয়ার্লড ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে ব্যাপারটা।

গ্যাং-ওয়ে দিয়ে নেমে গেল রানা ডাঙায়। সন্ধে হয়ে আসছে। দ্রুত পা চালাল সে।

গোলাম হায়দারের সঙ্গে বোঝাপড়া বাকিই রয়ে গেছে। ওকে পালাবার সুযোগ দিলে চলবে না।

চোদ্দ

বেশ উঁচু টিলাটা। অর্ধেক উঠেই হাঁপিয়ে গেল রানা। কাহিল লাগছে শরীরটা। পায়ের কব্জি আর কানের লতির ব্যথাটা টনটন করতে আরম্ভ করেছে। এছাড়া সারাদিনের না খাওয়ায় এবং জ্ঞানহীন দেহের ওপর লোবাকের অত্যাচারে দুর্বল হয়ে পড়েছে সে। একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে বিশ্রাম নিয়ে নিল দু'তিন মিনিট।

চোখা লোহার শিক বসানো উঁচু ইঁটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা পুরো টিলাটা। টিলার পুব দিকটা অত্যন্ত খাড়া। প্রায় নব্বই ডিগ্রি। তাই টিলার গায়ে পনেরো ফুট চওড়া আর দশ ফুট উঁচু খাঁজ কেটে রাস্তা তৈরি করতে হয়েছে পুব দিকে। গোল হয়ে কয়েক পাক খেয়ে উঠে গেছে রাস্তাটা টিলার মাথায়। পুব দিক থেকে চাইলে খাড়াভাবে নিচের দিকে দেখা যায় শিকগুলো। কোনমতে পা পিছলে পড়ে গেলেই খতম। ওদিক থেকেই দেয়ালটা টপকে এপাশে এসেছে রানা।

গেলাম হায়দারকে কি পাওয়া যাবে বাঙলোতে? প্লেন দেখে পালিয়ে যায়নি তো? নাকি ঘরের মধ্যে ছিল বলে প্লেন দেখতেই পায়নি সে? দেখা যাক।

উঠে পড়ল রানা। রাস্তা ছেড়ে ঝোপঝাড় মাড়িয়ে উঠতে আরম্ভ করল সে পশ্চিম দিক থেকে। বাঙলোর পিছন দিক দিয়ে উঠতে চায় সে।

গাড়িটা গ্যারেজেই আছে দেখে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো রানা। সামনের দরজা খোলা। প্রথমেই ড্রইংরুম। খালি। তার পাশেই খাবার ঘর। মাঝারি সাইজের ডাইনিং টেবিলের দু'ধারে দুটো দুটো করে চারটে চেয়ার। খোলা দেয়াল-আলমারিতে থরে থরে চীনা মাটির ডিশ, পট, ছুরি, কাঁটা-চামচ আর ট্রে সাজানো। এক কোণে মিটসেফ—তার পাশেই কেরোসিনের রিফ্রিজারেটার। খোলা দরজা দিয়ে অ্যাটাচড বাথরুমের হাত মুখ ধোয়ার সাদা বেসিন দেখা যাচ্ছে। সিঁড়ির ওপর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল রানা।

দু'জন লোক নিচে নেমে আসছে কথা বলতে বলতে। শেষের কথা

কয়টা শুনতে পেল সে। লাফিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ডটা বুকের ভিতর। গোলাম হায়দার! বলছে, '...ঠিক বুঝতে পারছি না, নাজনীন। কেউ কোনও জবাব দিচ্ছে না ইয়ট থেকে। এখুনি যেতে হবে আমাকে।'

'আমিও যাব!' আবদার ধরল নাজনীন।

'না।' একটু যেন কঠিন শোনাল গোলাম হায়দারের কণ্ঠস্বর। বিপদের গন্ধ পেয়েছে সে। সেন্টের সুবাস আর ভাল লাগছে না ওর। 'তুমি এখানেই থাকো। আমি এখুনি ফিরে আসছি।'

প্রথমে ঢুকল নাজনীন, তার পিছন পিছন ঘরে ঢুকল গোলাম হায়দার। ঠোঁটের কোণে একটা সিগারেট লাগানো। সময় দিল রানা গোলাম হায়দারকে তিন পা এগিয়ে যাবার, তারপর বেরিয়ে এল দরজার আড়াল থেকে।

'এই যে, গোলাম হায়দার! কোথায় চললে?'

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল গোলাম হায়দার। অস্ফুট একটা বিস্ময়ধ্বনি বেরিয়ে পড়ল নাজনীনের মুখ থেকে। ডান হাতে খামচে ধরল সে গোলাম হায়দারের কোটের আস্তিন। এক ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিল সেটা গোলাম হায়দার। জিভ দিয়ে নিয়ে এল সিগারেটটা ঠোঁটের কোণ থেকে মাঝখানে।

'আমিই এসে পড়েছি, তোমার আর কষ্ট করে নিচে যেতে হবে না,' বলল রানা। 'শেষবারের মত আল্লার নাম ডেকে নাও।'

রিভলভারটার দিকে চাইল গোলাম হায়দার। নীরবে একবার রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলিয়ে সবটা ব্যাপার বুঝে নিল অক্লেশে। ইন্ডিয়ান নেভির ইউনিফরম, খালি পা, কানের লতিতে রক্ত, রুমানার রিভলভার—কিছুই এড়াল না ওর চোখ। ঠোঁট থেকে হাতে নিল সে সিগারেটটা, তারপর টোকা দেয়ার ভঙ্গিতে ছুঁড়ে মারল সেটা রানার মুখের দিকে। পরমুহূর্তে লাফিয়ে সরে গিয়ে এক লাথি মারল রানার রিভলভার ধরা হাতে। ভয়ে চিৎকার করে উঠে খোলা দরজা দিয়ে ছুটে পালাল নাজনীন।

জ্বলন্ত সিগারেটটা সোজা এসে লেগেছে রানার বাঁ চোখের কোণে। মুহূর্তের জন্যে অন্ধ হয়ে গেল রানা। রিভলভারটাও ছিটকে চলে গেল দূরে। এগিয়ে এসে ঘুসি চালাল গোলাম হায়দার ওর চিবুক লক্ষ্য করে। আন্দাজে ডান দিকে ঘুরে গেল রানা ঘুসিটা লাগবার ঠিক আগের মুহূর্তে। বাম কাঁধের ওপর দিয়ে ফস্কে বেরিয়ে গেল ঘুসিটা। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে বাম হাতে রানার পেট লক্ষ্য করে চালাল গোলাম হায়দার এক ভয়ঙ্কর লো লেফ্ট সুইং। সরে যাবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু এক চোখ দিয়ে পানি ঝরছে, আরেক চোখে খরখরে ছাই। এই ঘুসিটা পুরোপুরি কাটাতে পারল না সে, টলে উঠল ঘুসি খেয়ে। মনে হলো যেন সাঁতার কাটছে। অন্ধের মত দুই হাত বাড়িয়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল রানা গোলাম হায়দারকে।

দুর্দান্ত শক্তি গোলাম হায়দারের গায়ে। ফোঁস ফোঁস করছে সে ক্রুদ্ধ বেড়ালের মত। আবার ঘুসি চালাল সে। এক লাথিতে টেবিল উল্টে দিয়ে সরে গেল রানা। দ্রুত চোখ মিটমিট করে ছাইগুলো সরাবার চেষ্টা করছে সে। এখনও আবছা দেখছে সে গোলাম হায়দারকে। আবার ছুটে এল গোলাম

হায়দার। একটু পিছন দিকে হেলে বাঁ হাতটা ধরে ফেলল রানা ওর, ধরেই হ্যাঁচকা টান দিল নিজের দিকে। পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড জোরে হাঁটু দিয়ে মারল গোলাম হায়দারের তলপেটে। ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না রানা, তাই ঠিক যেখানটায় মারতে চেয়েছিল সেখানে লাগল না হাঁটুটা। কিন্তু এতেই ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল গোলাম হায়দার। চিবুকটা উঁচু করে পড়ে যাচ্ছিল সে, রানার প্রচণ্ড রাইট হুক পড়ল চিবুকের উপর। দুই পাটি দাঁত বাড়ি খেলো খট্ করে, ছিটকে পড়ল সে খোলা দেয়াল-আলমারির ওপর। ঝন্ ঝন্ করে কয়েকটা প্লেট, গ্লাস আর কাঁটা-চামচ পড়ল মাটিতে। কিন্তু দুই পায়ে খাড়া রইল গোলাম হায়দার। এক হাতে চেপে ধরেছে সে তলপেট। হঠাৎ মাংস কিমা করবার একটা ছুরি তুলে নিল সে তাক থেকে। এগোচ্ছিল রানা, থমকে দাঁড়াল, লাফিয়ে সরে গেল ছুরিটা ছুটে আসতেই। রানার গলায় আঁচড় কেটে মিটসেফের ওপর গিয়ে পড়ল ছুরিটা—তার কেটে ঢুকে গেল ফলাটা ভিতরে। ততক্ষণে একটা কাঁটা-চামচ তুলে নিয়েছে গোলাম হায়দার। ডার্ট ছোঁড়ার মত ছুঁড়ে মারল সে কাঁটা-চামচটা কাঁটাগুলো সামনের দিকে করে। ইউনিফরম ভেদ করে সেটা এসে বিঁধল রানার বাম বাহুতে। আরেকটা কাঁটা-চামচ তুলে নিচ্ছে সে তাক থেকে। হাত থেকে কাঁটা-চামচটা বের করে ছুঁড়ে মারল রানা ওর দিকে—তারপর লাফিয়ে উঠে জোড়া পায়ে লাথি মারল পাঁজর লক্ষ্য করে। কাঁটা-চামচের আঘাত বাঁচাতে গিয়ে মাথা নিচু করল গোলাম হায়দার, লাথিটা পড়ল ঠিক জায়গা মত। দেয়ালের সঙ্গে জোরে ঠুকে গেল ওর মাথা। রানাও পড়ল মাটিতে।

রানা আশা করেছিল ঝাঁপিয়ে পড়বে গোলাম হায়দার, এবং সেজন্যে প্রস্তুতও ছিল। কিন্তু তা করল না। হঠাৎ উল্টানো টেবিলটা টপকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল সে ডাইনিংরুম থেকে। নিশ্চয়ই গ্যারেজের দিকে ছুটেছে গোলাম হায়দার। পালাতে চাইছে সে।

তড়াক করে উঠে ছুটল রানা পিছু পিছু। ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার নেমে গিয়েছে, বাইরের অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার আলোয় দেখল রানা বাড়ির ডানধারের কোণটা ঘুরে সত্যিই দৌড়াচ্ছে গোলাম হায়দার গ্যারেজের দিকে।

রানা যখন কোণটা ঘুরল তখন গাড়ির সামনের দরজাটা খুলে ফেলেছে গোলাম হায়দার। কিন্তু ড্রাইভিং সীটের দরজা না খুলে এপাশের দরজা খুলছে কেন? নিশ্চয়ই পিস্তল বের করছে সে। প্রাণপণে দৌড় দিল রানা। পিছন থেকে পিঠের ওপর প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল গোলাম হায়দার সীটের ওপর। পা ধরে হিড় হিড় করে টেনে দেহের অর্ধেকটা বের করে আনল রানা, পায়ের গোড়ালি দিয়ে লাথি মারল মেরুদণ্ডের ওপর। ছটফট্ করছে আর বুনো শুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে গোলাম হায়দার। আরও খানিকটা বের করে এনে দড়াম করে দরজাটা দিয়ে বাড়ি মারল রানা ওর মাথার ওপর। চিৎকার করে উঠল গোলাম হায়দার, প্রাণপণে দুই পা ছুঁড়ল সে পিছন দিকে অন্ধের মত। রানার হাত থেকে ছুটে গেল ওর পা, উরুর ওপর এসে পড়ল একটা লাথি বেকায়দা মত। ছিটকে পড়ে গেল রানা। পড়েই হামাগুড়ি দিয়ে উঠে

বসল আবার, তারপর এক লাফে গাড়ির ওপাশে চলে গেল গুলি থেকে বাঁচবার জন্যে। বুম্‌, বুম্‌ করে দুটো গুলি বেরিয়ে গেল পিস্তল থেকে। খাবলা খাবলা সিমেন্ট উঠে গেল রানার পায়ের কাছ থেকে। তারপর কানে এল ক্লিক্‌ করে একটা শব্দ। স্লাইড টেনে আবার ট্রিগার টিপল গোলাম হায়দার। এবারও ক্লিক। ছুঁড়ে মারল সে খালি পিস্তলটা রানার দিকে। টুপ করে ডুব দিল রানা। বনেটের উপর খটাং করে বাড়ি খেয়ে চলে গেল সেটা রানার মাথার ওপর দিয়ে।

এইবার উঠে দাঁড়াল রানা। রক্তাক্ত, থ্যাতলানো গোলাম হায়দারের মুখ। ফোঁস ফোঁস শ্বাস পড়ছে, ফুলে ফুলে উঠছে চওড়া বুকের ছাতি। এগিয়ে গেল রানা ক্ষুধার্ত চিতাবাঘের মত। হঠাৎ কয়েকটা বোতল আর যন্ত্রপাতি রাখা ছোট্ট বেঞ্চটার কাছে চলে গেল গোলাম হায়দার, কি যেন উঠিয়ে নিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেল গ্যারেজ থেকে। কি একটা জিনিস পেটের কাছে চেপে ধরে রানাকে আড়াল করে কি যেন করছে সে লনের ওপর দিয়ে পুব দিকে ছুটতে ছুটতে। রানাও ছুটল পিছন পিছন।

এখনও খানিকটা ম্লান আলো আছে, আর একটু পরেই আঁধার হয়ে যাবে চারদিক, বারোটা জেট উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। ত্রিশ-চল্লিশজন প্যারাট্রুপার নেমে আসছে আসমান থেকে। কয়েকটা মিলিটারি সী-প্লেনও চোখে পড়ল রানার অস্তরাগের ম্লান কালচে আলোয়।

খুব সম্ভব আরেকটা পিস্তল লোড করবার চেষ্টা করছে গোলাম হায়দার। আড়ালে দাঁড়িয়ে বাঁচবে এমন জায়গা নেই রানার। কাজেই দ্রুত এগিয়ে ধরতে হবে ওকে। হঠাৎ থেমেই ঘুরে দাঁড়াল গোলাম হায়দার। একটা বোতল ধরা আছে ওর হাতে। বীভৎস দেখাচ্ছে ওর মুখটা।

থমকে দাঁড়াল রানাও। ওর ভিতর থেকে কে যেন কথা বলে উঠল: সাবধান! অ্যাসিড!

ধোঁয়াটে কি যেন বেরোচ্ছে বোতলের মুখ থেকে।

এখন পিছিয়ে যাওয়া মানেই পরাজয়। এগোতে হবে।

রানা লক্ষ করল গোলাম হায়দারের পিছন দিকে পায়ের কাছেই একটা গাছের শিকড় বেরিয়ে আছে চার ইঞ্চি উঁচু হয়ে। যদি ওকে এক পা পিছনে সরানো যায় তাহলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পড়ে যদি নাও যায়, হোঁচট খাবে। এই মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লে পিছোতেও পারে।

হঠাৎ ঝট্‌ করে খানিকটা ডানপাশে সরেই ঝাঁপ দিল রানা। হাতটা সামনের দিকে ঝাঁকি দিল গোলাম হায়দার। কয়েক ফোঁটা অ্যাসিড পড়ল রানার কাঁধে। সাথে সাথেই ফোস্কা পড়ে গেল সেখানে। নিচু হয়ে খানিকটা ধুলো তুলল রানা মাটি থেকে। চোখের নিমেষে ছুঁড়ে মারল সে ধুলোগুলো গোলাম হায়দারের মুখে-চোখে। আবার জায়গা পরিবর্তন করল সে বাঁয়ে কেটে, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। এক হাতে বোতল ধরা কব্জিটা চেপে ধরে আরেক হাতে গলা টিপে ধাক্কা দিল সে পিছন দিকে। পড়ে গেল গোলাম হায়দার। তার ওপর পড়ল রানা। হঠাৎ লক্ষ করল রানা ধীরে ধীরে

নিচের দিকে নেমে চলেছে ওরা। মাটিটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে কিছুদূর, তার পরেই খাড়া দু'শো গজ। পূব দিকের খাড়াইয়ের কিনারে চলে যাচ্ছে ওরা দু'জনেই।

গোলাম হায়দারের বাম হাতটা রানার চিবুকে। ঠেলা দিয়ে পিছনে সরাবার চেষ্টা করছে সে রানাকে। দু'জনেই একহাত দিয়ে বোতলটা চেপে ধরেছে। রানা বুঝল এখনও ওতে অ্যাসিড আছে খানিকটা।

সর্বশক্তি প্রয়োগ করল রানা বোতলের ওপর। ধীরে ধীরে হাতটা বেঁকে গিয়ে বোতলটা চলে আসছে গোলাম হায়দারের মুখের দিকে। দু'জনেরই মুখ বিকৃত হয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে গাল কুঁচকে রেখেছে রানা শক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে গোলাম হায়দারের। হঠাৎ আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল গোলাম হায়দার ভাঙা গলায়। বুঝতে পেরেছে সে।

ধীরে ধীরে কাত হয়ে গেল বোতলটা। চোখের কাছে চলে এসেছে বোতলের মুখ। বেরিয়ে এল বোতলের অবশিষ্ট অ্যাসিড। গোলাম হায়দারের অমানুষিক চিৎকারে কানে তালা লেগে গেল রানার। চোখ, নাক আর গালের কিছুটা অংশ অদৃশ্য হয়ে গেল গোলাম হায়দারের। আর সেই জায়গায় দেখা দিল ফুটন্ত ফেনা। সোঁ-সোঁ শব্দ তুলে অসংখ্য ছোট ছোট বুদ্বুদ সৃষ্টি হচ্ছে ওর দুই চোখের মধ্যে। আর চেয়ে থাকতে পারল না রানা, চোখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

উঠে দাঁড়াল রানা। ছটফট করছে গোলাম হায়দার চিৎ হয়ে শুয়ে। দুই হাত দিয়ে শূন্যে কি যেন ধরবার চেষ্টা করছে সে। ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে ওর দেহটা। নখ দিয়ে মাটি খামচে থামবার চেষ্টা করল সে। পাঁচ সেকেন্ড আটকে থেকে আবার নামতে থাকল। একদম কিনারে পৌঁছে বোধহয় আবার জ্ঞান ফিরে পেল সে। পড়তে গিয়েও হঠাৎ সচকিত হয়ে পাশ ফিরবার চেষ্টা করল, তারপরই অদৃশ্য হয়ে গেল দুই হাত শূন্যে তুলে।

দু'শো গজ নিচে অপেক্ষা করছে দেয়ালের ওপর গাঁথা তীক্ষ্ণ লোহার শিকগুলো।

ইয়টে ফিরে এল রানা ক্লান্ত পদক্ষেপে।

গ্যাঙ-ওয়ের সামনেই আটকে দিল ওকে আর্মি গার্ড।

'হ্যান্ডস্ আপ!' বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে হুকুম করল কেউ পিছন থেকে।

অসহায় দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চেয়ে মাথার ওপর হাত তুলল রানা। ক্ষিপ্র হাতে পিছন থেকে পরীক্ষা করল একজন রানার সর্বাঙ্গ। অস্ত্র পাওয়া গেল না কোন।

'আরে! ওনাকে এঁটকে দিলে কেন, বাওয়া? ছাড়ো, ছাড়ো!' গিলটি মিঞার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। 'নিয়ে এসো। এদিকে নিয়ে এসো ওনাকে।'

রানা দেখল কয়েকজন মিলিটারি অফিসারের মাঝখানে সভা আলো করে

বসে আছে গিলটি মিঞা। উদ্ভাসিত ওর চোখ মুখ। অনীতাকেও নিয়ে আসা হয়েছে। ডেকের ওপর হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে সেই ছয়জন বন্দী।

রানাকে দেখেই চিনতে পেরে উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট করল একজন ক্যাপ্টেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই দাঁড়িয়ে গেল তড়াক করে, বুট ঠুকে স্যালুট করল। দেখাদেখি গিলটি মিঞাও উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট লাগিয়ে দিল একটা। রানার সম্মান দেখে কান পর্যন্ত বিস্তৃত হলো ওর হাসি।

দ্রুত বুঝিয়ে দিল রানা অফিসারদের সাবমেরিনের ব্যাপারটা। হুইস্‌ল্‌ বাজাল একজন। দৌড়ে এসে দাঁড়াল জাহাজের বিভিন্ন জায়গা থেকে পঁচিশ ত্রিশজন সশস্ত্র সৈনিক।

এমনি সময় প্রবল বেগে দুলে উঠল ইয়টটা। কি হলো! ছুটে গিয়ে দাঁড়াল সবাই রেলিং-এর ধারে। সমুদ্রের নিচে ভয়ঙ্কর আলোড়ন হচ্ছে। প্রকাণ্ড কয়েকটা বুদ্বুদ উঠছে উপরে। হঠাৎ বুঝতে পারল রানা ব্যাপারটা। আবার একবার দুলে উঠল ইয়ট।

পানির নিচে তুমুল আলোড়ন তুলে চলে গেল সাবমেরিন।

০